182.Qc.899.61

নিত্যধামগত পণ্ডিত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন
প্রতিষ্ঠিত

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্" ॥

(২১শ বর্ষ)
(১৩২৯ ভাদ্র হইতে ১৩৩০ শ্রাবণ পর্য্যন্ত)

—— :•: ——

সম্পাদক
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন

ভক্তিকার্য্যালয়
ঝোড়হাট "ভক্তি-নিকেতন"
পোঃ আন্দুল-মৌড়ী, হাওড়া

——————

বার্ষিক মূল্য সডাক
দেড় টাকা
প্রতি খণ্ড ৵০ তিন আনা।

ভক্তি কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং
কলিকাতা ১৪।এ, রামতনু বসুর লেন
"মানসী প্রেস" হইতে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

২১শ বর্ষের সূচী

(১৩২৯ ভাদ্র হইতে ১৩৩০ শ্রাবণ পর্য্যন্ত)

বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক
প্রার্থনা	সম্পাদক	১, ২৫, ৬৫, ৮৯, ১২৯, ১৫৩, ১৭৭, ২০১, ২২৫, ২৪৯
বিশ্বরূপের সঙ্গীত		২, ২৬, ৬৭, ৯১, ১৩১, ১৫৪, ২০২, ২২৬, ২৫০
মহাপুরুষ প্রসঙ্গ	শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৩, ৮১
শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রসঙ্গ	" অমূল্যধন রায় ভট্ট	৭, ৫৬, ৯৮, ১৪৮, ·৭২, ১৭৯, ২১৫, ২৪০ ২৫৫
মহারাজা সুবর্ণ চরিত	" কৃষ্ণদাস পাঁড়ে	১২
তরজা	" রাধাচরণ গোস্বামী	১৮
সমালোচনা	সম্পাদক	২৩, ২৪৭
সম্পাদকীয়	ঐ	২৪, ৬৪
ভ্রমই পতনের মূল	শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ বসু	২৭
মাতৃ-দর্শন	প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	৩১
ভক্তিযোগ	শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩
বস্ত্র হরণ ও রাসলীলা	" কালাচাঁদ দেবশর্ম্মা	৩৭
কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি	ঐ	৪৫
মহাত্মা তুলসীদাস	শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা	৬৮
মাধুর্য্য দশক	" সত্যচরণ চন্দ্র বি, এল	৮৭
নির্ব্বাণ কি প্রেম ?	" কালাচাঁদ দেবশর্ম্মা	৯২
শ্রীনিত্যানন্দ মহিমা কীর্ত্তন	" অমূল্যধন রায় ভট্ট	১০৫
অভেদ জ্ঞানই বিষ্ণু ভক্তির লক্ষণ	শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ বসু	১১৮
ভালবাসা	শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী	১১৯
জ্ঞানযোগ	" রাখালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	১২১

বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক
বৈষ্ণব-ব্রত তালিকা	সম্পাদক	১২৬, ২২২
আত্মা	শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	১২৭
শ্রীবৃন্দাবন	" কৃষ্ণকিঙ্কর রায় চৌধুরী	১২৯
বস্তু বিচার	" ভূপতিচরণ বসু	১৩২
ব্রজরস মাধুরী	" বামাচরণ বসু	১৩৫
সম্পাদকের বৈঠক	শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা	১৪৪
সুখের দিন	" রাধাচরণ গোস্বামী	১৪৫
শ্রীশ্রীদোললীলা	প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	১৫৫
হরিনামামৃত	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিঙ্কর রায় চৌধুরী	১৬০
দিগ্বিজয়ীর মুক্তিলাভ	" ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা	১৬১
তত্ত্বসার	" কালাচাঁদ দেবশর্ম্মা	১৬৬
শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার	" ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা	১৮৫
শ্রীগীতগোবিন্দ	" সত্যচরণ চন্দ্র বি, এল	১৮৭
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম	" ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা	১৮৯
আনন্দ লীলা	" কুন্দাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন	১৯১,২০৫,২২৬
একটী চিত্র	" ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা	২০৩
আবাহন গীতি	" মাখনলাল দত্ত ভিষকতীর্থ	২১১
মহাশ্মশান	" কৃষ্ণকিঙ্কর রায় চৌধুরী	২৩৪
পারের কাণ্ডারী	" রাধাচরণ গোস্বামী	২৩৫
হিন্দু বিধবা	" কৃষ্ণকিঙ্কর রায় চৌধুরী	২৫৩
অতৃপ্ত-সংসার	" কেদারনাথ ভারতী সাংখ্যতীর্থ	২৬৩

ভক্তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

(২১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩২৯ সাল)

মঙ্গলাচরণ

বাঞ্ছাকল্পতরুং সমস্ত সুখদং ভাবৈক লভ্যং সতাং
বেদ্যং বেদবিদাং গুণৈক নিলয়ং লীলাময়ং মাধবম্।
গোবিন্দং গুণ-জন্ম কর্ম্মভিরহো সম্মোহয়ন্তং জগৎ
রাধা প্রেমনিধিং প্রণামি শরণং ভাবপ্রদং শ্রীহরিম্ ॥

প্রার্থনা

"মরমের কথা হৃদয়ের ব্যথা
বলিব কাহার কাছে।
চরণে তোমার জানাব এবার
আশা শুধু এই আছে ॥"

দয়াময়! আজ তোমার কৃপায় ভক্তি একুশ বর্ষে পদার্পণ করিল। জানি না কাঙ্গালের এই সামান্য পত্র পুষ্পে ভরা ডালি তোমার সেবায় লাগিতেছে কি না। প্রাণের ব্যথা জানাইবার একমাত্র তুমিই আছ, তাই যখন যে ব্যথা পাই তখনই ব্যক্ত করিবার ভাষা না জানিলেও যেমন তেমন করিয়া বলিয়া ফেলি; কাঙ্গাল আমি আমার ভাষা ও ভাবের দীনতা লইয়া—আমার প্রাণভরা বেদনা যখনই তোমার শ্রীচরণে নিবেদন করিয়া কৃপা প্রার্থনা করি তখনই জানি না কেমন করিয়া যেন আমার বেদনাভরা প্রাণে কোথা হইতে শান্তি আসিয়া উদয় হয়; তাই আজ নববর্ষারম্ভে তোমার নিকট

আমার সকাতর প্রার্থনা—আমাকে প্রাণের সকল কথা অকপটে তোমার নিকট বলিবার শক্তি দাও। আমি সকল রকমে কাঙাল, সাধু গুরু মুখে শুনিতে পাই তুমি কাঙালের সখা, "যার কেহ নাই তুমি আছ তার" ভাবুক ভক্তের এই অভ্রান্ত উক্তি স্মরণ করিয়া তোমার নাম লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলাম, ভাল মন্দ কিছু বুঝিনা, তোমার উপরেই ভার রহিল, যাহা করিলে ভাল হয় কর। তবে একটী প্রার্থনা এই যে, কর্ম্মের স্রোতে ফেলিয়া তোমাকে যেন ভুলাইয়া দিও না, যখন যে অবস্থায় থাকি যেন তোমায় স্মরণ রাখিয়া, তোমার নাম করিতে পারি, যেন—

"সুখেতে দুঃখেতে পারিতে ডাকিতে
ভাবিতে জীবনে মরণে॥"

বিশ্বরূপের সঙ্গীত

(২)

৩।— এসেছে ব্রজের বাঁকা কালসখা দেখ্‌বি আয় তোদেরি এই নদীয়ায়।
(তার) রং ফিরেছে ঢং ফিরেছে কাল এখন চেনা দায়॥
আর তার কাল বরণ নাই
(এবার) রাই অঙ্গ সঙ্গ পেয়ে গৌর হ'য়ে তাই—
সেই ব্রজের প্রেমেরখেলা, সেই ব্রজের রসের খেলা,
সেই ব্রজের ভাবের খেলা খেল্‌তে এসেছে হেথায়॥
সেই ব্রজের কুলললনা
(তারা) যাঁর বাঁশী শুনে ভুলত কুলের ধরম রাখ্‌ত না—
সেই রাধার প্রাণের নাগর, সেই রাধার প্রাণের নাগর,
সেই রাধার ভাবের নাগর এখন গৌর নাম ধরায়॥
(ওগো) তার প্রেমের এইত রীত
(আগে) বাঁশী শুনায়ে শেষটা বড় জ্বালায় বিপরীত—
এখনও যায়নি স্বভাব, গৌর হ'য়েও যায়নি স্বভাব,
কেঁদে কেঁদেও যায়নি স্বভাব, ক্রমে পাবি পরিচয়॥

প্রেমেতে ঋণী হ'য়েছে
(তারা তাই) হাতের বাঁশী কেড়ে নিয়ে বিদায় দিয়েছে—
রাধানাম সাধ্‌বে কিসে, সাধের নাম আর সাধ্‌বে কিসে,
বাঁশী নাই নাম সাধ্‌বে কিসে বদনে তাই গুণ গায় ॥
কাঙ্গাল বিশ্বরূপে কয়
(এ শুধু) রাইরূপেতে অঙ্গঢেকে রঙ্গকরা নয়—
ত্রিভুবন উদ্ধারিলে, আচণ্ডালে উদ্ধারিলে,
(এ) দীনকাঙালে উদ্ধারিলে তবে খালাস ঋণের দায় ॥

৪। — সুন্দর বালা শচী-দুলালা নাচে শ্রীহরি-কীর্ত্তন মে।
ভালে চন্দন তিলক মনোহর অলকা শোভে কপোলন্ মে ॥
শিরে চূড়া দরশ নিরালে, গলে ফুলমালা হিয়াপর দোলে
পহিরণ পীত পটাম্বর বোলে রুনুঝুনু নূপুর চরণো মে ॥
কোই গাওয়তহায় পঞ্চমতাল, কৃষ্ণ মুরারী হরিকে নাম
মঙ্গলতাল মৃদঙ্গ রসাল বজাতে হায় কোই কোই রঙ্গ মে ॥
রাধাকৃষ্ণ একতনু হোই, নিধুবনমে যো রং মচাই
বিশ্বরূপকো প্রভুজী সোই অব্‌তো প্রকটহি নদীয়ামে ॥

সম্পাদক

মহাপুরুষ প্রসঙ্গ

(৪)

[বিগত আষাঢ় মাসের ভক্তিতে মহাপুরুষ প্রসঙ্গে বলিয়া ছিলাম যে, ক্ষীরোদ চন্দ্র মহাপুরুষের নিকট হইতে ষড়রিপুর বিষয় শুনিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া ছিল তাহা পাঠকগণকে উপহার দিব। নানা কারণে শ্রাবণ মাসে আমরা উহা প্রকাশ করিতে পারি নাই, বর্ত্তমানে তাঁহার লিখিত খাতা হইতে আমরা যতটুকু পাইয়াছি, নিম্নে তাহাই মুদ্রিত করিলাম।]

"কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই-ছয়টী রিপুর মধ্যে "কামঃ শ্রেষ্ঠ তমো রিপুঃ" অর্থাৎ কামই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রিপু। সাধারণে আপাত

মধুর সুখে মুগ্ধ হইয়া এই সর্ব্বানর্থকারী রিপুর বশীভূত হইয়া পড়ে। শাস্ত্র এই কামোৎপত্তির বিষয় বলিয়াছেন—

"সঙ্গাৎ স্ত্রীভির্মিথো বাসাৎ শরীরস্যাতি পোষণাৎ।
রজোগুণান্বিতাহারৈর্ভবেৎকামো মহান্ রিপুঃ॥

অর্থাৎ একান্তে স্ত্রীলোকের সহিত অবস্থান কিম্বা বহু সম্ভাষণ অথবা স্ত্রীলোকের রূপ গুণাদির বিষয় চিন্তা করায় কামের উৎপত্তিহয়। রজোগুণান্বিত দ্রব্য আহার দ্বারা শরীরের পরিপোষণে যাহারা ব্যস্ত সাধারণ লোক অপেক্ষা তাহাদের কামরিপু অধিকতর প্রবল হইতে দেখা যায়।

ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—কামজীবের হৃদয়ে উদয় হইয়া সর্ব্বদা তাহার হৃদয় দহন করে এমনকি জ্ঞানিগণও দুষ্পুর কামেরহাতে নিস্তার পান না। তবে যে একান্ত প্রাণে ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার হইয়া থাকে ভগবান দয়া করিয়া তাহাকে এই চিরশত্রুর হাত হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন।

প্রধান প্রধান শরীরতত্ত্ববীদ্ পণ্ডিতগণ বহু গবেষণাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, ভুক্ত দ্রব্য সম্যক্‌রূপে পরিপাক হইয়া ক্রমে রস, রসহইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থিহইতে মজ্জা ও মজ্জাহইতে শুক্রে পরিণত হইয়া শরীর দৃঢ, পুষ্ট ও কান্তিবিশিষ্ট করে। কামের প্রাবল্যে এই শুক্র অযথা নষ্ট হইলে মানুষ সহজেই অকর্ম্মণ্য হইয়াপড়ে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে এবিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণের অভাব হয় না। শিবসংহিতায় বলিয়াছেন—

"মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণে।"

রক্তের পরমোৎকৃষ্ট অংশ যাহা শুক্ররূপে পরিণত হইয়া মানুষকে সমধিক দৃঢ়কায়, সাহসী, উত্তমশীল এককথায় যথার্থ মনুষ্যত্ব সম্পন্নকরে তাহার অপব্যবহারে যে স্বভাবতই মানুষ দুর্ব্বল, ভীরু, চঞ্চলমতি হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। ইন্দ্রিয় পরায়ণ ব্যক্তির মানসিক বিকৃতি, স্মৃতিশক্তির দুর্ব্বলতা প্রভৃতি বিশেষ রূপেই পরিলক্ষিত হয়। অধিকন্তু অনেক সময় এমন দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়ে যে, জীবন সংশয় হইয়া দাঁড়ায়।

এমন অনর্থকারী শত্রুর হাতহইতে উদ্ধার পাইতে ইচ্ছাকরিলে কতক গুলি নিয়ম পালনকরা বিশেষ প্রয়োজন। প্রথমত দেখিতে হইবে

কাম কেন উৎপত্তি হয়, পূর্ব্বে একটী শ্লোকদ্বারা সংক্ষেপে বলাহইয়াছে একণে উহারই বিস্তারিত আলোচনা করাযাউক। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—

> কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
> মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥　৩।৩৭

মোট কথা কাম এবং ক্রোধ রজোগুণ সম্ভূত। আহার্য্য পরিপাক হইয়া যখন শরীরের পোষণ কার্য্য হয় এবং তদ্দ্বারা যখন মানবের বৃত্তিসমূহ প্রকাশহয় তখন দেখিতে হইবে এই কামোৎপত্তির মূল কারণ রজোগুণ কিসেদ্বারা সমুদ্ভূত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাই পুনরায় বলিতেছেন—

> কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
> আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময় প্রদাঃ॥　৭।৯

সুতরাং এই সমস্ত দ্রব্য আহার করা একান্ত অনুচিত। সাধারণতঃ আমাদের দেশের বিধবাগণ যেসকল দ্রব্য আহার করিয়া থাকেন সেইগুলিই সাত্ত্বিক আহার বলিয়া গ্রাহ্য। কারণ বিধবাগণ ব্রহ্মচারিণী, তাঁহাদিগের জন্য ঋষিগণ যে সকল দ্রব্য ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা যে পবিত্রতা সাধনের বিশেষ অনুকূল সে বিষয়ে বোধহয় কাহারও সন্দেহ নাই। আজ কাল কোনও কোনও পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী যুবকের দল এসকল ঋষিবাক্য মানিতে চায় না, কিন্তু তাহারা ভাবিয়া দেখে না যে, যাহাদিগের উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ করিয়া আজ নিজেকে খুব বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান বলিয়া মনে করিতেছে সেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও অনেকে এইসকল ঋষিবাক্যকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদিগের নিকট হইতে ভালটুকু গ্রহণ করিতে পারিনা কিন্তু যেটুকু আমাদের প্রয়োজন নাই পরন্তু অপকার আছে তাহাই আমরা গ্রহণ করিয়া গর্ব্বে আত্মহারা হই।

তারপর একান্তে স্ত্রীলোকের সহিত অবস্থান কিম্বা বহুসম্ভাষনাদি দ্বারা অথবা মনে মনে স্ত্রীলোকের বিষয় চিন্তাদ্বারা যে কামের উৎপত্তি হয় এবিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন যাহাতে এইসকল কুচিন্তারূপ বিষ কোনও রূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিতে না পারে তাহার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। বাহিরে যতই করনা কেন, মন যদি ঠিক না হয়, মনে

মনে যদি অসৎ চিন্তা হইতে থাকে তাহা হইলে আর বাকী রহিল কি? বাহিরে না করিয়া মনে মনে করিলেই যে ভিত্তি সুদৃঢ় হইতে পারিল। সুতরাং স্ত্রীলোকাদি প্রলোভনের বস্তু হইতে যথাসাধ্য দূরে থাকিতে চেষ্টা করিবে। এবং মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিবে যে, কুচিন্তাই যত অনর্থের মূল। এই ভাবটী যদি মনে দৃঢ় হয় তাহাহইলে যখনই কুচিন্তা আসিবে তখনই সঙ্গে সঙ্গে তোমার চেতনা আসিবে। কোনও একজন পণ্ডিত বলিয়াছিলেন—'যদি নিদ্রিতাবস্থাতেও কোনরূপ কুচিন্তা মনে আসে তৎক্ষণাৎ জাগ্রত হইবে, যদি তাহাতেও না যায় তবে উঠিয়া যাহাতে শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষরূপে পরিচালনা হয় এমন কোনও কায়িক পরিশ্রম আরম্ভ করিবে।'

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিধি নিষেধগুলি পালন করাও ইন্দ্রিয় দমনের একটী প্রধান উপায়। অলস ও অতিরিক্তাহারী ব্যক্তিই ইন্দ্রিয় লালসাহইতে অধিক কষ্ট পায়। লঘুপাক, পুষ্টিকর অথচ অনুত্তেজক খাদ্যই স্বাস্থ্য সংরক্ষণে ও রিপুদমনে বিশেষ অনুকূল। নিদ্রাযাইবার পূর্ব্বে ও নিদ্রাহইতে উঠিয়া প্রত্যুষে শীতল-জল পান করা, কঠিন শয্যা ও কঠিন উপাধান (বালিশ) ব্যবহার করা, শয়নের পূর্ব্বে সৎগ্রন্থপাঠ ও ভগবানের নাম-গুণ লীলা প্রভৃতির স্মরণ বিশেষ উপকারী। রাত্রজাগরণ স্বাস্থ্যেরপক্ষে বিশেষ অপকারী। মধ্যে মধ্যে উপবাস করা ভাল। * পদ্মাসন, ও সিদ্ধাসন কামদমনের একটী প্রধান উপায়। যাঁহারা এই উপায় অসাধ্য বা অকর্ত্তব্য বলিয়া মনেকরেন তাঁহারা ঐ সময় বিশেষ কোন শারিরীক পরিশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেও সমধিক ফল পাইবেন। কৌপীনধারণ ইন্দ্রিয় দমনের অনেক সাহায্যকরে।

আর একটী বিশেষ কথা—সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলে সহজেই কাম দমন হয়। প্রমাণ যথেষ্ট আছে। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বলিতেন—"আমি সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যস্তথাকি তাই আমার নিকট বিশেষ ইন্দ্রিয় বিকার আসিতে পারে না।" একথা অতি সত্য, মনকে যতই কার্য্যে ব্যস্তরাখিবে ততই সে অসৎ ভাবনা হইতে দূরে থাকিবে যেমন তাহাকে অবসর দিবে অমনি সে তোমাকে দাসকরিয়া খাটাইতে থাকিবে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে—

* হিন্দুশাস্ত্রে প্রতিমাসেই ৪দিন অন্ততঃপক্ষে উপবাসের ব্যবস্থা দিয়াছেন ২টী একাদশী ১টি অমাবস্যা ও ১টী পূর্ণিমা। কিন্তু আমরা আজকাল সভ্য হইয়া এসব নিয়ম পালন করিতে একান্ত নারাজ। (লেখক)

"সংসর্গেন চ সাধূনাং যোষিৎ সঙ্গ বিবর্জ্জনাৎ।
দুর্জ্জয় সংজিতঃ কামোদেহাশুদ্ধিবিচারণাৎ॥"

অর্থাৎ স্ত্রীলোকের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ এবং ভক্তের জীবনচরিত শ্রবণকরা শ্রীভগবানের স্মরণ মননে রত থাকিয়া দেহের নশ্বরতা এবং অশুচি ভাব চিন্তাকরিলে দুর্জ্জয় কামরিপু পরাভূত হয়।"

সৌভাগ্যক্রমে ১৩২৭ সালে একবার শ্রীধাম বৃন্দাবন দর্শনের সুযোগ হইয়াছিল সেখানে একটী মহাত্মা (নামটি ঠিক স্মরণ হইতেছে না) বলিয়াছিলেন "গোবিন্দ"নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনে বা মনে মনে স্মরণে কাম দমন হয়। তিনি বলিয়াছিলেন উহা তাঁহার নিজ জীবনে বিশেষরূপে পরীক্ষিত।

শাস্ত্রকারগণ এবং মহাপুরুষগণ এইপ্রকার অনেক পন্থা নির্দ্দেশকরিয়াছেন আমরা ক্ষিরোদচন্দ্রের খাতাহইতে এবার এইটুকুই পাঠকগণকে উপহার দিলাম। বারান্তরে অন্যান্য রিপু সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস-প্রসঙ্গ।

[৩]

চিত্রকর যে পুলিন দাদার মাতুল মহাশয় এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষেত্রে তাঁহার সম্বন্ধে পূজনীয় দাদা বল্লেন—"চিত্রকর মাতুল মহাশয় কখনও পুরী দেখেন নাই কিন্তু কল্পনায় যা অঙ্কন ক'রেছেন তা বাস্তবের সঙ্গে অবিকল মিল হয়। পুরীর রথের রাস্তার ধারের গাছ পালা, বাড়ী ঘর প্রভৃতি সব যেন ফটোর সঙ্গে ঠিক ঠিক আঁকা হ'য়েছে।" আমাদের ঐ চিত্রগুলি দেখ্‌বার কৌতূহল হ'লো, তাই একদিন নেবুতলালেন হ'তে বিকালে (কলিকাতায় আমরা যেখানে সকলে যাইতাম সেই মহাত্মা নেবুতলায় থাকিতেন) আমরা ৪।৫ জন মিলে পুলিনদাদার সঙ্গে তাঁদের বাড়ী কলুটোলা ২৬নং শোভারাম বসাক লেনে গমন করলুম।

দাদার কথিত চিত্রগুলি দেখে বড়ই আনন্দ হ'লো। রথাগ্রেনর্ত্তন ছবি-

খানি ৬।৭ হাত লম্বা সুন্দর অঙ্কন। পুলিন দাদাদের সংসার চিরকালই ভক্তের সংসার। ইঁহার দাদা কুঞ্জলাল মল্লিক মহাশয় বিশেষ ধার্ম্মিক। বৈঠকখানা ঘরটীতে যেন পবিত্রতা মাখান। এই ঘরে সপ্তাহে একদিন পূজ্যপাদ শ্রীনীলকান্ত গোস্বামীর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং একদিন পূজ্যপাদ রোহিণীনন্দন বাবাজীর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ এবং কীর্ত্তনাদি হইত। ছবি দর্শনের পর বৈঠকখানাঘরে ব'সে ব'সে আমাদের অনেক কথা হ'লো। তার পরে ৺পুরীধামের কথাতে পুলিনদাদা বল্লেন—

৺পুরীধামে একজন বাবাজী আছেন তাঁকে সকলে "পুরীর বড় বাবাজী ব'লে ডাকেন। শুনেছি স্পর্শমাত্রে তিনি মানুষকে প্রেমাভিভূত ক'রে দেন। তাঁর মহিমার কথা অনেক শুনেছি, শীঘ্রই তিনি কলিকাতায় আসবেন, আর বোধহয় আমাদেরই বাড়ীতে। বিগত ১৩০৩ সালে জ্যৈষ্ঠমাসে প্লেগের সময়ে তিনি কলিকাতায় এসেছিলেন এবং আমাদের বাড়ীতেও পদধূলি দিয়েছিলেন কিন্তু আমি তখন ভিন্ন প্রকৃতির ছিলাম এসব কিছু মানতুম না, তাই তখন তাঁকে দেখেও দেখি নাই।

"পুরীধামের বড় বাবাজী" এই কথা শুনেই আমার নবদ্বীপদাদার কথা খপ্ করে মনে পড়ে গেলো—

নবদ্বীপদাদা যে মহাপুরুষের কথা আমাকে ব'লেছিলেন পুলিনদাদার কথিত বাবাজীমহাশয়ও কি সেই একই ব্যক্তি? তাই অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পুলিনদাদাকে নবদ্বীপ দাদার সহিত সাক্ষাতাদি সমুদায় কথা বল্লুম। বাবাজীমহাশয়ের কথা দুইস্থানেই শ্রবণ ক'রে তাঁর উপরে একটা খুব ভক্তিভাব মনে মনে অঙ্কিত হ'য়ে গেলো। তারপরে কবে সেই মহাপুরুষ কলিকাতায় আস্‌বেন আর তাঁর আগমন হ'লে আমরা যেন সংবাদ পাই ইত্যাদি কথা পুলিনদাদাকে বিশেষ ক'রে ব'লে সকলে বাড়ী চ'লে এলুম।

দ্বিতীয়বার দর্শন ১৩০৮। পৌষ মাস। পুলীনদাদাকে আজকাল আর বড় বেশী দেখতে পাই না, তিনি নেবুতলায় খুব কমই আসেন। একদিন দেখা হ'তে না আসার কারণ জিজ্ঞাসায় তিনি বল্লেন— "শ্রীরাধারমণচরণদাস বাবাজী মহাশয় কলিকাতাতে এসেছেন। প্রথমে আমাদের বাড়ীতে, (২৬ নং শোভারাম বসাক লেনে) সেখান হ'তে বেলঘরে বড় রাস্তায় ধারে আমার মামার বাগানে, পরে এঁড়িয়াদহের রায়বাহাদুর প্রসন্ন-

কুমার বন্দোপাধ্যায়ের বনহুগলীর নিকট (বড় রাস্তা বা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সামান্য পশ্চিমের) বাগানে এখন অবস্থিতি করছেন।"

বাবাজী মহাশয় সম্বন্ধে অনেক কথা (১) ব'লে দাদা একদিন দর্শন কর্ত্তে যেতে ব'ল্লেন। আমাদের পাণিহাটী হ'তে বনহুগলীর ঐ বাগান বেশীদূর নয়, প্রায় ১॥ ক্রোশ দক্ষিণে। এজন্য একদিন বিকালে ৪টার সময় বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করার জন্য আমি এবং গোপাল মামা (২) দুজনে রায় বাহাদুরের বাগান বাড়ীতে উপস্থিত হলাম।

বাগানটী চমৎকার। দক্ষিণমুখে ফটক, ফটকের সুমুখেই বৃহৎ পুষ্করিণী ও বাঁধা ঘাট। পরপারে উচ্চ মেজের উপর সুন্দর বিল্ডিং, গেট হ'তে বিল্ডিংএ যাবার জন্যে পুকুরের দুই ধারে চওড়া রাস্তা, বিল্ডিংএ উঠ্‌তে নিচে থেকে এক-তলা সমান সোপান শ্রেণী, সোপানের দুই ধারে টবেতে নানা জাতীয় গাছ। বাগানের চারি দিকে হরেক রকমের বিলাতী গাছ ও মধ্যে মধ্যে "পামকুঞ্জ।" ঘরের পশ্চাতে একটী ঝিল সেখানে অশোকাদি গাছের এমন ঝোপ যে রৌদ্র আদোপেই আস্‌তে পারে না। মোট কথা বাগানটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও বিলাতী ভাবে সজ্জিত। বেশ শান্তিপ্রদ স্থান।

রায় বাহাদুর মহাশয় একজন গণ্য মান্য লোক। লাট সাহেবের কর্ম্মচারী। বড় বড় সাহেব সুবার সহিত আলাপ বন্ধুত্ব আছে। সাহেব মেমের "বলনাচ" হবার জন্যই তিনি এই বাগান ক'রেছেন এবং "বলনাচের" জন্যই হলের মেজে মসৃণ

---

(১) এর পূর্ব্বে বোধ হয় ১৩০৩ সালে বাবাজী মহাশয় পুলিন দাদাদের বাড়ী হ'তে শ্রীপাট পাণিহাটীর দণ্ড মহোৎসব দর্শন কর্ত্তে এসে ছিলেন। সে কাহিনী "চরিতসুধা" ২য় খণ্ড ২১৩ পৃঃ ভক্তগণ দৃষ্টি করিবেন। আমরা তখন সে সব কথা জানতাম না, কিন্তু শুনেছিলাম কলিকাতা হ'তে এক বাবাজী মহারাজ মহোৎসব দর্শন কর্ত্তে এসে প্রেমে এমন মত্ত হ'য়ে ছিলেন যে সেনেদের মহাপ্রভুর বাড়ীর পাথরের উঠানে পাথরের উপর মুখ রগড়ে রক্তারক্তি ক'রেছিলেন। আরও সঙ্গিগণ মধ্যে একটী বাবুর সোণার ঘড়ি ও চেন চুরি যায় বাবুটী প্রফুল্লিত হ'য়ে হাসতে হাসতে ব'লেছিলেন,—"হায়, আজকের এমন মহামূল্য প্রেম ধন না নিয়ে যে, সামান্য দ্রব্য নিয়ে গেলো তার মত বোকা আর কে আছে?"

(২) পূর্ব্বাশ্রম শ্রীগোপালচন্দ্র আচার্য্য। ইনি শিক্ষিত এবং পরম ধার্ম্মিক। পাণিহাটীতে "জ্যোতীষ" ব্যবসা কর'তেন। ইনিই আমাদের ধর্ম্ম পথের প্রথম পথ প্রদর্শক। ইঁহার নিকট পাণিহাটী বাসী অনেক যুবক বিশেষ ভাবে ঋণী। বর্ত্তমানে হুগলী জেলার সোমড়ার নিকট নাটাগড়ে থাকেন।

তক্তা দিয়ে এঁটেছেন। আমাদের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী স্থান ব'লে তাঁর যৌবনের সব কীর্ত্তিই শুনতে পাই। যৌবনে তিনি না ক'রেছেন এমন কাজই নেই। হিন্দুর দেবদেবী সাধু সন্ন্যাসী কিছুই মানতেন না। পুলিনদাদার মুখে যখন শুনলাম সেই রায় বাহাদুর মহাশয় বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণ আশ্রয় ক'রে তাঁর নিকট হ'তে দীক্ষা নিয়েছেন, তখন আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলুম, মনে ভাবলাম—এ বাবাজী মহারাজ তো সাধারণ লোক নন! বাবাজী মহাশয়ের কৃপাপ্রাপ্ত হবার পর রায় বাহাদুরের মুখে বলতে শুনেছি—"বাবা! যেখানে একদিন মেয়ের নাচ হ'তো আজ সেখানে বাবাজীর নৃত্য হচ্ছে, কি মজা!" আরও হলের মধ্যে যে সকল দামি বিলাতী ছবি ছিল সেগুলি ফেলে দিয়ে তার স্থানে মহাপ্রভুর ও অন্যান্য দেবদেবীর চিত্র দিয়ে সাজিয়েছেন। কি পরিবর্ত্তন!

আমরা দুজনে সিঁড়ির কাছে গিয়ে দেখি ঘরের মধ্যে কীর্ত্তন হচ্ছে, আর সিঁড়ির সর্ব্বোপরি ধাপের (পূর্ব্ব দিকের) আলসেতে হেলান দিয়ে একজন অতীব দীর্ঘাকৃতি, বেশ হৃষ্ট পুষ্ট সুপুরুষ বাবাজী দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পরনে বহির্ব্বাস, গাত্রে খুব লম্বা চাদর, গলায় ত্রিকণ্ঠী মালা, হাত দুটি বুকের উপর রেখে স্থির দৃষ্টিতে কি ভাবছেন।

আমরা কাছে গিয়ে দণ্ডবৎ ক'রে জিজ্ঞাসা করলুম:—"মশায়, চরণদাস বাবাজীকে আমরা দর্শন কর্ত্তে এসেছি, কোথায় তিনি? এখন কি দেখা পাব?"

তিনি—কোথা হ'তে আপনাদের আগমন হচ্ছে বাবা?

আমরা—পানিহাটীতে আমাদের বাড়ী, সেইখান হ'তেই আসছি।

তিনি—(চমকিয়া উঠিয়া) "ওঃ! শ্রীপাট পানিহাটী; শ্রীপাট পানিহাটী," এইরূপ দু'তিনবার ব'লে তিনি উদ্দেশে দণ্ডবৎ করতে লাগলেন। এবং আমাদেরও দণ্ডবৎ করে বল্লেন—"ভাগ্যবান আপনারা, শ্রীপাট পানিহাটীতে বাস করেন!" বাবা! যাকে দেখতে এসেছেন আমিই সেই "চরণদাস"।

শুনবামাত্র আমরা খুব লজ্জিত হ'য়ে তাড়াতাড়ি তাঁকে দণ্ডবৎ করলাম। ঐখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তিনি আমাদের সঙ্গে অনেক কথা কইলেন। কিন্তু কথা বলতে বলতে এক একবার থেমে গিয়ে হুঙ্কার করে "হরিবোল" "হরিবোল" বলে উঠতে লাগলেন। শেষে বল্লেন "বাবা আর থাকতে পারছি না, প্রাণটা যেন কেমন কচ্ছে, কীর্ত্তনে যাই, আপনারাও ভিতরে আসুন।" এই ব'লে ব্যস্ত ভাবে কীর্ত্তন স্থলে প্রবেশ করলেন। আমরাও তাঁর আদেশমত পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলাম।

ভিতরে গিয়ে দেখি ১০। ১২ জন বাবাজী বসে কীর্ত্তন করছেন। মাঝখানে একটী যুবক বাবাজী চকের জলে বুক ভাসিয়ে গান করছেন, আর সকলে দোয়ারকি করছেন। ভারি সুন্দর কীর্ত্তন। বিশেষতঃ ঐ যুবক বাবাজীর চেহারা ও কীর্ত্তনের ভাব দেখে আমরা তো একেবারে মোহিত হ'য়ে গেলাম। (৩)

বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তনে যেতে সকলের মধ্যেই যেন একটা প্রবল উৎসাহ এলো, খুব জোরে জোরে কীর্ত্তন হ'তে লাগলো। বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তন এমন মধুর লাগলো যে মহাপাষণ্ড ও ভণ্ড হলেও খানিকক্ষণ নিজ প্রকৃতিকে চাপা দিয়ে আবিষ্টের মত চুপ ক'রে ব'সে থাকতে হ'য়েছিল। সন্ধ্যার সময় কীর্ত্তন ভেঙ্গে গেলো সকলে বিশ্রাম করতে লাগল। তার পরে আমরা অন্যান্য বাবাজী মহাশয়দের দেখবার জন্ত ঘড়ের চারিদিকে বেড়াতে লাগলুম। পশ্চিমদিকের একটী ঘরে গিয়ে দেখি—আমার সেই নবদ্বীপদাদা শু'য়ে আছেন। হঠাৎ দাদাকে দেখে আমি যেন হাতে চাঁদ পেলাম, আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম। প্রাণের কথা বলছি—বাবাজী মহাশয়কে দেখে যে আনন্দ হ'য়েছিল, নবদ্বীপ দাদাকে দেখে তার চেয়ে এমন আনন্দ হ'লো যে বলবার নয়। অপরিচিত বা নবাগতের সঙ্কোচ ভাব আমার একেবারে কেটে গেল, এজন্ত ইঁহাদের সকলকেই তখন আপনার লোক ব'লে মনে হ'তে লাগলো।

দাদা আমাকে দেখেই ব্যস্ত হ'য়ে হেসে হেসে বল্লন :—"এসেছিস—বাঃ বেশ হয়েছে, আমি তোকে খবর দেবো ব'লে ভাবছিলুম।" তার পরে সেই পূর্ব্বের ন্যায় কাছে বসিয়ে গায় হাত বুলোতে বুলোতে আমার সুখ দুঃখের সকল কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। শেষে বল্লেন তোকে ওঁরি কথা বলেছিলাম উনিই আমার দাদা শ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজী। এঁরা যতদিন এখানে আছেন মাঝে মাঝে এখানে আসতে ভুলিসনি।"

যখন কীর্ত্তন হয় তখন হলের পশ্চাতের খড়খড়ি তুলে ২।৩ জন স্ত্রীলোককে সলজ্জ ভাবে বাবাজী মহাশয়ের দিকে চেয়ে থাকতে দেখেছিলাম। কীর্ত্তন হবার পরও ঐ স্ত্রীলোকগণকে ভিতরে যাতায়াত করতে দেখি। কেউ দিদি বলে

---

(৩) ভক্ত পাঠক ! অনুমানে বোধ হয় বুঝেছেন। ইনি আর কেহই নহেন—বাবাজী মহাশয়ের অত্যন্ত কৃপা প্রাপ্ত আমাদের পূজনীয় শ্রীরামদাস বাবাজী দাদা মহাশয়। সে আজ ২১।২২ বৎসরের কথা, এজন্য অনুমান হয় তখন উঁহার বয়ক্রম ১৭।১৮ বৎসর হইবে।

ডাকচেন একটী ছোট উড়িয়া বালক "মা" "মা" বলে ডাকচে। সব যেন গেরস্তের ঘরের ঝি বৌ। হাতে গয়নাদি নেই কিন্তু তুলসীর মালার সব অলঙ্কার আছে। আমরা আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবছি "একি ব্যাপার, এখানে স্ত্রীলোক সব কেন? এর ভিতরও কোন গুপ্ত ব্যাপার আছে নাকি?"

এমন সময়ে নবদ্বীপ দাদা বল্লেন—"দেখ! ওঁরা সব বেটা ছেলে, ঐরূপ স্ত্রীবেশে আছেন, পরে সব বুঝবি।"

দাদার কথা শুনে আমাদের আরও আশ্চর্য্য বোধ হলো।

আমরা নবাগত, এজন্য প্রথম প্রথম উঁহারা আমাদের খুবই লজ্জা' ক'রে ঘোমটা দিয়ে যাতায়াত করছিলেন। ক্রমে ক্রমে ওঁদের সে ভাবটা কেটে গেলো। দাদা একজনকে দেখিয়ে বল্লেন—"দেখ ওঁর নাম শ্রীললিতা সুন্দরী সময় মত ওঁর বিষয় বল'ব।"

তার পরে দাদার কাছে ব'সে ব'সে কত কথাই শুন্‌লাম ও বল্লাম। শেষে বাড়ী আসবার জন্য বাবাজী মহাশয়ের আজ্ঞা চাওয়াতে তিনি প্রথমে থাকতে বল্লেন কিন্তু আমাদের বাড়ী এখান থেকে বেশী দূর নয়, মাত্র ১॥০ ক্রোশ শুনে, যাবার অনুমতি দিলেন। আমরা পদরজ গ্রহণ ক'রে আবার কবে এখানে আসবো তাই ভাবতে ভাবতে বাড়ীর দিকে রওনা হ'লাম।

ক্রমশঃ

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট।

মহারাজা সুবর্ণ চরিত

ইহলোকে ধর্ম্মলাভের জন্য লোকে নানাপ্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকে, কিন্তু যে কর্ম্মে ভগবৎ সেবা সম্পর্ক নাই, ভুক্তির ক্ষণস্থায়ী নামমাত্র সুখ সংসর্গই তাহার ফল। স্ব স্ব নিষ্ঠানুসারে ভক্তি পূর্ব্বক ভগবানের আরাধনাই জীবের যথার্থ শ্রেয়। পত্র, পুষ্প, ফল জলাদি অনায়াস-লব্ধ উপচার লইয়া ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া সাধকের যেমন বিমল আনন্দ হয়, ভগবানও ভক্তের ভক্তিদত্ত উপহারে সেইরূপ সন্তোষ হন। পুরাণাদি ভক্তি-শাস্ত্র প্রণেতাগণ জীবের মঙ্গলের জন্য যে সকল ক্রিয়াযোগ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, সাধক মাত্রেই তাহার

সুফল অচিরে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এই ক্রিয়াযোগের শক্তি অতি আশ্চর্য্য। যে কোন প্রকারেই হউক, ইহার কিঞ্চিৎ আচরিত হইলেই ভগবৎ প্রীতি উৎপাদিত হইয়া থাকে, কারণ ভগবানের উদ্দেশে যে যাহাই করুক, নিস্কপট আচরণ হইলে কখনই তাহা বিফল হয় না।

রাজা সুবর্ণ বাহুবলে বহু রাজ্য জয় করিয়া মনে মনে বড়ই গর্ব্বিত হইলেন। গর্ব্ব মানুষ্যকে অন্ধ করে, জগতে সে কাহারও সদ্‌গুণ দেখিতে পায় না। যে পরের সদ্‌গুণ দেখিতে পায় না, সে যেমন নিজের সদ্‌গুণ রাশি হারাইয়া জনসমাজে ঘোর নিন্দাভাজন ও লোকমাত্রেরই বিরক্তি কর হয়, মহারাজা সুবর্ণেরও তাহাই হইল। ক্রমে ক্রমে সমুদায় সদ্‌গুণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। ইহলোকে সাধু ও অসাধু দুই প্রকৃতির লোক আছে, সাধু প্রকৃতি মহাত্মা ব্যক্তিগণ সদ্‌গুণশালী পুরুষেরই আনুগত্য করেন, কখনও সদ্‌গুণ বিহীন ব্যক্তির সংস্রবে পদার্পণ করেন না। বিশেষ কোন কার্য্যানুরোধ ব্যতীত দাম্ভিক লোকের সংস্রবে কোন ভদ্রলোকও যাইতে ইচ্ছা করেন না। স্বার্থপর ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তিগণই স্বার্থানুরোধে তাহাদের উপাসনা করে। সেইসকল স্বার্থপরায়ণ কুটিল চাটুকারগণের আপাত মধুর চাটুবাদে ভুজঙ্গের পয়ঃপানের ন্যায় কেবল তাহাদের দাম্ভিকতারূপ বিষ পরিবর্দ্ধিতই হয় মাত্র।

যে বৃক্ষে পক্ষী বসে না নিশ্চয়ই সেটা বিষবৃক্ষ, যাহার নিকট সাধুব্যক্তিগণ প্রীতি পাননা, নিশ্চয়ই সেটা দাম্ভিক অমানুষ। ভস্মকুণ্ড যেমন কুক্কুটেরই সুখাসন, ঐসকল সজ্জন-পরিত্যক্ত ব্যক্তিও সেইরূপ কুক্কুট তুল্য স্বার্থপরের আশ্রয়। স্বার্থান্ধ নৃপতির নিকট সাধুব্যক্তিগণ কেহ যাইতেন না, কারণ সেখানে সজ্জনের সমাদর ছিল না। মহারাজা সুবর্ণ রাজসভায় বসিয়া নিরন্তর আত্মশ্লাঘাই করিতেন, যেখানে আত্মশ্লাঘা, আত্মস্তুতির প্রাবল্য, সেখানে চাটুকারের প্রবল প্রতিপত্তিতো হইবেই, ক্রমে রাজা দুষ্টমন্ত্রীগণের ক্রীড়ামৃগ হইয়া পরিলেন। পাষণ্ডগণের কুপরামর্শে রাজার সমুদয় সৎকর্ম্মই তিরোহিত হইল, সৎকার্য্যে দান, সজ্জন প্রতিপালন, দেবার্চ্চন, অতিথি সৎকার, প্রভৃতি অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্মগুলিও তাঁহার নিকট বৃথা অর্থব্যয় বলিয়া বোধ হইল। এদিকে নৃত্যগীত, বেশ্যাপোষণ, কুলাঙ্গনার সতীত্বনাশ জন্য অর্থ-প্রলোভন, বিলাস-গৃহনির্ম্মাণ, পরিচ্ছদ, গৃহ-সজ্জা, কুসঙ্গীপালন প্রভৃতির অযথা ব্যয়ে ক্রমে যে রাজকোষ শূন্য হইতে লাগিল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। যাহার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অসৎ তাহার সকল কার্য্যই তদনুরূপ। রাজা দুষ্ট মন্ত্রীগণের পরামর্শে

বিরূপাক্ষ প্রজাগণকে পীড়ন করিয়া অর্থসঞ্চয়ের প্রশ্রয় দিতে লাগিলেন রাজ্যমধ্যে অত্যাচার-স্রোত প্রবাহিত হইল। ক্রমে সমুদয় লোকই তাঁহার ঘোরতর বিপক্ষ হইয়া ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিল। বিলাসী রাজা কিন্তু বিলাস-মত্ততার ঘোরে তাহার কিছুই জানিলেন না।

লোকের যখন এই প্রকার ভাবী অমঙ্গলের সূচনা হয়, পর-হিতাকাঙ্ক্ষী ধার্ম্মিক সুবিজ্ঞগণ সেই সময় তাঁহাকে সতর্ক হইতে সুপরামর্শ দেন, কিন্তু রাজার নিজ দোষেই সে মহৌষধির অভাব হইয়াছিল; ভাললোক কেহ তাঁহার নিকট যাইতেন না, যাইলেও সমাদর ছিল না। রাজা স্বয়ং মহাবিদ্বান্, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, কিন্তু হইলে কি হয়, স্বভাব ও সঙ্গী তাঁহার মোটেই ভাল ছিল না। "বিদ্যা বিনয়ং দদাতি" বিদ্যা হইতে বিনয় হয়, ইহা সমিচীন মিমাংসা কিন্তু, কেন জানিনা অনেক স্থানেই ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। স্বভাবের প্রভুত্ব সকলের উপরে। দাম্ভিকের বিদ্যা দাম্ভিকতাই বৃদ্ধিকরে; উদ্ধতের শাস্ত্রজ্ঞতা ঔদ্ধত্যেরই জননী। স্বভাব পরিবর্ত্তনের উপাদান বিমল বিবেক, বিদ্যা ও শাস্ত্রজ্ঞতা অবিবেকী রাজার গর্ব্বিত চিত্তে আরও গর্ব্ব মদিরা ঢালিয়া দিয়া তাঁহাকে ঔদ্ধত্যের চরমে তুলিয়াছিল। তিনি বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তির বিদ্বেষ করিতেন বলিয়া তাঁহাকে সদুপদেশ দিবারও কেহ ছিল না, থাকিলেও কেহ কিছু বলিতেন না, কারণ বিবেক বিহীন গর্ব্বিত ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে যাওয়াও বিপদের বিষয়।

"যৌবনং ধনসম্পত্তি প্রভুত্বমবিবেকতা।
একৈকমপ্যনর্থায় কিমযত্র চতুষ্টয় ॥"

যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব, অবিবেকতা, ইহার এক একটীই মহা অনর্থের হেতু, কিন্তু মহারাজা সুবর্ণের এই চারিটীই পরিপূর্ণরূপে ছিল, রূপ-যৌবনে গর্ব্বিত রাজা নিরন্তর লম্পট সহচরগণ লইয়া বেশ্যার মন্দিরে মন্দিরেই ভ্রমণ করিতেন। রাজার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা বেশ্যার নাম ছিল উজ্জ্বলা। একদিন রাজা সুবর্ণ উজ্জ্বলার গৃহে গমন করিলে, উজ্জ্বলা রাজাকে সমাগত দেখিয়া সসম্ভ্রমে অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা ও অভিবাদন করিল, সুবাসিত জলপূর্ণ ভৃঙ্গার লইয়া স্বহস্তে পদধৌত করিয়া দিল, এবং সাদরে বাহুযুগল আলিঙ্গন করিয়া পালঙ্কে বসাইল। রাজা উজ্জ্বলাকে বড়ভালবাসিতেন, প্রিয়তমাকে পার্শ্বে লইয়া আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন।

হায়! পরিণাম অন্ধ অবিবেকী মনুষ্য মোহবশে আপন পরিণাম বুঝিতে পারে না, ক্রূর কাল যে সম্মুখে বিশাল বদন ব্যাদান করিয়া আছে, তাহা দেখিতে পায় না। স্বকৃত পাপরাশি যে তিলে তিলে আয়ুক্ষয় করিতেছে, তাহা জানিতে পারে না; বিলাসী মূঢ় ব্যক্তিরা ভাবে, তাহার চিরদিনই বুঝি এমনি যাইবে, কিন্তু কৈ এমনিত যায় না। ঐদেখ মালাকার বোমে আগুন দিয়াছে, উহার উজ্জ্বল আলোকটী কেমন জ্বলিতেছে, মনে করিওনা যে উহা অমনিই জ্বলিবে, অবিলম্বেই উহা এমন ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া বিদীর্ণ হইবে যে, সমুদয় দর্শককেই চমকাইয়া দিবে। সেইরূপ এই দেহ ভাণ্ডের পরিণামও যেমন ভয়ঙ্কর তেমনিই আকস্মিক। এইজন্ত সকলকেই সর্ব্বদা পরকালের জন্ত প্রস্তুত থাকিতে হয়। সকল কার্য্য ফেলিয়া রাখা চলে, কিন্তু পরকালের কার্য্য ফেলিয়া রাখিতে নাই, কারণ মৃত্যুর সেই ভয়ঙ্কর দিন কাহাকেও বলিয়া কহিয়া সাবধান করিয়া আইসে না। অতএব লোক যত বিষয়ী হউক না, যত কেন বিলাসী হউক না, তাহার মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াও কিছু কিছু সুকৃতি সঞ্চয় করিয়া পরকালের সম্বল করিতে হয়। সুকৃতির শক্তি অসীম, যাহার যেমন পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি থাকে, ইহজন্মে তাহার তেমনই ভোগ হয়। কিন্তু এই ভোগরূপা সুকৃতিই যে জীবের পর্য্যাপ্ত, ইহা কখনও মনে করিও না। উহা জীবকে ক্ষণিক সুখ দিতে পারে মাত্র, একেবারে নির্ভয় করিতে পারে না, পরন্তু ভগবৎ সেবাদি জনিত যে সুকৃতি সঞ্চিত হয়, উহার অতি অল্পও মনুষ্যের মৃত্যুকালের মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে। মানুষ যতই কেন সাময়িক সুখে আসক্ত থাকুকনা যাহার পূর্ব্বজন্মকৃত বা ইহজন্মকৃত ভগবৎপ্রীতি আছে তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে অজ্ঞাতসারে আপনিই উদয় হয়, বাহিরের ভাব দেখিয়া কখনও মনে করিতে নাই যে, এই ব্যক্তি স্বর্গে যাইবে, বা এই ব্যক্তি নরকে যাইবে, প্রাক্তণগর্ভে কাহার কি সুকৃতি বা দুষ্কৃতি আছে তাহা সাধারণের দুর্জ্ঞেয়।

উজ্জ্বলা স্বহস্তে রাজার জন্ত একগাছি চম্পক পুষ্পের মালা গাঁথিয়া ছিল, উপযুক্ত সময় বুঝিয়া সে রাজার হস্তে সেই মালা প্রদান করিল, রাজাও চম্পকের সেই মনোহর গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া যেমন হাত পাতিয়া মালা গ্রহণ করিলেন, অমনি সহসা রাজার হস্তস্থিত মালা হইতে একটি চম্পক স্খলিত হইল, স্খলিত মাত্র ভূমিতে পতিত হইতে হইতেই রাজা সসম্ভ্রমে "নমোনারায়ণ" বলিয়া ভূমিতে

প্রণাম করিলেন। চম্পকপুষ্প হরিকে নিবেদিত হইল জানিয়া রাজার মনে মনে না জানি পূর্ব্বজন্মকৃত কোন্ সুকৃতি বলে সহসা একটা সাত্ত্বিক আনন্দ আসিয়া মলিন চিত্ত ক্ষণকাল মধ্যে নির্ম্মল হইয়া গেল। তিনি যখন সেই আকস্মিক ঘটনা ভাবিতে লাগিলেন, এমন সময় হঠাৎ কতকগুলি বিদ্রোহী নগরবাসী বলপূর্ব্বক সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া নিঃসহায় রাজাকে বিনাশ করিল, মৃত্যু শয্যায় শায়িত রাজা সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন, ভীষণাকৃতি যম কিঙ্করগণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া চর্ম্মময় পাশে তাঁহাকে বন্ধন করিতেছে, রাজা মহাভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিলেন। এমন সময় সহসা "মাভৈঃ মাভৈঃ" শব্দে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী বিষ্ণুদূতগণ গরুড়ারোহণে আগমন করিয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়া তাঁহার পাপ মোচন করিলেন, বিষ্ণুদূতগণের এই সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিয়া যমদূতগণ ভয়ে পলায়ন করিল। এদিকে রাজা বিষ্ণুদূতগণের দর্শনে নিষ্পাপ হইয়া দেহত্যাগ পূর্ব্বক দিব্যরূপ ধারণ করিলেন। বিষ্ণুদূতগণের দর্শনে রাজার এরূপ হওয়ায় মহৎ সাঙ্গরই মাহাত্ম্য ঘোষিত হইতেছে। পক্ষান্তরে রাজার পূর্ব্বজন্মকৃত সুকৃতির আভাষও আসিয়া পড়িল। বিষ্ণু পার্ষদগণ তাঁহাকে পীতবসন, তুলসীমালা, ও স্বর্ণালঙ্কার দ্বারা বিভূষিত করিয়া দিব্যরথে বৈকুণ্ঠে লইয়া চলিলেন, তাঁহাদের হস্তস্থিত পবিত্র শঙ্খ-ধ্বনিতে দশদিক মুখরিত হইয়া উঠিল, দিব্য দেহে ঋষিগণ পুণ্যবান্ রাজার স্তব করিতে লাগিলেন। রাজা সমুদয় পাপ বিরহিত হইয়া শ্রীহরির সালোক্য মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন।

পাঠকগণ, দেখুন অযত্নতঃ একটী চম্পক হরির উদ্দেশে প্রদানের কত মাহাত্ম্য। যখন অযত্নতঃ প্রদানে এত তখন ভক্তিপূর্ব্বক পূজার যে কি মাহাত্ম্য তাহা আর কি বলিব। ভগবান রাজাকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন দিয়া মধুর সস্নেহ বাক্যে বলিলেন—

নমো নারায়ণায়েতি বারৈকমপি যো বদেৎ।
নিত্য তস্যানুপাল্যোঽহং স মে মাতা স মে পিতা॥
নারায়ণেতি মন্নাম কদাচিদ্ যঃ স্মরেন্নরঃ।
সাধয়ন্নখিলং তস্য পিতু পুত্রইবোত্তম॥ পদ্মপুরাণ।

"নমো নারায়ণায়" এইবাক্য একবার যে বলে, সে আমার মাতা, সে আমার পিতা, আমি তাহার অনুপাল্য অর্থাৎ তাহার ভক্তিদত্ত সেবায় আমি নিত্য

পালিত হই। আমার নারায়ণ নাম কখনও যে স্মরণ করে, পিতা পুত্রের ন্যায় আমি তাহার অখিল কামনা পূর্ণ করি।

আহা! তুমি পূর্ণ, তোমাতে যাহা কিছু সমস্তই পূর্ণ, তাই ভক্তকে বর দিতে তোমার নাম ভক্তবৎসল। ভগবান শ্রীহরি আজ মুক্ত হস্তে রাজাকে বরদিতে চাহিতেছেন, কিন্তু রাজা আর কিছুই চাহিতেছেন না। চাহিবেনই বা কি? ভগবানকে পাইয়াছেন ইহার বেশী চাহিবার আর কি আছে?

ধ্রুবের বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়াও আমরা দেখিতে পাই যখন ভগবান ধ্রুবকে বর দিতে চাহিলেন ধ্রুব তখন বলিয়াছিলেন—

হে ভগবান, আমি সামান্য রাজত্ব প্রার্থনা করিয়া তপস্যা করিয়াছিলাম কিন্তু ভাগ্যক্রমে তোমাকে পাইয়াছি এটী ঠিক কাঁচ অন্বেষণ করিতে যাইয়া বহুমূল্য রত্নলাভের ন্যায় হইয়াছে কাজেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আমি তোমার ঐ পদযুগল ভিন্ন আর কিছুই চাহি না। এখানে মহারাজা সুবর্ণও ভগবানের দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তথাপি পুনঃ পুনঃ ভগবানের আদেশে কেবল এই চাহিতেছেন যে, "তোমার প্রতি এইরূপ প্রীতি হইতে যেন কখনও বিচ্যুত না হই।" ভগবান রাজাকে স্বীয় ক্রোড়ে বসাইয়া বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত বিবিধ আভরণে স্বহস্তে ভূষিত করিলেন, রাজা বিষ্ণুমন্দিরে এক সহস্র মন্বন্তর পর্য্যন্ত এইরূপ দেবদুর্ল্লভ সুখ ভোগ করিলেন। পরে পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া রাজ চক্রবর্ত্তী হইয়া নয় সহস্রবৎসর পর্য্যন্ত প্রজা পালন করিলেন। বিষ্ণুদর্শন-প্রভাবে মুক্ত রাজার জাতিস্মরত্ব থাকায় আর পাপ প্রবৃত্তি হইল না, শুদ্ধচিত্তে রাজা নিরন্তর চম্পক পুষ্পের দ্বারা হরির অর্চ্চনা করিয়া অন্তে গঙ্গায় সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইলেন।

পাঠকগণ! সকাম বৈধী পূজাদির এই গতি, কিন্তু নিষ্কাম রাগ মার্গীয় সেবার গতি ইহার অনেক উচ্চে, তাই ভক্ত এমন গতিকেও তুচ্ছ করিয়া, কেবল প্রেম ভক্তিতে নিজ প্রিয়ের সেবা-সুখে মগ্ন থাকেন, যাঁহারা নিতান্ত বিষয়াবদ্ধ তাঁহাদের জন্যই ঋষিগণ এই আশুফলপ্রদ ক্রিয়াযোগ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। অতএব যাঁহারা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি বিশুদ্ধ ভক্তি যাজনে অক্ষম, তাঁহারা এই সকল ক্রিয়াযোগের আশ্রয়ে পরকালের জন্য নির্ভর হউন।

শ্রীকৃষ্ণদাস পাণ্ডে।

'তরজা'

"বাউলকে কহিয় লোকে হইল আউল।
বাউলকে কহিয় হাটে না বিকায় চাউল।
বাউলকে কহিয় কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিয় ইহা কহিয়াছে বাউল॥ (চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৯)

৺রাধিকা নাথ ভাগবতভূষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—"বাউলকে (উন্মত্তকে) আউল (সুবিধা)। আভ্যন্তরিক অর্থ এই যে, লোক প্রেমে উন্মত্ত হইল, সকলেই প্রেমে উন্মত্ত হওয়াতে গ্রাহক অভাবে আর প্রেমধন বিক্রয় হয় না। প্রেমে জগৎ পূর্ণ হওয়াতে তদ্‌গ্রহণের ব্যক্তি না থাকায় প্রেমদান কার্য্যের সুবিধা নাই। তবে কি না শ্রীঅদ্বৈত প্রভু জগতে প্রেমদিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যকে লইয়া আইসেন এক্ষণে তাহা পূর্ণ হওয়ায় তাঁহাকে স্বধামে বিদায় দিলেন। ঈশ্বরাবতারের নিয়ম এই, জগতের উপকারের নিমিত্ত কোন যোগ্য ভক্ত ঈশ্বরকে আবাহন করেন; কার্য্য শেষ হইলে স্বধামে বিদায় দেন। যেমন অসুর সংহারাদির নিমিত্ত ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া কার্য্যশেষে স্বধামে বিদায় দিয়াছিলেন, তেমনি অদ্বৈতপ্রভু জগতে প্রেমদান নিমিত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে আনিয়া কার্য্য শেষে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। ইহা—"প্রভু কহে আচার্য্য হয় পূজক প্রবল," ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্টই ব্যক্ত আছে"

৺জগদীশ্বর গুপ্ত ব্যাখ্যাকরিয়াছেন:—"লোকসকল উশৃঙ্খল হইয়াছে, ধর্ম্ম আর কেহ লইতেছে না। তৎকালে বৈষ্ণব জগতের উশৃঙ্খল ভাব ও ধর্ম্মহীনতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বোধহয় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য এই তরজা পাঠাইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর মৌনভাব ও স্বরূপের বিমনস্ক ইহাই প্রমাণ করিতেছে।"

বিগত ২০শ বর্ষের ১ম সংখ্যা ভাদ্রমাসের ভক্তিতে "প্রভুর অপ্রকট" প্রবন্ধের মধ্যে এবং ৭ম সংখ্যা ফাল্গুনের ভক্তিতে "তরজার ব্যাখ্যার প্রতিবাদ" প্রবন্ধে উল্লিখিত ভাবের ব্যখ্যার মতদ্বৈধ ভাবে বাদানুবাদ

* কোন কোন পুস্তকে "বাউলকে কহিও লোক হইল বাউল" এইরূপ পাঠ আছে।
(ভঃসঃ)

দেখিলাম। আমি দীনাতিদীন বালক উক্তবিধ ব্যাখ্যাকারগণের ও সমালোচকগণের চরণে প্রণত হইয়া যৎসামান্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

"সর্ব্ব অবতার সার গোরা অবতার।"

কিজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু সকল অবতারের সার হইলেন, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ,—আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমধন অযাচিত ভাবে বিলাইয়া দিয়াছেন, অদ্যাবধিও দিতেছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুই হরিনামের মূর্ত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন রূপেই তাঁহার আবির্ভাব ও লীলা।

মহাবিষ্ণুর অবতার গৌরআনা গোসাঞি শ্রীঅদ্বৈত প্রভু কলি-কবলিত পাপাচারী অল্পায়ু, ধৈর্য্যহীন, সাধনভজনে অক্ষম জীবগণের প্রতি অসীম দয়াপরবশ হইয়া গঙ্গাজলতুলসী দিয়া বহু আরাধনা করিয়া নিত্যলীলাময় গোলোকবিহারীকে এই মর্ত্ত্যধামে আনিলেন। এই অদ্বৈতের আনা প্রভুই নবদ্বীপে শচীর দুলাল, শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবে সমস্ত দেশবাসী ধন্য হইল। কারণ, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে ধ্যান, যজ্ঞ, সেবা অর্চ্চনাদি কঠোর তপস্যাদ্বারা যে ধনের অধিকারী হইত, এই কলিযুগে প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই তাহা প্রদান করিলেন। তাই ভক্তকবি গাহিয়াছেন :—

"প্রণমহ কলিযুগ সর্ব্বযুগসার, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন যাহাতে প্রচার।"

এই সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই নাম-প্রেমদিয়া সমস্ত বিশ্বকে ধন্য করিলেন।

ইহা যে কেবল গ্রন্থাদির মুখস্থকরা বুলি তাহা নহে। যে সকল মহাভাগ্যবানগণ শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনের পক্ষপাতী তাঁহারা সকলেই উক্তবিধ শ্রীনাম-মাহাত্ম্য ও প্রেমরস আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। বিশেষতঃ এই শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনের গৌরব মূর্খ, নীচ, অধমগণের দ্বারাই রক্ষা হইতেছে বলিতে হইবে। কিছুদিন পূর্ব্বেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেরন্যায় বিদ্যা, পাণ্ডিত্য ও জাত্যাভিমানী ভদ্রমহোদয়গণ সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্যাদি অশ্লীল বলিয়া মনে করিতেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট হইতে একমাত্র মূর্খ, নীচ, অধমগণের জন্যই প্রেম চাহিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও নির্হেতু, অমায়ায় তাহাই দিয়াছিলেন, তাই আজপর্য্যন্তও উক্তবিধ নীচ-ভাবসম্পন্ন লোকের মধ্যে প্রেমধর্ম্ম প্রবলতর।

এইপ্রকারে জগতে যখন প্রেম প্রচারের কার্য্য শেষ হইল, এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভু কাশীমিশ্রালয়ে গম্ভীরা মন্দিরে রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া রাত্রিদিন শ্রীকৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল তখন তাঁহাকে স্বধামে (নিত্যলীলার স্থান গোলকে) পাঠাইয়া দেওয়াই সঙ্গতবোধে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তরজায় শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মনোগত ভাব জানাইলেন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর কৃপায় ইহাই জানাযায়। তারপর এই তরজায় অন্য কোনপ্রকারের নিগূঢ় ব্যাখ্যা নিহিত থাকিলে তাহা একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এবং বর্ত্তমানে স্বরূপ দামোদরের ন্যায় প্রভুর কোন অন্তরঙ্গ ভক্ত থাকিলে জানিতে পারেন অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

তবে এখানে যদি এই কথা বলা যায় যে, তখন লোকসকল উশৃঙ্খল হইয়াছে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ কেহ মানিতেছে না; সুতরাং বিফল-মনোরথ হইয়া প্রভুকে ফিরিয়া যাইতে হইল। তাহা হইলে এই বাক্যদ্বারা সর্ব্বাগ্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভগবত্তাই টিকে না। গৌরের ভক্ত, "ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।" কিন্তু সাক্ষাৎ প্রভুই যদি জীবোদ্ধার রূপ সাধারণ কার্য্য সম্পন্নকরিতে অক্ষম হন তবে ভগবানের ভগবত্তা কোথায়? তাহাহইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদ্ভক্তগণের বাক্যাবলির উপর আস্থা-শূন্যপ্রায় হইতে হয়।

২০শ বর্ষ ১ম সংখ্যা ফাল্গুনের ভক্তিতে "তরজাব্যাখ্যায় প্রতিবাদ" প্রবন্ধে "বাউল শব্দের যে ব্যাখ্যা দেখিলাম তাহাও সত্য। তবে সেই প্রকার ধর্ম্ম-বিপ্লব ও শাস্ত্রের বিবর্ত্তবাদ ব্যাখ্যা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনেক পরে। এখানে ইহাও বলাবাহুল্য যে, উক্তবিধ বাউলগণের ভ্রষ্টাচার না থাকিলে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাইতনা এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ভজন অত্যুচ্চ আদর্শস্থানীয় বলিয়া অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইত না।

উক্তবিধ বাউল সম্প্রদায় যে আধুনিক তাহায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ ২।৪টি কথা না বলিলে নয় তাই লিখিতেছি। আশাকরি আদোষদর্শী পাঠক-গণের নিকট ক্ষমা পাইব।

কলিঘোর তমসাচ্ছন্নান্ সর্ব্বানাচারবর্জ্জিতান্
শচীগর্ভে চ সম্ভূয় তারয়িষ্যামি নারদ॥ (বামনপুরাণ)
অন্যাবতার বহব সর্ব্বসাধারণোক্তযাঃ।
কলৌ কৃষ্ণাবতারোঽপি গূঢ়সন্ন্যাসিরূপধৃক্॥ (জৈমিনি ভারত

শ্রীভগবান্ দেবর্ষি নারদকে বলিলেন, হে নারদ! আগত ঘোর কলিতে লোকসকল আচারভ্রষ্ট হইলে ঘোর পাপী হইবে। আমি সেইকালে শচী-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া (নামসংকীর্ত্তন দ্বারা) সমস্ত পাপীকে উদ্ধার করিব।" কলিযুগে পাপী একজনও উদ্ধারের বাকী থাকিবে না শুনিয়া ধর্ম্মরাজ যম অত্যন্ত ভীত হইলেন, এবং দণ্ডপাষাদি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট ফেলিয়া দিয়া বিনয় বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগে মর্ত্ত্যধামে গিয়া শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা পাপীতাপীকে উদ্ধার করিবেন। সুতরাং আমার (যমের) আর অধিকার রহিল না।" এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য বলিলেন :—

সত্যং বদামি হে রাজন্ শৃণু ত্বং হি মহামতি।
কলৌ ধর্ম্ম-বিনাশায় জাতয়িষ্যামি ভূতলে॥

"আমি নিজে কলিকালে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম গ্রহণ করিব ও স্বমত স্থাপন করিয়া উক্তবিধ ধর্ম্মাচারী নরনারীগণকে বৈষ্ণবাচার-ভ্রষ্ট করিব। অধিকাংশ নরনারীই আমার মতে আসিবে। কারণ কলি-কালের নরনারীগণ স্বভাবতঃই ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র সুতরাং গৌড়ীয়-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রিয়াদির সম্ভোগ্য আচার দ্বারাই অধিকাংশ নরনারী সুবিশুদ্ধ বৈষ্ণবাচার হইতে ভ্রষ্ট হইবে। মুখে প্রেমালাপ করিবে কিন্তু অন্তরে কামবৃত্তি পোষণের চেষ্টায় থাকিবে। কামবৃত্তি চরিতার্থই প্রেমপ্রয়োজন বলিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিব।" ইত্যাদি বহুবিধ অশ্লীল ভাবও ইহাতে ব্যক্ত আছে যাহা আজকাল স্বচক্ষে দেখাযায়, প্রকাশ অনাবশ্যক।

শ্রীভগবান বামনরূপে বলিকে ছলনাকালে বলিগুরু শুক্রাচার্য্যকে চক্ষু কাণা করিয়া অপমান করাই এই ক্রোধের প্রধান কারণবলিয়া প্রকাশ আছে।

শুক্রাচার্য্যের আবির্ভাব মূর্ত্তিই শ্রীরূপকবিরাজ বলিয়া আখ্যাত। এই রূপকবিরাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যে সকল শিষ্যশাখা করিয়া-ছিলেন তাহারাই বাউল নামধারী বর্ত্তমানে আচারভ্রষ্ট বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত।

এই রূপকবিরাজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকট কালের অনেক পরে। কারণ, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদের শিষ্য শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামী,

শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামীর শিষ্য শ্রীরূপ কবিরাজ। ইহাতে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনেক পরে রূপকবিরাজের আবির্ভাব।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, সুবিশুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্যশাখা হইয়াও রূপকবিরাজ এইপ্রকার ধর্ম্ম বিগর্হিত সর্ব্বনাশেরকার্য্য করিলেন এ কিরকম!

ইহার কারণ, রূপকবিরাজ শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামীর নিকট শিক্ষানিয়া স্বমত স্থাপনের জন্য শাস্ত্রের রুচিসম্পন্ন কূট মীমাংসাদ্বারা লোকসমাজে (তদপেক্ষা হীনজনের নিকট) পাণ্ডিত্য দেখাইয়া বহু নর নারীকে মন্ত্র (পরমহংস চৈতন্য মন্ত্র) দিয়া শিষ্য করিলেন। ইহাতে শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামীর নিকট অপরাধী ও দীক্ষাগুরু শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর নিকট অপরাধী হইয়া বিতাড়িত হইলেন। দীক্ষাগুরুর নিকট হইতে বিতাড়িত হওয়ার কারণ, গুরুমাতা গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীমহাশয়ের পত্নীর শঙ্খ পরিহিত হস্তায় ভক্ষনে অমত ও ঘৃণা প্রকাশ; যেহেতু রূপকবিরাজ সন্ন্যাসী ছিলেন।

যাহাহউক যতদূর জানা যায়—মোটকথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে, তাঁহার প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মে কোনপ্রকার চাঞ্চল্য দৃষ্ট হয় নাই। যত গোলমাল পরবর্ত্তী সময়ে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে অবতার সাজিয়া ধর্ম্মের ভাণকরিয়া লোক-প্রতারণায়।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই বুঝাযায় যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অনেক পরে বৈষ্ণব সমাজ উশৃঙ্খলভাব ধারণ করে। এইজন্য তরঙ্গার শেষোক্ত ব্যখ্যা ও প্রতিবাদের সম্পূর্ণ সমর্থনকরা যাইতে পারে না।

এখানে আরও বলাযাইতে পারে যে, কলিজীবের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া যে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া হাঁ কৃষ্ণ, হাঁ কৃষ্ণ, বলিয়া সুরধুনী তীরে তীরে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছেন, সেই কলিজীব যদি শ্রীঅদ্বৈতের আনা প্রভুর নাম-প্রেমে প্রমত্ত না হইত, তবে যে আরও কত কাঁদিতেন, কি করিতেন, কে জানে! বরং শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবে জীবগণ ধন্য হওয়ার বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। তাই এখন দেখিয়াছেন জগৎ প্রেমে পূর্ণ "শান্তিপুর, ডুবু ডুবু ন'দে ভে'সে যায়। (প্রেমে) পার ভাঙ্গিয়ে ঢেউ আসিয়ে লাগ্‌লো জীবের গায়" ॥

এখন যেখানের বস্তু সেইখানে পাঠাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। নিত্যলীলাময়

গোলকনাথ নিত্যগোলকে আসিলেই তাঁহার সুখ ও আনন্দ। এই ভাবিয়াই বোধহয় শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তরজা পাঠাইয়াছিলেন।

আজ আমিও কৃপাময় পাঠকগণের সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপার ও নির্হেতু কৃপার কথা স্মরণ করিয়া জন্ম-জন্মান্তরে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিতে বাঞ্ছা করি। জয় শ্রীগৌরাঙ্গ। *

শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী (ভক্তিরত্ন)

* এই তরজার সম্বন্ধে কয়েকবারই ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা আমরা প্রকাশ করিলাম। অবশ্য যিনি যেটী ভাল বুঝিয়াছেন তিনি তাহাই সত্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কোনটী যে ঠিক তাহা বলিতে পারিনা। আগামী বারে আমরা বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ লেখক বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতামত প্রকাশ করিব। বলাবাহুল্য অতঃপর এসম্বন্ধে প্রতিবাদ ছাপিবার আর সুবিধা হইবেনা। (ভঃসঃ)

প্রাপ্ত-গ্রন্থ-সমালোচনা

১। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুয়ানী—শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর লিখিত। মূল্য ।• চার আনা। কাশীধামে মহামণ্ডলাশ্রমে পাওয়া যায়। "ত্রিশূল" নামক মাসিকপত্রে পূর্ব্বে ইহা প্রকাশ হইয়াছিল এক্ষণে গ্রন্থকার স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে উহা ছাপাইয়াছেন। বর্ত্তমান ধর্ম্ম-বিপ্লবের দিনে এরূপ গ্রন্থ প্রচার হওয়া মন্দনয়। আমরা এ গ্রন্থের কিছু কিছু বিবরণ পাঠকগণকে উপহার দিবার ইচ্ছা করিয়াও স্থানাভাবে এবার দিতে পারিলাম না। সুবিধা হইলে সময়ান্তরে দিব। গ্রন্থকার এইপুস্তকের কাপিরাইট্ সাধারণে অর্পণ করিয়াছেন এবং "যে কোনও হিন্দুসভা সমিতি ইহা নিজব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া প্রচারকরিতে পারেন" বলিয়া আদেশ দিয়াছেন, ইহাতে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য অতিমহৎ বলিয়াই মনেহয়। কারণ সমাজের উশৃঙ্খলতা দূর করিয়া যথার্থ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুয়ানী রক্ষাকল্পে এ গ্রন্থের যত বেশী প্রচার হয় ততই মঙ্গল। মোটের উপর এ গ্রন্থের বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মঙ্গল হউক ইহাও আমাদিগের প্রার্থনা।

২। পুরাণ-তত্ত্ব। (প্রথমখণ্ড)—শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ ভারতী কর্ত্তৃক

ব্যাখ্যাত এবং কাশীধাম ব্রাহ্মণরক্ষা সভার আনুকূল্যে শ্রীশ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য।/০ পাঁচআনা। এ গ্রন্থখানিও "ত্রিশূল" পত্রে প্রকাশিত "শাস্ত্রালাপ" প্রবন্ধের পুস্তকাকারের সংস্করণ। এখানি পাঠকরিয়া আমরা অনেক কথা নূতন শুনিতে পাইলাম। ভারতীমহাশয় প্রথমেই পুরাণের রচয়িতা ও লেখক লইয়া খুব নাড়াচাড়া করিয়াছেন তিনি বলেন "অষ্টাদশ পুরাণের একখানিও বেদব্যাসের লিখিত বা রচিত নয়। বেদ যেমন ব্রহ্মার মুখহইতে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল যাবতীয় পুরাণও সেইরূপ ব্রহ্মার মুখহইতে প্রকাশ হইয়াছে।" প্রশ্নোত্তরছলে ভারতী মহাশয় অনেক সুন্দর কথাও বলিয়াছেন যদিও সকলগুলি আমাদের মতের সহিত মিল হয় না তথাপি ভারতী মহাশয়ের এ চেষ্টা প্রসংশনীয়। যাহাহউক ভারতীমহাশয় প্রথম খণ্ডে যতদূর বলিবার বলিয়া দ্বিতীয় খণ্ডে আরও নূতন কথা শুনাইবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন আমরা প্রথম খণ্ড দেখিয়া আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না। দ্বিতীয় খণ্ডের আশায় রহিলাম। ভালহউক মন্দহউক নায়ক নায়িকার মিলন ও বিরহের কচ্‌কচি না হইয়া হিন্দুর প্রাচীন শাস্ত্রাদি লইয়া এভাবে আলোচনা করা আমরা মন্দ বলিতে পারি না। এইভাবে আলোচনা করিতে করিতে যদি মূল গ্রন্থের উপর সাধারণের শ্রদ্ধা হয় তাহাতে বড় কম লাভ নহে।

সমালোচক।

সম্পাদকীয়

৺শারদীয়া পূজাবকাশে অনেকে স্থানান্তরে যাইয়া থাকেন বিশেষতঃ স্কুল কলেজ আফিস আদালত বন্ধ থাকে। এদিকে ভাদ্রমাসের পত্রিকা যাহা ভিঃ পি করা হইল তাহার টাকা পাইতেও বিলম্ব হইবে এই সকল কারণে আশ্বিন ও কার্ত্তিক দুই মাসের পত্রিকা কার্ত্তিক মাসের প্রথমে বাহির হইবে। যথাসময় আশ্বিনের পত্রিকা না পাইয়া কেহ চিন্তিত হইবেন না।

ভক্তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

(২১শ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা, আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩২৯ সাল)

প্রার্থনা

"নাশ অভাব কুভাব কামনা, আর নূতন বাসনা দিও না
দিয়ে দরশন হে প্রাণরমণ জুড়াও তাপিত জীবনে।"

দয়াময়! কামনায় ম্লান হইয়া মনের দুর্ব্বলতায় তোমার নিকট নিরন্তরই নানাবিধ অনিত্য বিষয় কামনা করিতেছি, ফলে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখই বাড়িতেছে। এক একবার মনে হয় আর কিছু চাহিব না, যখন যে ভাবে রাখিবে তাহাই ভাল বলিয়া আনন্দে গ্রহণ করিব, কিন্তু ইচ্ছাময়, তোমার কৃপাভিন্ন তো তাহাও হইবার উপায় নাই, আমার ইচ্ছায় যদি কিছু হইত তবে তো আমি নিরন্তর সুখ ভোগই করিতে পারিতাম, কেন না আমি তো আর সুখ ছাড়া দুঃখ চাই না, ভাব ছাড়া অভাব প্রার্থনা করি না। যাহা হউক এমন করিয়া অভাবের বোঝা মাথায় করিয়া আর ঘুরিতে পারি না, আমাকে এ ঘোরা ফেরার দায় হইতে নিষ্কৃতি দাও। যাহা হইবার হইয়াছে আর নূতন করিয়া বাসনার সৃষ্টি করিতে দিও না। নিত্য নূতন নূতন কামনা বাসনার ঘাত প্রতিঘাতে হৃদয় বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, স্বভাবতই আমি সৎসঙ্গ হীন অজ্ঞানন্ধ, তাহার উপর আবার কখন কুলের, কখন ধনের, কখনও বা বিদ্যার গরবে একেবারে উন্মত্ত হইয়া ঘোর অন্ধকারে নিপতিত হই। কি করিলে যে আমার এ অজ্ঞানতা দূর হইবে বুঝিতেছি না, যদিও কখন কখন তোমার কৃপায় সাধুসঙ্গ ঘটে কেন জানি না আমার দুর্দ্দৈববশে তাহাতে ফল বিপরিতই হয়। আমার মলিন হৃদয়ের জন্য সাধু ভক্তের উপদেশ কার্য্যকরি হয় না।

তাই আজ অভাবের জ্বালায়, কামনা বাসনার তাড়নায় বিব্রত হইয়া তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি,কৃপা করিয়া আমার নিত্য নূতন নূতন কামনা করিবার প্রবৃত্তি দূর ক'রিয়া দাও, আমি তোমার মঙ্গলময় শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া যখন যে ভাবে রাখ তাহাই তোমার অনুপমেয় মহিমা ইহা বুঝিয়া তোমার ভাবে বিভোর থাকি। কৃপাময়, কৃপা কর।

বিশ্বরূপের সঙ্গীত

(৩)

৫।—কাঁচা সোণার বর্ণ ধ'রেছে রে (ধনি) চিন্‌লি কি তারে
হল্‌কয়া তার রূপের বাহার কেবল বাহিরে।
(ওসে) কুল মজানা কুটীল কালা গো—
আছে লুকায়ে তার অন্তরে ॥

রূপে ভুবন আলো ক'রেছে,
(কত) চাঁদ খ'সে তার পদে প'ড়ে শরণ নিয়েছে,
প্রতি পদনখে চাঁদ ঝলকে গো—
আছে কালাচাঁদ তার ভিতরে ॥

গা ঢাক্‌লে কি আর স্বভাব চাপা যায়,
(ঐ যে) আঁকা বাঁকা চাল চলন আর বাঁক নয়নে চায়,
আর ভঙ্গিতে আর ইঙ্গিতে ঐ গো—
দের পরিচয় সব মিল ক'রে ॥

যত্নে রাধা নামটী কভু গায়,
এক পদে আর পদ দিয়ে হেলিয়ে দাঁড়ায়,
তোরে বলব কি সে এমনি হেসে গো—
কভু বাঁশী ধরে অধরে ॥
(গৌর-গোবিন্দ ছাঁদে দাঁড়ায়ে)

যদি দেখ্‌লি পুনঃ কেশনা কেমন মেনা,
আর বিশ্বরূপ ওরূপ দেখিতে র'য়েছে কি আশা,
যা রূপ রেখে আগে প্রাণ সঁপে আর গো—
(তার)   গুণের খবর নিস পরে ॥

সম্পাদক—

ভ্রমই পতনের মূল

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত স্তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ ॥
(মোহমুদ্গর—নবম পর্ব্ব।)

খেলায় আসক্ত যত বালকের দল। তরুণীতে অনুরক্ত তরুণ সকল ॥
সংসার চিন্তায় মগ্ন বৃদ্ধ সমুদয়। পরম ব্রহ্মেতে লগ্ন কেহই ত নয় ॥

অঘটন ঘটন পটীয়সী সুদুস্ত্যজ্য মায়ার প্রলোভনে পড়িয়া জীব বাল্যকাল হইতে শেষ দশা পর্য্যন্ত কত রকমের খেলাই খেলিতেছে, কিন্তু বুঝিতে পারিতেছে না যে, এই সকল খেলার জের মিটাইতে এইরূপ ও অন্যরূপ আর কত জন্মই ইহার পর আবশ্যক হইবে। জীব বিবিধ রূপ অবৈধ ব্যাপারে জীবনের সমস্ত মূল্যবান সময়ই বৃথা নষ্ট করে। একবারও ভাবে না যে, যে তত্ত্বজ্ঞান ও তুরীয় বস্তু লাভের জন্য এই সুদুর্লভ মানব জন্ম গ্রহণ করিলাম, তাহার কি করিলাম। যে ভগবৎ পাদপদ্মাসব পান করিলে আনন্দাতিশয্যে, রমণী, রত্ন, রত্নাদির বাসনা বা আসক্তি এমন কি দেহাত্মবুদ্ধিরও লোপ হয়; সেই পরম পদার্থ হেলায় হারাইয়া খেলার নেশাতে, কণ্টকাকীর্ণ এই কেতকী কাননে প্রবেশ পূর্ব্বক কেবল গন্ধ লোভে এমন মুক্তি-সাধক জনম বৃথা নষ্ট করিলাম অর্থাৎ পুষ্প রজে অন্ধ ও কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত হইয়া প্রাণ হারাইলাম। কি ভ্রম! পদ্ম ভ্রমে কেতকীতে পড়িয়া মরিলাম।

ভ্রমর মধুপানাভিলাষে প্রথমত প্রস্ফুটিত উৎপলোপরি উপবেশন করে। পরে মধুপানানন্দে এতই আত্মহারা হইয়া উঠে যে নলিনী নায়ক অস্তমিত হইলে পর

যখন নলিনী সঙ্কুচিত ও মুদ্রিত হয়, তখনও ঐ উন্মত্ত ভ্রমরের চৈতন্য না হওয়ায় ঐ মুদ্রিত পদ্ম-মধ্যেই আত্মহারা অবস্থায় বাস করে। ভ্রমর প্রকৃতই আত্মজ্ঞান শূন্য হয় তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ আত্মজ্ঞান থাকিলে, ভ্রমর যে দন্ত দ্বারা কাষ্ঠ মধ্যে কোটর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে, সেই দন্ত দ্বারা অতি কোমল পদ্ম কেশরকে অনায়াসে ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে পারে। কিন্তু পদ্মের মধু পানে বাহ্যজ্ঞান শূন্য তাই আপনাকে আপনি ভুলিয়া, পরমানন্দে আবদ্ধ অবস্থাতেই নলিনী হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থান করে। প্রকৃত বৈরাগ্য-গুণ-সম্পন্ন মহাত্মাগণও ঐ সারভুক ভ্রমরের ন্যায় ভগবৎ পাদ-পদ্ম-মকরন্দ পানে বিমুগ্ধ হইয়া ঐরূপ বাহ্য-জ্ঞান শূন্য অবস্থাতেই ভগবচ্চরণারবিন্দে লীন হইয়া থাকেন। জাগতিক ভোগ স্পৃহার দিকে ভ্রমেও ভ্রূক্ষেপ করেন না। আর যাহারা ভগবৎ পাদ পদ্মাসবে বিমুখ হইয়া কেবল রমণী রম্ভাদি বিষয়ের গন্ধে বিমুগ্ধ হয়, তাহাদের জ্ঞান দৃষ্টি এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পক্ষ দ্বয় নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং তাহাদের অবস্থা বস্তুতই কেতকী পুষ্পরজে অন্ধ ও কণ্টক কর্ত্তৃক ছিন্ন পক্ষ—চপল মধুপের ন্যায় অতীব শোচনীয় ও উভয় সঙ্কটাপন্ন হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাকবি কালিদাস তাই বলিয়াছেন :—

"গন্ধশ্চাসৌ ভুবন-বিদিতো কেতকী স্বর্ণবর্ণা,
পদ্মভ্রান্ত্যা চপলমধুপঃ পুষ্পমধ্যে পপাত।
অন্ধীভূতঃ কুসুমরজসা কণ্টকৈচ্ছিন্নপক্ষঃ,
স্থাতুং গন্তুং দ্বয়মপি সখে! নৈব শক্তো দ্বিরেফঃ" ॥

চপল মধুকর মধুলোভে পদ্মভ্রমে ভুবন বিদিত সুগন্ধি স্বর্ণবর্ণা কেতকী পুষ্প মধ্যে পতিত হওয়ায় পুষ্প রেণু দ্বারা অন্ধ ও কণ্টক দ্বারা ছিন্ন পক্ষ হইয়া পুষ্প মধ্যে থাকিতে বা অন্যত্র গমন করিতে পারে না। অতএব হে সখে, এই মধুকর উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়াছে।

ইহাতেই বুঝা যায় যে, সংসারে আসক্ত হওয়া আর উভয় সঙ্কটে পতিত হওয়া একই প্রকার। প্রকার এক বটে, কিন্তু মন মানে না, চায় "দিল্লিকা লাড্ডু"। জানে না যে, দিল্লিকা লাড্ডু যে খায় সেও পস্তায় আর যে না খায় সেও পস্তায়। অতএব এই সংসারে কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেরই এক একবার ভাবিয়া দেখা উচিত যে, কেবল সংসারে আসক্ত না হইয়া, সেই জিনিসেও আসক্ত হওয়া উচিত যে জিনিস কেবল পঞ্চঘাতী ও আত্মঘাতী ব্যতীত,

মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী এই ত্রিবিধ মনুষ্যেরই একান্ত অভিলাষত ও প্রার্থনীয়। এই মর্ম্ম শাস্ত্রে যেরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার মূল ও সরল বঙ্গানুবাদ কেবল আভাষ প্রদানার্থ উদ্ধৃত করা হইল।

"নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকো গুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥
ভাঃ ১০।১।৪

নিস্পৃহ (মুক্ত) পুরুষের আনন্দ জনক, আর সংসারের দুঃখাদি হইতে মুক্তি-লাভ অভিলাষীগণের এই ভব অর্থাৎ মোহরোগের একমাত্র ঔষধ বলিয়া মুমুক্ষু ব্যক্তির উপকারী আর ভগবানের এই পবিত্র লীলা গুণাদি শ্রবণও মনঃপ্রিয় বলিয়া বিষয়ীরও সেব্য, সুতরাং যাহারা অপকর্ম্মাদি দ্বারা আত্মার অধঃপতন করে বা জীব-হীংসা নিরত, কেবল তাহারা ভিন্ন, কি মুক্ত, কি মুমুক্ষু, কি বিষয়ী এই ত্রিবিধ লোকের কেহই ভগবল্লীলাদি শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিতে বিরত হয় না। অথবা পশুঘ্ন লগুডের ন্যায় ইন্দ্রিয় বিহীন জড়বৎ এমন কেহই নাই যে ভগবৎ গুণানুবাদ শ্রবণ কীর্ত্তনে বিরত হয়। অথবা এরূপ তাৎপর্য্যও হইতে পারে যে, অতি নীচ জাতি পশুঘ্ন ব্যাধ হইতে অতি উচ্চ জাতি ব্রাহ্মণ পর্য্যন্তও কেহই ভগবদগুণানুবাদ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি বিনা :বিষয় ভোগ বাসনা পরিত্যাগ অর্থাৎ বৈরাগ্য লাভ করিতে সমর্থ হয় না। বিষয় বাসনা পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্য লাভ করিতে হইলে, অতি নীচ জাতি ব্যাধই হউক বা ব্যাধ অপেক্ষা উচ্চ যে কোন জাতিই হউক, ভগবল্লীলা গুণানুবাদ শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে অনুরাগী না হইলে বৈরাগ্য লাভের কোন সম্ভাবনাই নাই। ভগবৎগুণানুবাদ শ্রবণ কীর্ত্তনাদির এমনই মহিমা যে, উহাতে ক্রমশঃ চিত্ত যতই আবিষ্ট হইতে থাকে, ততই বৈরাগ্য আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। উহাকে আনিবার জন্য আর স্বতন্ত্র প্রয়াস বা যত্ন করিতে হয় না। কারণ বস্তু-শক্তি ইচ্ছা বা অনিচ্ছার অপেক্ষা করে না।

"হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপিস্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টঃ দহত্যেব হি পাবকঃ"॥

যেমন অনিচ্ছায় অন্যাসক্ত চিত্তও অগ্নিতে হস্ত নিক্ষেপ করিলে হাত পুড়িয়া

যায় ; সেইরূপ বিষয়াসক্ত চিত্ত হইয়াও যদি শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন, শ্রবণ ও স্মরণ করে তথাপি পাপক্ষয় হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমার স্থায় ঘোর বিষয়ীগণের পক্ষে ভগবানের পবিত্র লীলা গুণাদি, শ্রবণ ও মনঃপ্রিয় বলিয়া যত্তপি সেব্য হয়, তাহা হইলে কালাকাল বিচার না করিয়া, অর্থাৎ ভগবল্লীলা গুণাদির আলোচনা বাল্য কালে করিবনা বৃদ্ধাবস্থায় করিব এরূপ ভাবে অবহেলা না করিয়া, যত শীঘ্র সম্ভব, অর্থাৎ এই মুহূর্ত্ত হইতেই আরম্ভ করা বিধেয়। কারণ কালরূপী মৃত্যু এই দেহের সঙ্গেই জন্ম গ্রহণ করিয়া নিরন্তর এই দেহ মধ্যেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোন্ সময়ে গ্রাস করিবে তাহা নির্দ্দিষ্ট নাই। আর গ্রাস করিবার সময়ও আর সময় হইবে না, যেহেতু সে সময়ের পূর্ব্ব হইতেই কফ, বাত ও পিত্ত কর্ত্তৃক কণ্ঠ অবরুদ্ধ এবং ইন্দ্রিয়গণ বিকল হইয়া পড়িবে। জীবের চরম গতিই এইরূপ, ইহা অবগত হইয়া, জীবের মঙ্গল সাধনার্থ জীব দুঃখে দুখী, অতিশয় করুণ হৃদয় আবির্হোত্র নামক ঋষি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যে, 'হে পাপ হারী কৃষ্ণ! তোমার পাদ পদ্ম রূপ পিঞ্জরে আমার চিত্তরূপ রাজহংস এই-ক্ষণেই প্রবেশ করুক, নচেৎ প্রাণ বিয়োগ সময়ে কফ' বাত পিত্ত জনিত রোগে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিলে, রোগের যাতনায়, তখন আর তোমার নাম, রূপ, লীলাগুণাদি কি প্রকারে স্মরণ করিব।"

"কৃষ্ণ ত্বদীয় পদপঙ্কজ পিঞ্জরান্তে,
অদ্যৈব মে বিশতু মানসরাজহংসঃ।
প্রাণ-প্রয়াণ-সময়ে কফ-বাত-পিত্তৈঃ
কণ্ঠাবরোধনবিধৌ স্মরণং কুতস্তে॥

অতএব এই অনিত্য জীবনে নিত্য বস্তু লাভ করিবার জন্য বাল্য কালে ক্রীড়া, যৌবন কালে যুবতী সঙ্গ এবং বৃদ্ধাবস্থায় সংসার চিন্তায় চিত্তকে কলুষিত করিয়া, ধর্ম্ম পথ কণ্টক দ্বারা রোধ করা কদাচই আমাদের উচিত হয় না ; প্রত্যুত ভ্রম অপসারিত করিয়া, আত্মাকে অধঃপতনের সম্ভাবনা হইতে রক্ষা করাই মানব মাত্রের একান্ত কর্ত্তব্য ও নিতান্ত আবশ্যক।

শ্রীভূপতিচরণ বসু।

মাতৃ-দর্শন

(প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় লিখিত)

সংবৎসর পরে আবার বঙ্গের ঘরে ঘরে সর্ব্বমঙ্গলার শুভ আগমন মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। যে দিকে দেখি, সেই দিকেই মায়ের মহাপূজার আয়োজন; যে দিকে কাণ পাতি, সেই দিকেই আলেয়া রাগিণীতে মহামায়ার আগমনী গান আর স্তুতির আবর্ত্তন! প্রকৃতিও আজ প্রস্ফুট কুমুদ-কহ্লার কমল শেফালির ডালি লইয়া পূজার জন্য প্রস্তুত। তবে কি আঁধার ঘরের মাণিক, সত্য সত্যই এ আমার ঘরে এলি মা!

কই মা, কই, তোর আঁধার হরা রূপের ছটায় আমার মোহের আঁধার সরায়ে দে মা, আমি একবার তোকে ভাল করিয়া খানিক দেখি।

আহা হা হা, ঐ যে ঐ সিংহোপরে দশভুজা দুর্গা মূর্ত্তিতে মা আমার এসেছে গো এসেছে! সঙ্গে লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্ত্তিক-গণপতি তারাও সব এসেছে গো এসেছে! কি আনন্দ আজ কি আনন্দ! নাচ্ নাচ্—দু'বাহু তুলিয়া নাচ;—হো হো, কি আনন্দ আজ কি আনন্দ!

আহা আহা, মায়ের আমার কি অপরূপ রূপ গো! আর কোন্ রাজ্যের কি জানি কি উপকরণ দিয়া কোন্ কারিকরে এ রূপ গোড়েছে গো! রূপ তো নয়, যেন করুণার ঝরণা। মরি মরি রূপের বালাই লইয়া মরি! হেরিলে নয়ন ফিরানো দায় হইয়া পড়ে। দ্যাখ্ দ্যাখ্ নয়ন! সাধ মিটাইয়া দ্যাখ্।

আরে কি বালাই, পোড়া অশ্রু আর অবসর পেলে না, এই সময় এসে উপস্থিত। আসা কোণে আসা, যেন বর্ষার ঢল নামিয়া গেল। হায় হায়, তবে মাকে দেখিই বা কি করিয়া? *

আচ্ছা, থাক্ অশ্রু থাক, সে হয়তো মায়ের কমল চরণ দু'খানি ধুয়াইয়া দিবার আশায় আসিয়াছে। তাহার কার্য্য সে করিতে থাকুক, ততক্ষণ আমি মাতৃনামের অমৃতরসে রসনাকে সরস করিয়া লই। মা, মা!—করুণাময়ী মা আমার!

আরে কি বিপদ্ কে যেন কোথা হইতে আসিয়া কণ্ঠদ্বার অবরুদ্ধ করিয়া দিল। একটী অখণ্ড মায়ের নামও আর বলিবার যো নাই।

হায় হায়, আমার সাধে তোরা কে বাদ সাধিলি রে? থাক্, থাক্,—তোরা থাক্, আমি মনোময় মুখে মায়ের অমিয় নাম আবৃত্তি করিতে করিতে তাঁহার চরণপ্রান্তে প্রণত হইয়া পড়ি।

আরে কি সর্ব্বনাশ,—কোথা হইতে জড়তা আসিয়া সকল শরীরই যে নিশ্চেষ্ট করিয়া ফেলিল। সে আবার একা নয়, কম্পও তাহার সহচররূপে আসিয়া দেখা দিল। হায় হায়, মা'র কাছে যাওয়ার এত ব্যাঘাত।

বলি, হাঁ মা, আসিলি তো সংবৎসর পরে, তা-ও আবার সাধ মিটাইয়া উপভোগ করিতে দিলি না? এ তোর কোন রাজ্যের করুণা মা, কোন্ দেশের বিবেচনা? একে তো আমার স্বভাবত বহির্ম্মুখ দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ শত চেষ্টায়ও তোর দিকে যাইতেই চায় না; কাজেকাজেই তোকে দেখাও ঘটে না, উপভোগ করাও চলে না। তারপর, তোর অপার করুণার প্রভাবে যদি বা দেখাই ঘটিল, তারাও তোকে উপভোগ করিতে ছুটিল; তখন কি আর তাহাদের পাছে আনন্দরূপী দুষমণ বা বন্ধুরূপী শত্রু লেলাইয়া দিতে আছে মা?

মা আনন্দময়ি! আমি যোগী নই, জ্ঞানী নই, আমি তোর ও অনুভবের আনন্দ লইয়া কি করিব মা? আমি তোর অধমের অধম অবোধ সন্তান। আমি চাই—তোর ঐ দশদিক্ আলো করা দশভুজা দুর্গা মূর্ত্তি পলকহীন নয়নে অনুক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে, আর বালকেরই মত কত-কি আবোল-তাবোল খেয়ালের কথা তোকে শুনাইতে ও আব্দার জানাইতে। আমি চাই—মা তোকে সম্মুখে রাখিয়া শিশুর মত দুষ্টামি করিতে, স্নেহমাখা তিরস্কার খাইতে,—হাঁসিতে কাঁদিতে নাচিতে গাহিতে। আর আমি চাই—এই ছেলে খেলায় শ্রান্ত হইলে তোর স্নেহের অঞ্চল ধরিয়া তোর কোলে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িতে। বল্ মা, ইহাতে কি রাজি আছিস্? যদি থাকিস্ তো এসেছিস্ থাক্, আমার সাধ মিটাইয়া তোকে উপভোগ করিতে দে মা, আর রাজি না থাকিস, তো ইচ্ছাময়ী তুই, তোর যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, আমার আর তাতে বলিবার কিছুই নাই।

(বঙ্গবাসী ১৩।৬।২৯)

ভক্তিযোগ

শিশু মাকে চায় তাঁর স্তন্য-পানের জন্য, মাকে চায় তাঁর অভয় কোলে স্থান পাইবার জন্য, মাকে চায় তাঁর সুমধুর হাসি, সুমিষ্ট বাক্যের জন্য, মায়ের অফুরন্ত অনাবিল অগাধ প্রেমের প্রগাঢ় চুম্বনের জন্য। অথবা কেন চায়, শিশু তাহাও জানে না। স্বার্থের সংস্কারে ক্রমশঃ শিশু জানিতে পারে, এ সংসারে বাঁচিয়া থাকিতে, বিপদ মুক্ত হইতে, সান্ত্বনা লাভ করিতে, শান্তি অনুভব করিতে মাকে তার কত প্রয়োজন। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে সে পিতাকেও চেনে। স্নেহের অযাচিত দু'টি ধারায় দেব-শিশু ভবিষ্য জীবনে ভগবদ্‌ভক্তির যে অঙ্কুর লাভ করে, পিতা-মাতা তার সেই ভক্তি সূত্রের মালাকার, ভক্তিসূত্রের বক্তা ও ব্যাখ্যাতা। তাই তাঁহারা নররূপী দেব-দেবী, জগতের প্রত্যক্ষ দেবতা। সেই অবোধ শিশুই যৌবনের সমস্ত জ্ঞান-ধারায় এই প্রত্যক্ষ দেবতার পূজা করে।

কিন্তু ভগবানে অনুরক্তির কারণ আরও ব্যাপক। পিতা মাতা যদি ঈশ হন ত ভগবান ঈশ+বর। মা পেটে ধরিয়াছেন, আর প্রকৃতি সেই মায়ের বুকেও স্নেহ দিয়াছেন। বাবা ভরণ পোষণ করিয়াছেন, আর ভগবান ভরণ পোষণের যাবতীয় দ্রব্য সম্ভার জগতের ভাণ্ডারে আনিয়া পুত্র কন্যার জন্য পিতা-মাতার হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। ভগবানে নাই এমন কিছু নাই। তাঁহার আকার নাই তাই তিনি নিরাকার। তাঁহার ক্ষয় নাই, তাই তিনি অক্ষয়, তাঁহার ব্যয় নাই, তাই তিনি অব্যয়, তাঁহার আদি নাই, তাই তিনি অনাদি, তাঁহার অন্ত নাই, তাই তিনি অনন্ত। ঐশ্বর্য তাঁর, বীর্য তাঁর, যশ তাঁর, প্রতিষ্ঠা তাঁর, রূপ তাঁর, রস তাঁর, আনন্দ তাঁর, মুক্তি তাঁর। পুরুষ তাই ভগবান, প্রকৃতি নারী তাই ভগবতী। এই যে ভগবান ও ভগবতী, সৎ ও সতী, নর ও নারী, পিতা ও মাতা, ইহার প্রতি কৃতজ্ঞতার, শ্রদ্ধার স্মারক যে অনুরক্তি, সংস্কারজ ও স্বভাবজ যে অনুরক্তি তারই নাম ভক্তি।

যাঁহাকে ভক্তির অর্ঘ্যদান করা হয়, তিনিই উপাস্য দেবতা, আর যিনি উপাস্য দেবতাকে অর্ঘ্যদান করেন, তিনিই ভক্ত। ভক্ত ও ভক্তির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে উপাস্য মূর্তিমান। উপাস্য নিরাকার, যেহেতু, তাঁর আকার কল্পনারও

বহির্ভূত, উপাস্য সাকার, যে হেতু তিনি ভক্ত-হৃদয়ে সাকারে বর্ত্তমান, ভক্তের সম্মুখে সাকার বিগ্রহ রূপে বর্ত্তমান।

ভক্তি আমরা তাহাকেই বলি, ভক্তির যে ভাণ করে। অন্তরে শ্রদ্ধা নাই, মনে বিশুদ্ধতা নাই, আত্মার আনন্দ নাই, শরীরের শুচিতা নাই, অথচ ভক্ত বলিয়া স্পর্দ্ধা করে, গর্ব্ব করে, প্রচার করে। ভক্তি আমরা তাহাকেও বলি, যে কোনও স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ভক্তির মুখোস পরিয়াছে। জগতে কিন্তু ভক্ত ও অনেক সময় ভাক্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন। কত স্বদেশ-ভক্ত বীর রাজ-দ্রোহী বলিয়া জগতের ইতিহাসে প্রমাণিত হইয়াছে, কত ধর্ম্মবীর বকধার্ম্মিক বলিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যিশু সক্রেতিসের মৃত্যু আজও সমগ্র বিশ্বের প্রাণে যন্ত্রণা দেয়। কত সতীচিত্ত সমাজ সমস্যায়, ভাক্ত হইয়াছেন। মানুষ মানুষের উপর এইখানে এত অত্যাচার করিতে পারে যে, সে কলঙ্ক জীবনেও অনেকে মুছিতে পারে না। আবার কত অসৎ, কত অসতী জগতে ভাক্ত হইতে ভক্ত সাজিয়া ভক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। আবার কত অসৎ, কত অসতী ভাক্ত হইয়াও ভক্ত নামে পরিচিত হইয়া আছেন।

কিন্তু আমরা ভক্তির কথাই বলিব। ভক্তিযোগই সিদ্ধিযোগ, অমৃত যোগ। ভক্তির সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে যে সত্যের যে আনন্দের যে আরাধনার সংযোগ নাই, তাহা যোগ নহে, বিয়োগ ; পূরক নহে বিভাজক। কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা, আন্তরিক পূজা ঐকান্তিক উপাসনা ছাড়িয়া ভক্তির কেন্দ্র গড়িয়া উঠিতে পারে না। বৈরাগ্য ছাড়া কামিনী কাঞ্চনের মায়ার শৃঙ্খল খুলিয়া যায় না। বিষয় ও মনের সম্বন্ধ হইলে সঙ্গ হইতে কামের অর্থাৎ কামনার উৎপত্তি। যেখানে কাম, সেখানে প্রেম নাই ; যেখানে প্রেম নাই, সেখানে বৈরাগ্য নাই। যেখানে বৈরাগ্য নাই, সেখানে অনাসক্তি নাই। মনের আসক্তিতে যদি বিষয় বা কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি হয়, তাহা হইলে পার্থিব ভোগ্য আর মনের আসক্তি যদি ভগবানে হয়, প্রকৃতির সৃষ্টি পরম্পরা বা জীবও প্রকৃতির অনাসক্ত, নিষ্কাম সেবা হয়, তবেই তাহা অনাসক্তি, অনুরক্তি বা ভক্তিতে পরিণত হয়। জ্ঞান বিচারসহ, ভক্তি স্বভাবজ। ভক্তি সেবাধর্ম্মের জননী, পত্নী, সেবিকা।

ভক্তির জন্য সেবাধর্ম্মের অনুষ্ঠান চাই। ভক্তিতে মনের জঞ্জাল গুলিকে সরাইয়া দিতে না পারিলে, ভক্তিতে অন্তরকে সিক্ত করিতে না পারিলে কামনার আসক্তি দূর হইবে না, কামনার আসক্তি বা প্রকৃতির সঙ্গে চিত্তবৃত্তির

নিরোধের যোগ না হইলে বৈরাগ্য ত আসিবে না ! জ্ঞান বিচার করে, ভক্তি বিশ্বাস করে। জ্ঞানে চিত্ত শুষ্কই থাকে, ভক্তিতে চিত্ত সরস হয়, ভক্তিতে চিত্ত সরস হইলে জ্ঞান নিবৃত্তিমুখী হয়। নিবৃত্তিমুখী জ্ঞানের কর্ম্মই আত্ম ত্যাগ, স্বার্থ ত্যাগ, সংযম ও সেবা সম্ভব পর। নিবৃত্তিমুখী জ্ঞানের ভিত্তি ভক্তিতে গড়া, শ্রদ্ধায় ভরা, সরসতায় সরস করা। সত্য সত্যই ভক্তি যোগ সিদ্ধি যোগ, অমৃত যোগ।

জ্ঞান অনন্ত, অসীম। জ্ঞানের রাজ্য অন্তরে বাহিরে বিস্তৃত। জগতে জ্ঞানের বিশিষ্ট সাধক অপেক্ষা ভক্তির বিশিষ্ট সাধক অনেক বেশী। জ্ঞানের হিসাব অনেক। ভক্তিতে হিসাব নাই। ভক্তির যেখানে ভাক্তামো আছে, সেইখানেই শুধু হিসাব। ভক্তির উচ্ছ্বাস আছে, উত্তেজনা আছে। ভক্তির উত্তেজনায় মানুষ অন্ধ হইতে পারে, কিন্তু ভক্তির উত্তেজনায় রিপুর অত্যাচার নাই। যেখানে রিপুর অত্যাচার, উত্তেজনা, সেখানে জ্ঞান ভক্তি তমসাচ্ছন্ন, কর্ম্ম বহির্ম্মুখী, কর্ম্ম ইন্দ্রিয় সেবায়। যেখানে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা যখন প্রবল, সেখানে ভক্তির উত্তেজনা তখন নিস্তেজ। এই জন্য ভক্তির উত্তেজনা না বলিয়া উচ্ছ্বাস বলাই সঙ্গত।

ভক্তিতে ভক্ত তৃণাদপি সুনীচ হয় সকলকেই সম্মান করিতে পারে, ভালবাসিতে পারে। শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে যে সমত্ব বোধ প্রবল হয়, তাহাতে পরিবার, সমাজ, জাতি পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে। স্বদেশ প্রীতি এই শ্রদ্ধা ও প্রীতির সমুজ্জ্বল নিদর্শন।

ভক্তির সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক। ভক্তিযোগ অমৃত যোগ, জ্ঞানযোগ অমৃত যোগ, কিন্তু ভক্তি ও জ্ঞানযোগই সিদ্ধযোগ। ভক্তিতে মন সরস হয়, ভক্তিতে আত্মা তন্ময় হয়। কিন্তু ভক্তির অন্ধত্বের দিকও আছে। অভিজ্ঞতা, যুক্তি ছাড়া যে ভক্তি, সংসারেও তাহা যেমন অনেক সময়ে কুসংস্কার, আবার অধ্যাত্ম বা নৈতিক জগতেও তাহা অনেক সময় বুদ্ধির ও জ্ঞানের জড়তাসাধক। ভক্তিরও পরীক্ষা দিতে হয়, ভক্তিকেও পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। সোণা খাঁটি কিনা, তাহা যাচাই করিয়া লইতে হয়।

উপাসনার স্তর বিভাগ আছে, ভক্তির ও ভক্তেরও স্তর বিভাগ আছে। মানসিক, নৈতিক, শারীরিক শক্তির বিকাশ হিসাবে, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার হিসাবে ভক্তির সাধারণ স্তর ভেদ আছে। কিন্তু সহজ ভক্তের ভক্তির হিসাব নিকাশ হয় না। একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জন্মান্তরীণ পুণ্য, সুকৃতি, যাহারা

মানেন না, তাঁহারাও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বংশানুক্রম মানেন। শৈশবে যাহাদের সহজ ভক্তির বিকাশ হয়, যৌবন বৈরাগ্যে তাঁহারা সিদ্ধ হন, জগতের সেবায় তাঁহারা ভক্তি ও ভক্তের সামঞ্জস্য করেন।

জ্ঞানী চৈতন্যদেব ভক্তিতে গলিয়া আচণ্ডালে প্রেম বিলাইয়া ছিলেন। ভক্তিতে হরিদাস জগতে বৈষ্ণবী শক্তির বিকাশে জ্ঞানের সংযম বাড়িয়াছে। জ্ঞান বাড়িয়াছে, বিচার বাড়িয়াছে, অনেক ভাল মন্দ বলিতে বলিতে, অনেক বিচার ধারাকে যুগ, যুগান্তর ধরিয়া জ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে প্রজ্ঞানে আনিয়া ভক্তি ও জ্ঞানের রাজ্যকে ভক্ত সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। তারপর জ্ঞান একদিন বিশ্বাস করিয়া ভক্তির পায়ে সর্ব্বস্ব বিকাইয়া দিয়াছে। ভক্তিতে একদিন ভক্তের মুক্তি মিলিয়াছে।

ভক্তির জন্য নির্জন আরাধনা চাই; ভক্তির জন্য নীরবতা চাই। লোক দেখানো ভক্তি, বাইরের ভক্তি, তামসী ভক্তি। ভক্তি অন্তরতম অন্তরস্থলে কুলকুলনাদিনী ফল্গুর মত অন্তঃসলীলা। ভক্তির জন্য উপাস্য চাই। আদর্শ চাই। লক্ষ্য স্থির হইলে ভক্তির কাছে দীনতা শিক্ষা হয়, দীনতায় সংযম আসে, বৈরাগ্য আসে। বৈরাগীর ভক্তি সাত্ত্বিকী ভক্তি। বৈরাগী হওয়া সহজ নহে।

সাত্ত্বিকী ভক্তি এক দিনে হয় না। যার হয়, তিনি বড় ভাগ্যবান। ভক্তি যোগে ভক্তি যখন সিদ্ধ হয় জ্ঞান তখন স্বভাবে পরিণত হয়। তখন স্ব+ভাবই জ্ঞান ও ভক্তি। তখন জ্ঞান ও ভক্তির সিদ্ধিযোগ। তখন বিষয় নাই, মন নাই। আত্মা ও জ্ঞান-ভক্তি। ভাব সমাধি ও জড় সমাধি। তখন তন্ময়ত্ব, ভক্তি। তখন ভক্তি আর মুক্তি। তখন ভগবান ও ভক্ত তখন ভগবানকেও চেনা যায় না, ভক্তকেও চেনা যায় না। তখন জগৎ নাই, জীব নাই, ভাব নাই, কর্ম্ম নাই, পরমাত্মা নাই ভক্ত ও ভগবানের তখন ভক্তিতে সমাধি। জীবের তখন মুক্তি। ভক্ত ও ভগবান মিলিয়া তখন কি হয় তাহা কেহ বলিতে পারে না।

শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বস্ত্রহরণ ও রাসলীলা

আনন্দ-চিন্ময় বিগ্রহ ব্রজকিশোর শ্যামসুন্দরের সহিত আনন্দ-চিন্ময় মধুর মূরতি গোপাঙ্গনাগণের যে রস-জনক লীলা, যাহাতে আস্বাদযোগ্যতার পরাকাষ্ঠা লাভ করে, তাহাই রাস। শ্রীভগবান রসস্বরূপ "রসোবৈস।" ভগবৎ শব্দের মুখ্য তাৎপর্য্য শ্রীকৃষ্ণে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি। স্বরূপ শক্তি ত্রিবিধা। সন্ধিনী, সম্বিৎ এবং হ্লাদিনী। যে শক্তি-প্রভাবে শ্রীভগবান "সৎস্বরূপ" হইয়াও সকল হৃদয়ে সত্য স্বরূপে অধিষ্ঠান আছেন, যাহার সত্তায় সকলেরই সত্বা, তাহাই সন্ধিনী শক্তি, যে শক্তি-প্রভাবে শ্রীভগবান "জ্ঞানস্বরূপ" হইয়াও সকল বিষয়ই জানিতে পারেন, এবং সকলকে জানান, তাহাই সম্বিৎ শক্তি; আর যে শক্তিপ্রভাবে শ্রীভগবান "আনন্দস্বরূপ" হইয়াও আনন্দ উপভোগ করেন, এবং ভক্তগণকে আনন্দিত করেন, তাহাই হ্লাদিনী শক্তি।

"হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥" (চৈ: চ:)

হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমের সার ভাব, ভাবের সার মহাভাব। "মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী"। শ্রীরাধিকা মূর্ত্তিমতী মহাভাব, অন্যগোপীগণ তাঁরই বিলাস মূর্ত্তি, তাঁর সখী। সখিগণ মধুর রসলীলার উপকরণ, যুগল মিলনের সহায় কারিণী, শৃঙ্গার রসের পুষ্টিকারিণী।

শৃঙ্গার রসরাজ মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ নিত্য লীলাময়। নরলীলাই তাঁর সর্ব্বোত্তম লীলা, নরবপুই তাঁর স্বরূপ। গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর ঠামই নরলীলার অনুরূপ সজ্জা। এইরূপেই শ্রীভবানের অনন্ত সৌন্দর্য্য, অনন্ত মাধুর্য্য; এত লাবণ্য, এত তারুণ্য অন্য কোন রূপেই দৃষ্ট হয় না।

"অসমানোর্দ্ধ মাধুর্য্য তরঙ্গামৃত বারিধি।
জঙ্গম স্থাবরোল্লাসীরূপ গোপেন্দ্র নন্দন॥"

যে রূপের সমান নাই, উর্দ্ধ নাই, যে লাবণ্য কোটী কন্দর্প মূর্চ্ছাকারী, যে

সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া, গো, দ্রুম, দ্বিজ, প্রেমে পুলকাঙ্গ হইয়া উঠে, সেই অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের অনন্ত পারাবার, গোপিনী মোহন গোপেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দর, অপ্রকটলীলাস্থ নিত্য পরিকরগণকে, সাধন সিদ্ধ ভক্তগণকে, এবং আত্মারাম মুনিগণকে আনন্দাতিশয় প্রদান করিতে, নিজেও অভিনব আনন্দ উপভোগ করিতে, শ্রীগোলকাদিধাম ও পরিকরাদিসনে প্রপঞ্চ মধ্যে অবতরণ করিয়াছিলেন। ঐ নিত্য লীলা যখন এই প্রপঞ্চে প্রকট হয়, তখন তাহার নাম বৃন্দাবন লীলা, আর যখন প্রপঞ্চের খেলা শেষ করিয়া, সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টির বহির্ভাগে অপ্রকাশ্য রূপে অবস্থান করেন, তখন তাহার নাম গোলক লীলা। গোলোকে স্বকীয় ভাব, স্বকীয় ভাবে রসের সম্যগ্ পুষ্টিলাভ হয় না, রসের পূর্ণাভিব্যক্তি হয় পরকীয়া ভাবে।

"পরকীয়-ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥" (চৈঃ চঃ)

নারী জীবনের চিরারাধ্য পতি দেবতার মধুময় সঙ্গত্যাগ করিয়া পরম পূজনীয় জনক জননীর আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, কুল, মান, লজ্জা, ধর্ম্ম সব সাগরের অতল তলে ডুবাইয়া দিয়া, দারুণ দুর্ব্বিষহ কলঙ্ক পশরা শিরে চাপাইয়া লইয়া, সাগর সঙ্গম সমুৎসুকা স্রোতস্বিনীর ন্যায়, পরপুরুষাসক্তা রমণীগণ যেরূপ ভাবে প্রিয়তম প্রণয়ীর আশে প্রধাবিতা হয়, এই ভাবময়ী গোপীগণ যদি আমাকে তাহাদের স্বকীয় কান্ত ভুলিয়া গিয়া, কেবল অনুরাগ ভরে ভজনা করেন, তবে না জানি তাহা কত মধুর হয়।

"আমিও না জানি না জানে গোপীগণ।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥"

শ্রীভগবানের অবতরণের মুখ্য উদ্দেশ্য ইহাই। কিন্তু এ ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইলে এক শ্রীধাম বৃন্দাবন ব্যতীত অন্য কোন অনুকূল স্থান নাই।

"বৃন্দাবন রম্যস্থান, দিব্য চিন্তামণি ধাম, সুমধুর রসের আধার"

সেই নীল যমুনা প্রবাহিত, নিকুঞ্জ সুশোভিতা, পিক মুখরিতা শ্রীবৃন্দাবনভূমি, তার সেই ধীর সমীর, কেলী কদম্ব, বংশীবট, সেখানকার শুকসারী, ময়ূর ময়ূরী সেখানকার প্রতি রজরেণুটী পর্য্যন্ত, সেই মধুরভাবের উদ্দীপন করাইয়া দেয়। যাহাই হউক, সর্ব্বশক্তিনিলয় শ্রীভগবানের যেমনই ইচ্ছার উদগম, অমনই ইচ্ছা-

শক্তি-রূপিনী অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়া উভয়কেই মধুর পরকীয়া রস আস্বাদন করাইতে সেই নিত্যলীলা এই প্রপঞ্চে অবতরণ করাইলেন। তবে কথা হইতেছে যে, এই পরকীয়া ভাব প্রত্যায়িত। অর্থাৎ চিৎশক্তি রূপিণী যোগমায়া আপন অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে সকলকে ঐ ভাবে ভাবিত করিয়াছিলেন। তাহাও কিন্তু সার্ব্বকালিন নহে। আরও এককথা দেবী যোগমায়া ইহাদিগকে পরকীয়া ভাবে প্রত্যায়িত করিলেও বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিত, অন্য কোন ব্যক্তির সহিত ইহাদের শরীর সম্বন্ধ ঘটে নাই। মহাপ্রভাব সম্পন্না, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী কৃষ্ণকান্তাগণের অঙ্গস্পর্শ করে কাহার সাধ্য! গোপগণ ত তুচ্ছ! তবে নায়ক নায়িকাকে তাহাদের অন্তরালে রাখিয়া মিলনের মধুরতা বৃদ্ধির নিমিত্ত ইচ্ছাশক্তিরূপিনী যোগমায়ার ছল। এই যে গোলকের গোপী, ইহারাই নিত্য সিদ্ধকান্তা। বৃন্দাবন বিহারী নন্দনন্দনের কান্তা দ্বিবিধ। নিত্যসিদ্ধা ও সাধন সিদ্ধা। সাধন সিদ্ধা আবার দ্বিবিধ। শ্রুতিচরী ও ঋষিচরী।

শ্রুতিচরী :—

> কন্দর্পকোটী লাবণ্য ত্বয়ি দৃষ্টে মনাসি নঃ।
> কামিনী ভাবমাসাদ্য স্মর ক্ষুব্ধান্য সংশয়ম্॥
> যথাতল্লোকবাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকা।
> ভজন্তি রমণং মত্বা চিকীর্ষা জনিনস্তথা॥" (বৃহদ্বামন)

"হে শ্যাম সুন্দর! তোমার ঐ কোটী কন্দর্পতুল্য লাবণ্য দর্শন করিয়া কামিনীভাবে কামক্ষুব্ধ হইতেছি। হে কৃষ্ণ! তোমার বৃন্দাবনস্থ গোপীগণ যেরূপ মধুরভাবে তোমার ভজনা করিয়া থাকেন, আমরাও তোমাকে সেইরূপ ভাবে পাইতে ইচ্ছা করি। ঐ সকল প্রার্থনাকারিগণ ব্রজে জন্ম গ্রহণ করিয়া গোপীদেহ লাভ করিয়া ছিলেন, ইহাঁরাই শ্রুতিচরী।

ঋষিচরী :—

> "পুরামহর্ষয়ঃ সর্ব্বেঃ দণ্ডকারণ্য বাসিনঃ।
> দৃষ্টা রামং হরিং তত্র ভোক্তু মিচ্ছন্ সুবিগ্রহম্॥
> তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চগোকুলে।
> হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততোমুক্তা ভবার্ণবাৎ॥" (পদ্মপুরান)

পুরাকালে দণ্ডকারণ্যবাসি সমস্ত মুনিগণ সুন্দর দর্শন শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়া ছিলেন। তাঁহারাই সকলে গোপী দেহ লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিয়া ছিলেন, এবং অনায়াসে ভব সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ইঁহারাই ঋষিচরী।

শ্রীভগবান এই ত্রিবিধ গোপী লইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে শৃঙ্গারাখ্য উজ্জল মধুর রস আস্বাদন করিয়াছিলেন। এ রস কামজ নহে ইহা ভক্তের আসল শুদ্ধ সত্ত্ব হৃদয়োত্থিত ঘণীভূত ভাব। যাহা হউক, এইবার যথাসাধ্য মূল আলোচ্য বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

"হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকা।
চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানা কাত্যায়ন্যর্চ্চনব্রতম্॥ ভাঃ—

হেমন্ত ঋতুর প্রথম অগ্রহায়ণ মাসে নন্দব্রজকুমারিকা সকল হবিষ্যান্ন ভোজন পূর্ব্বক কাত্যায়নী দেবীর প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া সুগন্ধি পুষ্প, মাল্য নৈবেদ্য ধুপ, দীপ, এবং তাম্বুল দ্বারা দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন, এবং এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন,

"কাত্যায়নি মহামায়ে, মহাযোগীন্যধিশ্বরী
নন্দগোপ সুতং দেবী। পতিং মে কুরুতে নমঃ॥" ভাঃ—

হে কাত্যায়নি, হে মহামায়ে, হে মহাযোগিনি, হে অধিশ্বরি, হে দেবি! নন্দগোপ পুত্রকে আমাদের পতি করিয়া দিন। আমরা আপনাকে নমস্কার করি।

মহাযোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোপকুমারী দিগের ঈদৃশ ব্রতাচরণের বিষয় জানিতে পারিয়া উক্ত কর্ম্মের ফলদানের নিমিত্ত বয়স্যবর্গে পরিবৃত হইয়া ঐ স্থানে আগমন করিলেন। আগমনান্তর তাঁহাদের বস্ত্র সকল গ্রহণ করিয়া কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক হাস্যকারী বালকগণের সহিত স্বয়ং হাস্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন :—হে অবলাগণ, তোমরা এইস্থানে আসিয়া যথেচ্ছ নিজ নিজ বস্ত্র গ্রহণ কর।

গোপীগণ বলিলেন "হে শ্যাম সুন্দর, আমরা তোমার দাসী, তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব। এক্ষণে আমরা শীতে কম্পান্বিত কলেবর হইতেছি, আমাদের বস্ত্রগুলি প্রদান কর।

এইরূপ নানা কথার পর হাসিতে হাসিতে শ্রীভগবান তাঁহাদের বস্ত্রগুলি প্রদান করিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, হে সতীসকল, তোমরা যাহা উদ্দেশ করিয়া এই ব্রত ও কাত্যায়নী দেবীর অর্চ্চনা করিয়াছ তোমাদের সেই উদ্দেশ্য সফল হইবে। আগামিনী শারদীয়া পূর্ণিমা যামিনীতে তোমরা আমার সহিত রমণ করিতে পাইবে। তাহার পর এক বৎসর পরে শরৎকালে রাসলীলা হয়। বস্ত্রহরণের সময় শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃক্রম আট বৎসর, এবং নবম বর্ষ বয়সে তিনি গোপীগণকে লইয়া রাস করেন। তন্মধ্যে যিনি প্রধান গোপী, তিনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে এক বৎসর পঞ্চদশ দিবসের কনিষ্ঠ, তবেই রাসের সময় তাঁর বয়স ছিল আট বৎসর একাদশ মাস পঞ্চদশ দিবস। অন্যান্য সকলেও প্রায় ঐরূপ ভাবেরই ছিলেন। কেহ কিছু বড় কেহ কিছু ছোট।

এত অল্প বয়সেই গোপীগণ ও শ্রীকৃষ্ণের দেহে কৈশোরের সর্ব্বপ্রকার লক্ষণ পরিপূর্ণ রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। যদিও শাস্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে,—

"কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
কৈশোরমাপঞ্চদশম্ যৌবনং তু ততঃ পরম্॥"

পঞ্চমবর্ষ পর্য্যন্ত কৌমার, দশমবর্ষ পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, পঞ্চদশ পর্য্যন্ত কৈশোর এবং তারপর যৌবন। ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল। কারণ একবৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার কালে তিনি তৃণাবর্ত্ত বধ করিয়াছিলেন। চতুর্থ আরম্ভে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বালক এবং বৎস হরণ, তারপরেই তাঁর পৌগণ্ডলীলা। ছয় বৎসর আট মাস পর্য্যন্ত তাঁর পৌগণ্ডে স্থিতি। তার পরেই কৈশোর আরম্ভ। কৈশোর আবার আদ্য কৈশোর, মধ্য কৈশোর এবং অন্ত্যকৈশোর ভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে মধ্যকৈশোরেই উরুদ্বয়, বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থলের শোভা এবং মূর্ত্তির মধুরিমা সম্যগ্ প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্রীভগবান স্বীয় মধ্যকৈশোরেই পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত রাত্রি সকলের সমাগম দর্শনে, অনুরাগের উদ্দীপন বশতঃ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া আত্মবল্লভা গোপীদিগের সহিত রমণার্থ মানস করিলেন।

"ভগবানপি তা রাত্রীঃ শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়া মুপাশ্রিতঃ॥" ভাঃ—১০।২৯।১

মূলোক্ত "ভগবানপি" শব্দের দ্বারা ভগবানেরও রাসেচ্ছায় প্রাবল্য বোধ করাইতেছে। "তা রাত্রীঃ" শব্দে বৎসরের পূর্ব্বোক্ত প্রতিশ্রুতা রাত্রিগুলিকে বুঝাই-

তেছে "শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ" শব্দে বৃন্দাবনের অপ্রাকৃতত্ব এবং রাসের সর্বোৎকর্ষ বর্ণিত হইতেছে।

"তদোড়ুরাজঃ ককুভঃ করৈর্মুখং
প্রাচ্যাবিলিম্পন্নরুণেন শন্তমৈঃ
স চর্ষণীনামুদগাচ্ছুচো মৃজন্
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া ইব দীর্ঘদর্শনঃ।" ভাঃ—১০।২৯।২

শ্রীভগবান যখনই রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখনই নক্ষত্রাধীশ চন্দ্র, দীর্ঘকালের পর সমাগত প্রিয় যেমন নিজ প্রেয়সীর বদনমণ্ডল রাগরঞ্জিত করেন, তদ্রূপ পূর্ব্বদিগ্‌বধূর মুখমণ্ডল উদয়রাগ দ্বারা সুরঞ্জিত ও সুখতম কর দ্বারা স্থাবর জঙ্গমাত্মক প্রাণিদিগের তাপগ্লানি অপনয়ন করিতে করিতে উদিত হইলেন। বনরাজি তাঁহার স্নিগ্ধ কিরণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণ বামলোচনাদিগের চিত্তবিমোহনকারী মধুর গীতি গান আরম্ভ করিলেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সেই মোহনবংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রিয়তমকে পাইবার নিমিত্ত তদবস্থভাবেই প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াই প্রস্থান করিয়াছিলেন। কেহ ভোজন করিতে বসিয়াছিলেন, ভোজন ফেলিয়া চলিয়া গেলেন, কেহ স্বামী সেবায় তন্ময় ছিলেন, তিনিও তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ সন্নিধানে ছুটিলেন, কেহ কেহ শিশুগণকে দুগ্ধপান করাইতেছিলেন তাঁহারাও সেই বিশ্ববিমোহন মুরলীধ্বনি শ্রবণ মাত্র মন্ত্রমুগ্ধ পুত্তলিকাবৎ তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া চলিলেন। তাঁহারা এতই কৃষ্ণতন্ময় হইয়াছিলেন যে, গমনকালে পতি, পিতা, ভ্রাতাগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও গমন করিতে নিবৃত্ত হইলেন না। কিন্তু কোন কোন গোপী, পতি প্রভৃতি কর্ত্তৃক গৃহমধ্যে রুদ্ধ হওয়ায় বহির্গমনে অসামর্থ্য প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ ভাবনাযুক্ত হইয়া নিমিলীত নয়নে তাঁহাকেই ধ্যান করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের চিত্ত শ্রীভগবানে তন্ময় হওয়ায় শুভাশুভ কর্ম্ম সকল ক্ষয় হইয়া গেল, তাঁহারা গুণময় শরীর ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের সহিত মিলিত হইলেন।

এক্ষণে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত গোপীগণ মধ্যে কোন কোন গোপী বিবাহিতা ছিলেন। যে সমস্ত গোপী ঋষিরূপী যাঁহারা সাধনবলে পূর্ণ সিদ্ধ ভাব হইয়াছিলেন, অথচ সিদ্ধ দেহ হইতে পারেন নাই, তাঁহারাই

গৃহমধ্যে পত্যাদি কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু নন্দব্রজ কুমারীগণ, যাঁহারা কাত্যায়নীব্রত করিয়াছিলেন, তাঁহারা আর বিবাহ করেন নাই।

"অতএব তা অপি আগ্রহেন পত্যন্তরং নাঙ্গীকৃতবত্য এব। ইতি তথাপি রহোবৃ্যঢ়াবেন অন্য বৃঢ়াবৎ গূঢ়মেবাবমস্তা ইতি চ বুধ্যতে। এতদন্তা এব হি পরকীয় মানা ইতি। তদেবমুক্তং "যুবতী গোপকন্যাশ্চ"। ঐ গোপকন্যাগণ আত্মীয়স্বজনের আগ্রহ সত্ত্বও অন্যপতি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা কৃষ্ণকে গান্ধর্ব্বনিয়মে বিবাহ করায় কৃষ্ণমনে অন্য বিবাহিত গোপীর ন্যায় অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে গোপনে গোপনে অবজ্ঞা প্রকাশ করিত। পরকীয়া ভাব সম্পন্না গোপীগণ, ইহাদের হইতে স্বতন্ত্র। তাই হরিবংশে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীভগবান রাত্রিকালে যুবতী এবং গোপকন্যাকে লইয়া রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন। গোপকন্যাগণ এই শব্দদ্বারা অবিবাহিতা কুমারিগণ, এবং যুবতী শব্দদ্বারা তদতিরিক্ত বিবাহিত গোপীগণকে বুঝাইতেছে। এই বিবাহিত গোপীগণ মধ্যে কাহারও কাহারও বিবাহ প্রত্যায়িত অর্থাৎ যোগমায়া স্বীয় অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে সকলের মনে ঐরূপ ভাব জন্মাইয়া দিয়াছিলেন। এ আর বিচিত্র কথা কি? যাহার অপর মূর্ত্তি মহামায়া রূপে এই অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ক্রীড়াপুত্তলিকাবৎ নাচাইতেছে, এক বস্তুতে অন্য বস্তুর বোধ জন্মাইতেছে, তিনি যে কিছুকালের জন্য বৃন্দাবনস্থ গোপ গোপীর মনে ঐরূপ একটা ভাব জন্মাইয়া দিবেন ইহা আশ্চর্য্যের কথা নহে। আর কতকগুলি গোপী, যাঁহারা পূর্ণ সিদ্ধ ভাব পাইলেও সিদ্ধ দেহ লাভ করেন নাই তাহাদের পত্যন্তর ঘটিলেও রাসে যাইতে তাঁহারা সমর্থ হন নাই। অতএব তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া "মাতরঃ পিতারঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চবঃ" এই কথার প্রয়োগ হয় নাই। এতদতিরিক্ত ব্রজকুমারিগণ যাঁহারা কাত্যায়নী পূজা করিয়াছিলেন, তাহাদের যখন পত্যন্তর গ্রহণই সিদ্ধ হইল না, তখন পুত্রাদির মাতা হওয়া কোন প্রকারেই সঙ্গত হয় না। বিশেষ এক বৎসরের মধ্যে অন্বেষণকারী বয়স্ক পুত্রের মাতা হওয়া একেবারেই অসম্ভব। অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, গোপীগণ মধ্যে কাহারও পুত্র হয় নাই। তবে যে—

> "মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ।
>
> বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মা কৃঢ়ং বন্ধুসাধ্বসম॥" ভাঃ—১০।২৯।২০

এই শ্লোকে পুত্রের কথা উল্লেখ আছে, তাহা রহস্য জনক বাক্য। রসিক

শেখর শ্যামসুন্দর সমাগতা গোপীদিগকে পরিহাস করিবার নিমিত্ত উক্ত প্রকার স্বার্থভাবপূর্ণ রহস্য জনক বাক্য সমূহ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। অথহৎ বদতাং শ্রেষ্ঠো বাচঃ পেশৈর্বিমোহয়ন্।" (ভাগবত)

পরিহাস করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। কারণ এই যে, তাহারা অন্য অন্য আত্মীয় স্বজনের পুত্রাদিকে স্বপুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করিতেন।

নতুবা প্রকৃত পক্ষে যদি কোন গোপীরই সন্তানাদি উৎপন্ন হইত তবে রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণ কখনও তাহাদিগকে মহারাসের সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিতে পারিতেন না; রাস তাহা হইলে রসাভাস দোষে দুষ্ট হইয়া পড়িত। এবং আত্মারাম মুনিগণ কখনও ঐলীলা শ্রবণ করিতে বা বর্ণন করিতে বিশেষ আগ্রহবান হইতে পারিতেন না। আরও অসম্ভব যে, যদি কোন গোপী ঐরূপ বয়স্ক পুত্রের জননী হইতেন তবে নিশ্চয়ই তাহার শরীরে যৌবন অতিক্রম করতঃ অর্দ্ধবার্দ্ধক্যের লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পাইত। এবং তাহা হইলে কখনও কিশোর বয়স্ক শ্রীকৃষ্ণের পাশে তাহার বিশেষ শোভা হইত না, বরং বিসদৃশ ভাবই প্রকাশ পাইত। এবং রাসের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির মর্য্যাদাও তাহা হইলে নষ্ট হইয়া যাইত।

"তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মনীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা॥" (ভাঃ—১০।৩৩,৭)

দুইটী দুইটী হৈম মনির মধ্যে মহা মরকতমনি যেরূপ সুন্দর শোভা পাইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই সেই ব্রজ নাগরিগণ মধ্যে ভগবান দেবকী সুত অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, যদি একজন ঐরূপ বয়স্থা রমণীর সহিত একজন কিশোর বয়স্ক যুবকের নৃত্যগীতাদি রসজনক ক্রীড়া হইয়া থাকে, তবে ভগবল্লীলাই হউক আর যাই হউক তাহার মাধুর্য্য বিশেষ প্রকাশ পায় না। বিশেষ যিনি বস্ত্রহরণের সময় গোপীগণকে অক্ষতযোনি দেখিয়া তবে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি কখনও পুত্রবতী নারীর সহিত রমণ করিবেন না, ইহা নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে।

শ্রীকালাচাঁদ দেবশর্ম্মা।

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-ভক্তি

কর্ম্ম দ্বিবিধ। সকাম ও নিষ্কাম। যে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া জীব নিজে তার ফলবাঞ্ছা করিয়া থাকে, তাহাকে সকাম কর্ম্ম বলে।

যে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া জীব নিজে তার ফল ভোগ করিতে চাহে না, শুদ্ধ শ্রীভগবানের প্রীত্যর্থে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে তাহাকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলে। নিষ্কাম কর্ম্মই জীবকে উচ্চাধিকারী করিয়া ক্রমশঃ নিবৃত্তি পথে লইয়া যায়। নিবৃত্তি পথের নিম্নেই সর্ব্বসাধারণের জন্য প্রবৃত্তি পথের মহা কাম্য ক্ষেত্র। এই বিস্তীর্ণ কাম্যপথেই জীব স্বর্গাদির নিমিত্ত অভিলাষী হয়। প্রবৃত্তি মার্গাবলম্বী জীবের কাম্যবস্তু প্রধানতঃ দ্বিবিধ। ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক। ঐহিক সুখ ক্ষণিক পারত্রিক সুখ দীর্ঘকালস্থায়ী। জীব যখন নিরন্তর ঘাত প্রতিঘাতে ইহলৌকিক সুখের ক্ষণস্থায়ীত্ব বেশ বুঝিতে পারে তখন সে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালস্থায়ী পারলৌকিক সুখের প্রতি ধাবমান হয় এবং এই পারলৌকিক সুখাশাই তাহাকে ক্রমে ক্রমে নিষ্কাম কর্ম্মে দীক্ষিত করে। কারণ জীব যতই স্বর্গাদি ভোগ লাভ হেতু দানাদি পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকে, ততই তাহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইতে থাকে, এবং দিব্যজ্ঞানের আবির্ভাব হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় হইতে সর্ব্বপ্রকার ভোগলালসাও কমিয়া যায়, জীব নিষ্কাম কর্ম্মের কর্ম্মী হয়। নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে হৃদয়ে দিব্যজ্ঞানের উদয় হয় না, এবং দিব্যজ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তির আশাও সুদূর পরাহত। নিষ্কাম কর্ম্মী কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া কর্ম্মফল "কৃষ্ণায়সমর্পণমস্তু" বলিয়া শ্রীভগবানে সমর্পণ করে, তৎফলে অনাদি সঞ্চিত জীব-হৃদয়স্থ তমোরাশি সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার মত অচিরেই বিধ্বস্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত হৃদয় নির্ম্মল জ্ঞানালোকে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

"জ্ঞানং তত্ত্ব বিচারেণ, নিষ্কামেনাপি কর্ম্মণা।
জায়তে ক্ষীণ তমসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাম্॥"

এই সুনির্ম্মল জ্ঞানই মায়া তমসাবৃত জীবের মায়ামুক্তির কারণ "নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়"। কর্ম্মের নিজের কোন শক্তি নাই যে সে জীবকে

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তি প্রদান করিতে পারে। কর্ম্ম জ্ঞানের মুখাপেক্ষী। এই নিমিত্ত তত্ত্ববিদ্‌গণ কর্ম্ম হইতে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করেন।

"শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥" (গীতা ৪।৩৪)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "হে পরন্তপ! দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ।" যেহেতু শ্রুত্যুক্ত স্মৃত্যুক্ত সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানের অনুগামী। কর্ম্ম জ্ঞানের অন্তর্ভূত।

"জীব, মায়া ও শ্রীভগবান এই তিনটী তত্ত্বের স্বরূপানুসন্ধানই প্রকৃত জ্ঞান। "জ্ঞা" ধাতু হইতে জ্ঞান শব্দের উৎপত্তি। আমি কে, আমার প্রয়োজন কি, কেন আমি এই সংসারে শোকে দুঃখে মুহ্যমান হই, কিসে আমার এই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক আধিদৈবিক ত্রিবিধ তাপের চির অবসান হয়, এই সমস্ত বিষয় ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করার নামই প্রকৃত জ্ঞান। এই সংসারে প্রকৃত জ্ঞানী সে, যে নিম্নোক্ত কয়েকটী বিষয় প্রকৃষ্টরূপে অনুভব করিতে পারিয়াছে :—

জীব রক্ত মাংস গঠিত জড় দেহ নয়, নিত্য ভগবচ্ছক্তি। শোকে দুঃখে মুহ্যমান হওয়া তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম নয়, সে মায়াতীত, চিদংশ। স্ত্রী পুত্রের সেবাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য নহে, সর্বেশ্বরেশ্বর পরমাত্মা স্বরূপ শ্রীভগবানের সেবাই জীবের পরম ধর্ম্ম।"

বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীমদ্ রামানুজ আচার্য্য বলিয়াছেন, "বেদনং মুপাসনং স্যাত্তদ্বিষয়ে শ্রবণাৎ" শ্রীভগবানের উপাসনাই জ্ঞান, যে হেতু বেদাদি শাস্ত্রে তাহাই অবগত হওয়া যায়। উপাসনা, ভক্তি বারিধির তরঙ্গ বিশেষ। অতএব যিনি বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। জ্ঞান দ্বিবিধ। পরোক্ষ অর্থৎ শাস্ত্রাধীত জ্ঞান অপরোক্ষ অর্থাৎ অনুভব লব্ধ জ্ঞান। অনুভব লব্ধ জ্ঞান আবার দ্বিবিধ। এক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম জ্ঞান, অন্য ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ ভগবৎ জ্ঞান। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম জ্ঞান বলিতে কেহই যেন মায়াবাদীগণের মতানুযায়ী নির্ব্বিশেষ জ্ঞান মনে না করেন, কারণ উক্ত মতবাদীগণের সিদ্ধান্তীকৃত নির্ব্বিশেষ জ্ঞান মাত্র ব্রহ্মই স্বীকৃত হয় না, কেন যে হয় না তাহা পরে দেখাইব। এখানে ব্রহ্ম জ্ঞান বলিতে সবিশেষ ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ অঙ্গকান্তির ব্যাপক অনুভূতি মাত্র বুঝিতে হইবে। যাহাই হউক উভয়বিধ জ্ঞানই মোক্ষের কারণ। "নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।"

জ্ঞানের সমান পবিত্র বস্তু কিছুই নাই। পৃথিবীর সমস্ত পাপীগণ হইতেও যিনি অধিক পাপকারী, তিনিও এই জ্ঞানপোত আরোহণ করিলে, অবহেলে সমুদয় পাপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন। শুদ্ধ তাই কেন, প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন সমস্ত ভস্মীভূত করিয়া থাকে, জ্ঞানরূপ অগ্নিও তদ্রূপ সমুদয় দুঃখের কারণভূত সর্ব্ব প্রকার শুভাশুভ কর্ম্মকে নাশ করিয়া থাকে। গুরুউপদেশে আস্তিক্য বুদ্ধিশালী, ভগবন্নিষ্ঠ, সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই, এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। এবং অচিরেই পরম শান্তিময় মুক্তিধামে প্রস্থান করে।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥" গীতা ৪।৪০

পরমাত্মা স্বরূপ শ্রীভগবানের সহিত জীবাত্মার যে মিলন তাহাই যোগ শুদ্ধ তাই কেন, নিত্য শুদ্ধ শ্রীভগবানের সহিত অনাদি বহির্ম্মুখ জীবের মিলিত হইবার যে উপায়, তাহাও যোগ নামে কথিত হয়। "যোগোপায়ঃ" মহর্ষি পাতাঞ্জল বলেন, "যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ"। কাম ক্রোধাদি চিত্তবৃত্তি সমূহের নিরোধ সাধনই যোগ। শাস্ত্রকারগণ "যোগ শব্দে কেবল মাত্র "প্রাণায়াম, কুম্ভক, রেচকাদি" অষ্টাঙ্গ যোগকেই লক্ষ্য করেন নাই, পরন্তু কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি সকলকেই লক্ষ্য করিয়াছেন॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রতি অধ্যায়ের পরিশেষেই বেদব্যাস "কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ" প্রভৃতি যোগ শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। তবে এখানে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তির পৃথক পৃথক আখ্যা দেওয়ায়, শব্দের রূঢ়িবৃত্তি দ্বারা যোগ শব্দে অষ্টাঙ্গ যোগকেই বুঝিতে হইবে। যিনি পরিমিত আহার বিহারকারী, পরিমিত নিদ্রাশীল যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া নির্ব্বাত দীপশিখার ন্যায় অনন্ত সুখ স্বরূপ পরমাত্ম তত্ত্বে মন স্থির করিতে পারিয়াছেন তিনিই প্রকৃত যোগী। তাঁহাকে বহির্জাগতিক কোনরূপ সুখ দুঃখ কিছু মাত্র অভিভূত করিতে পারে না।

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতেনাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥"

যাহা পাইলে অপর লাভকে তদপেক্ষা অধিক মনে করেন না, সে অবস্থায় থাকিলে শীতোষ্ণাদি মহাদুঃখও কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না, তাহাই যোগীগণের আত্মানন্দ। আত্মা বিশ্বব্যাপী। সর্ব্বমততি বিশ্বমিতি আত্মা" সেই

নিমিত্ত যে গীগণ যেদিকে নয়ন দেন, সেই দিকেই পরমাত্মার অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যময় সর্ব্বব্যাপী বাসুদেব রূপ দর্শন করিয়া পরমানন্দে বিভোর হইয়া থাকেন। জ্ঞানের উৎকৃষ্টতর অবস্থাই যোগ। যোগী দ্বিবিধ। যুক্ত ও যুঞ্জান। পরোক্ষ, অপরোক্ষ, উভয়বিধ জ্ঞান দ্বারা পরিতৃপ্ত চিত্ত, নির্ব্বিকার, জিতেন্দ্রিয় মৃত্তিকা, পাষাণ ও কাঞ্চনে সমদৃষ্টি বিশিষ্ট যোগী নামে কথিত হয়। নারদ, ব্যাস, শুকদেব প্রভৃতি যুক্ত যোগী। তদ্ভিন্ন সকলে যুঞ্জান যোগী। যোগী জ্ঞানী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥" গীতা ৬ ৪৬

হে অর্জ্জুন! যোগী তপ পরায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, অতএব তুমি যোগী হও। এবম্ভূত যোগী অপেক্ষা ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতে নান্তরাত্মনা
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ গীতা

সর্ব্ব প্রকার যোগী হইতে একজন নিষ্কাম ভগবদ্গতচিত্ত শ্রদ্ধালুভক্ত শ্রেষ্ঠ "যোগীনাম এই স্থলে "পঞ্চম্যর্থে ৬ষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। নির্দ্ধারণে নহে। এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর উৎকর্ষ বুঝাইলে পঞ্চমী ব্যবহৃত হয়। "পঞ্চম্যোৎকোৎকর্ষে" অতএব কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, সকল হইতেই নিষ্কিঞ্চন সেবা পরায়ণ ভক্ত শ্রেষ্ঠ। যদ্দ্বারা চিত্ত সম্যগ মসৃণ হয় যাহা সর্ব্বথা মমত্বাভিমানে পূর্ণ, সেই ঘনীভূত ভাবকেই জ্ঞানীগণ, প্রেমভক্তি বলিয়া থাকেন।

অনন্য মমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেম সঙ্গতা
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধব নারদৈঃ। (নাঃ পঞ্চরাত্রে)

প্রেমের স্বরূপ সম্যগ প্রকাশ করা যায় না। ভক্তপ্রবর দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন "অনির্ব্বচনীয় স্বরূপং মূকাস্বাদনং বৎ" মূক যেমন হৃদয়স্থ কোনভাবই প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, ভক্ত ও তদ্রূপ প্রেমের অনুভব প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না।

অপ্রমেয় নির্গুণ শ্রীভগবানকে বশীভূত করিতে একমাত্র নির্গুণা ভক্তি দেবীই সমর্থা। ভক্তিবলেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবান আজ ভক্তের

দ্বারে আবদ্ধ। শ্রীভগবান্ ভক্তিতে যত বশ হন, তেমনটী যোগে, জ্ঞানে বা কর্ম্মে কিছুতেই হন না। তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে নিজমুখে বলিতেছেন—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥"　১৮।৬৫

হে অর্জ্জুন! আমাতে মন দাও, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর, এবং আমাকে নমস্কার কর, তাহা হইলে তুমি আমাকেই পাইবে। তুমি আমার প্রিয়, তোমার কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি। আবার বলিয়াছেন,

"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥"　১২।৪

হে সখে! অব্যক্ত সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মে আসক্ত-চিত্ত জনগণের সাধনায় সিদ্ধিলাভ বড় ক্লেশকর, কারণ দেহিগণ অতি দুঃখে অব্যক্ত বিষয়ে নিষ্ঠালাভ করে। কিন্তু যাঁহারা আমাতে সর্ব্বকর্ম্ম অর্পণ পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া অনন্যভাবে আমারই আরাধনা করেন, হে পার্থ! আমি সেই সেই মহাপ্রাণদিগকে অচিরাৎ মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করি। পুনরায় বিশদ করিয়া বলিয়াছেন,

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"　১৮।৬৬

হে অর্জ্জুন! তোমার অন্য কিছু ভাবনার আবশ্যক নাই, তুমি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র আমারই শরণ লও। আমি তোমাকে এই দেব-মোহিনী দুরত্যয়া মায়া হইতে উদ্ধার করিব। শরণাগতি ভক্তির একটী অঙ্গ। অতএব ভক্তিই যে গীতার উদ্দেশ্য, ধ্যানের উদ্দেশ্য, শ্রীভগবানকে প্রাপ্তির সহজ উপায় সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন, "সা তু কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগেভ্যোঽপি অধিকতরা" ভক্তি কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ অপেক্ষা উৎকৃষ্টা, কেননা "ফলরূপত্বাৎ" ভক্তি কর্ম্মাদি সর্ব্ব সাধারণের ফলস্বরূপা। জীব যে কোন কর্ম্মই করুক না কেন, যে কোন সাধনাই অবলম্বন করুক না কেন শ্রীভগবানে ভক্তি লাভই তার চরম পর্য্যবসান।

"সবৈ পুংসাম্ পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"

শ্রীভগবানে অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তি স্থাপনা করা জীব মাত্রেরই পরম ধর্ম এবং তাহা হইলেই মানুষের চির অশান্ত হৃদয় পরমা শান্তি লাভ করে। সংসারে এ অপেক্ষা অন্য মঙ্গলময় পথ আর নাই।

"ন হ্যতোঽন্যো শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ॥" ভাঃ ২।২।৩৩

ভক্তি রস স্বরূপা, অতি কোমলা। মানুষের অনাদি বহির্মুখ নীরস কঠিন চিত্তকে দ্রবীভূত করিয়া সরস করিতে ভক্তি ব্যতিরেকে আর অন্য উপায় নাই। ভক্তি বিজ্ঞানানন্দময়ী; সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানের আনন্দময়ী শক্তি। মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন, "সা মুখ্যেতরাপেক্ষিতত্বাৎ" (শাণ্ডিল্য সূত্র) ভক্তি কর্ম্মাদি অপেক্ষা পূজ্যা কেননা সকলকেই ভগবদ্ভক্তির অপেক্ষা রাখিতে হয়। আরও এককথায় ভক্তি শূন্য কর্ম্মে মুক্তি হয় না,—যথা—

"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাব বর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥" ভা. ১।৫।১২

ভক্তি শূন্য জ্ঞানে মুক্তি হয় না—যথা—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধ বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"
ভাগবত ১০।২।৩২

হে অরবিন্দাক্ষ, যাঁহারা মুমুক্ষু হইয়াছেন, তাঁহারা যদি তোমাতে প্রীতি শূন্য হয়েন তবে তাঁহারা ক্লেশসাধ্য পরম পদে আরোহণ করিলেও পুনর্ব্বার তথা হইতে স্খলিত চরণ হইবেন। কেননা "সত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্" সত্বগুণ হইতে জ্ঞানের উদ্ভব। সত্বগুণ মায়িক। কাজেই গুণাত্মক জ্ঞানে গুণাতীত মুক্তিলাভ সুদূর পরাহত। তাই ভক্তির সাহায্য আবশ্যক। ভক্তিকে কাহারও অপেক্ষা করিতে হয় না। ভক্তি নিজেই মুক্তিরূপা। "ভক্তিরেব মোক্ষ ইতি সিদ্ধঃ" (শ্রীধর স্বামী) তাই শ্রীভগবান ভক্তির এত বশ। "ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তি বশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী বিজ্ঞানানন্দঘনা সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি।" (গোঃ তাপনী) মূলে "এব" শব্দ থাকাতে ভক্তি ব্যতিরেকে অন্য কাহারও যে ভগবৎ সান্নিধ্য প্রাপ্তি করাইবার শক্তি নাই, তাহাই দেখান হইল। শ্রীভগবান্ ভক্তিদেবীরই অধীন, আর কাহারও নন।

"ন সাধয়তি মাং যোগো, ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায় স্তপ স্ত্যাগো যথা ভক্তি মমোর্জ্জিতা॥" ভাঃ ১১।১৪।২০

হে উদ্ধব! যোগ আমায় সাধিতে পারে না, সাংখ্যধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মানাত্ম বিবেক, বেদাধ্যায়ন, ব্রহ্মচর্য্য এবং ত্যাগ কিছুই আমাকে তেমন বশীভূত করিতে পারে না, শুদ্ধা ভক্তি যেমন আমাকে ভক্তের অধীন করিয়া ফেলে। শ্রীভগবানে যাহার অহৈতুকী ভক্তি সঞ্চার হইয়াছে, তাহার আর অন্য কোন ক্রিয়া কর্ম্মের আবশ্যক করে না, নিখিল গুণ সহ দেবগণ তথায় অবস্থান করেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম সমস্তই তাঁহার পূর্ণ হইয়া যায়, "মুক্তি তস্য করে স্থিতা"। অর্থাৎ মুক্তি তাহার করতল গত হয়। ভক্তির অবান্তর ফল মুক্তি। মুক্তি শব্দে বন্ধন নাশ, নির্ব্বাণ নহে, কেননা নির্ব্বাণকে ভগবদ্ভক্ত অতিশয় ঘৃণা করে।

"কৈবল্যং নরকায়তে" কৈবল্যকে তাহারা নরকের মত ঘৃণা করে। নরক বরং শ্রেয়স্কর তবু ব্রহ্ম নির্ব্বাণকে ধিক্কার।

"নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়।"

ভগবান্ কপিলদেব স্বীয়মাতা দেবহুতিকে বলিয়াছেন,

"সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥" ভাঃ ৩।২৯।১৩

হে অম্ব! আমি আমার ভক্তকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য এমনকি একত্ব অর্থাৎ সাযুজ্য মুক্তি প্রদান করিলেও, তাহারা আমার সেবা ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রহণ করে না; ভালবাসার এমনই ধারা যে, ভক্তও যেমন শ্রীভগবানের সেবা ব্যতিরেকে কিছুই চায় না, শ্রীভগবানও তদ্রূপ ভক্তের প্রেমময় হৃদয় ব্যতিরেকে কোথাও সেইরূপ শান্ত, সুন্দরতমরূপে অবস্থান করেন না।

জগৎপূজনীয়া, পবিত্রীকৃতবসুন্ধরা, নিখিলজন মনপ্রাণশীতলকারিণী, জাহ্নবীর সলীলরাশি, স্বোত্থিতলহরীগণ তাহাকে ফিরাইয়া ফিরাইয়া দিলেও যেমন তাহাদের মানা না মানিয়া, বা বৃক্ষ শৈলাদি কাহারও বাধা না শুনিয়া মনের আবেগে তর তর বেগে আনন্দে কুলু কুলু ধ্বনি করিতে করিতে, তরঙ্গ ভঙ্গে নাচিতে নাচিতে, ভক্তপ্রদত্ত নানাফুলে সাজিয়া সাগরের অভিমুখে অবিচ্ছিন্নভাবে ধাবমানা হইতে থাকে, সেইরূপ মদ্‌গুণ শ্রবণমাত্র ভক্তের মনোগতি অন্য ফলের কথা দূরে থাকুক, মৎপ্রদত্ত সালোক্যাদি পঞ্চবিধ

মুক্তিকেও অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, বিঘ্নান্তরের আটক না মানিয়া, জগৎ বাসীকে ত্রাণ ও পবিত্র করিতে উপদেশরূপ শীতল বারি সেচনে তত্ত্বজিজ্ঞাসুর মন প্রাণ শীতল করিতে করিতে, তর তর বেগে আমার প্রতি প্রধাবিত হয়। অহৈতুকী অর্থাৎ ফলানুসন্ধান শূন্য এবং অব্যবহিতা অর্থাৎ ভেদদর্শন রহিতা যে মনোগতি তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" (শাণ্ডিল্যসূত্র) ঈশ্বরে পরম অনুরাগই ভক্তি। "সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা" (নারদসূত্র) শ্রীভগবানের প্রতি অনবচ্ছিন্ন প্রগাঢ় অনুস্মৃতিই ভক্তি পদবাচ্য। নির্ঘণ্টকার বলেন, "শ্রীভগবানের সেবাই ভক্তি, যেহেতু "ভজ ইত্যেষ ধাতু র্বৈ সেবায়াম্, পরিকীর্ত্তিতঃ। নারদ পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্
হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

ভক্তচূড়ামণি মাননীয় শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন,

"অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত তাঁহারই রুচিকর যে কোন ক্রিয়া তাহাই ভক্তি। ঐ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্মাদি সম্পর্ক বিরহিত ও ভজন মাত্র অভিলাষযুক্ত হইয়া উত্তমা ভক্তিনামে অভিহিত হয়। জ্ঞানবিরহিত ভক্তি বলিতে নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান বিষয়ক জ্ঞান বিরহিত বুঝিতে হইবে। নতুবা উপাস্যতত্ত্বের অনুসন্ধান বিষয়ক জ্ঞান নহে, যেহেতু তাহা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে আচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিম্নলিখিত ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।

ভগবদ্বশীকরণ হেতুভূতা ভক্তির স্বরূপ কি উহা কি প্রাকৃত সত্ত্বময় জ্ঞানানন্দরূপিণী? অথবা উহা কি শ্রীভগবানের স্বরূপ জ্ঞানানন্দস্বরূপিণী, কিংবা উহা কি জীবের জ্ঞানানন্দস্বরূপিণী, অথবা উহা শ্রীভগবানের পরাশক্তির সাররূপা যে হ্লাদিনী শক্তি, উহার সার সমবেত সম্বিত শক্তির সার স্বরূপা?

ভক্তি কখনও প্রাকৃত সত্ত্বময় জ্ঞানানন্দরূপিণী নহেন। কেননা শ্রীভগবান্‌কে বশীভূত করিবার শক্তি ভক্তির আছে, কিন্তু মায়ার নাই; শ্রীভগবান্ মায়ার বশীভূত নহেন। "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যপরং ধীমহি।" দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত হয় না, কেননা শ্রীভগবান্ ভক্তের ভক্তিতে অধিক আনন্দ অনুভব করেন, শ্রীভগবান্ পূর্ণ, অতএব তাঁহার স্বরূপানন্দের

হ্রাসবৃদ্ধির অসম্ভাবনা বশতঃ উহা সম্ভব হয় না। তৃতীয়, ভক্তি কখনও জৈব জ্ঞানানন্দ হইতে পারে না। কেননা জীবের আনন্দ ক্ষুদ্র ও ক্ষয়শীল, ভক্তি নিত্য ও বিপুলা। সুতরাং অনুচৈতন্য জীবের আনন্দ কখনও বিপুল আনন্দরূপা নিত্যভক্তিরূপে গণ্য হইতে পারে না। অতএব চতুর্থপক্ষই স্বীকার্য্য। অর্থাৎ শ্রীভগবানের হ্লাদিনীশক্তি ও সম্বিৎ শক্তির সমবেত সাররূপা পরাবস্থাই ভক্তি। পরিশেষে বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন—"তৎ সারত্যঞ্চ, তন্নিত্য পরিকরাশ্রয়ক তদানুকূল্যাভিলাষ বিশেষ।" শ্রীভগবানের নিত্যপরিকরগণে অবস্থিত ভগবদ্বিষয়ে অনুকূল অভিলাষবিশেষই ভক্তি।

ঐ ভক্তি সাধন, ভাব ও প্রেমভেদে ত্রিবিধ। সাধনভক্তি দ্বিবিধ। বৈধী ও রাগানুগা। শ্রীভগবানে অনুরাগ নাই, কেবলমাত্র শাস্ত্রসমূহের শাসনবাণী কর্ত্তৃক চালিত হইয়া কর্ত্তব্য বোধে শ্রীভগবানে যে প্রবৃত্তি, তাহাই বৈধীভক্তি। বৈধীভক্তির সাধনাঙ্গ নয়টী।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং
ইতি পুংসার্পিতাবিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নব লক্ষণা॥" ভাঃ ৭।৫।২৩ ২৪

নামশ্রবণ, গুণ কীর্ত্তন, লীলাস্মরণ, বিগ্রহসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, এবং আত্মনিবেদন এই নবধাভক্তির সাধনে জীবহৃদয়ে অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। একাঙ্গ সাধন করিলেও ফললাভ হইয়া থাকে।

"এক অঙ্গ সাধে কিম্বা সাধে বহু অঙ্গ
দিনে দিনে বাড়ে তার প্রেমের তরঙ্গ॥" (চৈঃ চঃ)
বিরাজন্তীমভিব্যক্তিং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥

ব্রজবাসিজনে রাগাত্মিকা ভক্তি পরিপূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছে। তাঁাদের অনুগমন করাকে রাগানুগা বলা হয়।

পরম প্রেমের আস্পদ শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তের যে প্রেমময়ী তৃষ্ণা, তাহাকে রাগ বলা হয়। শাস্ত্র এবং সুধীগণ এই রাগময়ী ভক্তিকেই রাগাত্মিকা কহিয়া থাকেন। রাগাত্মিকা আবার কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা ভেদে দ্বিবিধ।

"সা কামরূপা সম্বন্ধরূপাচেতি ভবেদ্দিধা।"

যাহা শ্রীভগবানকেও প্রেমরূপে পরিণত করে যাহা কেবলমাত্র কৃষ্ণসুখের নিমিত্ত হইয়া থাকে, যাহাতে বিন্দুমাত্র আত্মেন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার প্রবৃত্তি নাই, তাহাই প্রেমরূপা। সুনির্মল গোপীপ্রেম শাস্ত্রে কোথাও কাম নামে কীর্তিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না।

"সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কাম্যক্রিয়া সাম্য তারে, কহে কাম নাম॥
নিজেন্দ্রিয় সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য গোপীভাব বর্য॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে কহি কাম।
কৃষ্ণ সুখতরে বাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

এই প্রেমরূপা ভক্তি কেবল ব্রজগোপীদের মধ্যেই বিরাজমান।

"সম্বন্ধরূপা গোবিন্দে পিতৃত্বাদ্যাভিমানতা"

নন্দ যশোদাদি পিতামাতা ও সুবল শ্রীদামাদি সখাগণে সম্বন্ধরূপা ভক্তি। আমি গোবিন্দের পিতা, মাতা, সখা, ইত্যাদি অভিমানই সম্বন্ধরূপা ভক্তির মূল। রাগাত্মিকা দ্বিবিধ বলিয়া, রাগানুগা ভক্তিও দ্বিবিধ। কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা "প্রেমাস্তু প্রথমাবস্থা ভাবইত্যভিধীয়তে" প্রেমের প্রথমাবস্থাই ভাব। শাস্ত্রে যাহাকে শুদ্ধ সত্ত্বাবশেষ বলিয়া কীর্তন করেন, যাহা প্রেমসূর্য্যের কিরণসহিত সমতুলিত, যাহার উদয়ে চিত্ত দ্রবীভূত হইতে থাকে, তাহাই ভাবভক্তি।

"সম্যঙ্ মসৃণত স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥"
নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে নচ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥" (পদ্মপুরাণ)

হে নারদ! আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, যোগিগণের হৃদয়েতেও থাকি না, কিন্তু যে স্থানে আমার ভক্ত প্রেমে বিভোর হইয়া আমার গুণ গান করেন, আমি সেই স্থানেই থাকি। ইহা আমার অনুগ্রহ নহে, ইহা ভক্তের অন্তরঙ্গ ভক্তির বল। হে নারদ! আমি ভক্ত পরাধীন, এবং ভক্ত হইতে অস্বতন্ত্র। আমার সমস্ত হৃদয়খানি তাহারা অধিকার করিয়া আছে। ভক্ত যেমন আমাকে ভিন্ন জানে না আমিও ভক্ত ব্যতীত কিছুই জানি না, কারণ

আমি ভক্ত প্রিয়। ভক্তি এমনই আনন্দময়ী, এমনই চিত্তাকর্ষণকারী। জ্ঞানীগণের ব্রহ্মানন্দ হইতে, যোগীগণের আত্মানন্দ হইতেও ভগবদ্ প্রেমানন্দ যে অধিক মধুরতাময়ী, তাহাই বুঝাইতে শ্রীমদ্ভাগবত, উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছেন,—

"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ পরায়ণ।
সুদুর্ল্লভ প্রশান্তাত্মা কোটী স্বপি মহামুনে ॥"

হে মহামুনি! কোটী কোটী মুক্তসিদ্ধ পুরুষগণ অপেক্ষা একজন প্রশান্তাত্মা নারায়ণ পরায়ণ ব্যক্তি অতি সুদুর্ল্লভ। কেননা—

"জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তি ভুক্তির্যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধন সহস্রৈ র্হরিভক্তি সুদুর্ল্লভা ॥"

ভক্তি লাভ অতি সুকঠিন। কামনা বাসনা সম্যকরূপে বিসর্জ্জন দিতে না পারিলে ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হয় না।

"ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবদ্ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবৎ ভক্তি সুখস্যত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥"

যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা স্বরূপিণী পিশাচী হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কি প্রকারে সাধক হৃদয়ে ভক্তিসুখ আবির্ভূত হইতে পারে। মুক্তিকে পিশাচী বলাহইল তাহার কারণ, স্বশক্তি দ্বারা জীবকে ভ্রান্ত করিয়া পথভ্রষ্ট করাই যেমন পিশাচীর কার্য্য, তদ্রূপ ভুক্তি মুক্তি স্পৃহাও নিত্য ভগবদ্দাস জীবকে ভগবদ্ভজন ভুলাইয়া পরমানন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তি লাভই জীবের জীবত্বতার পরম শান্তি। যাহা হউক এইবার শ্রীভগবানের মুখারবিন্দ নিঃসৃত একটী কথায় কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ও ভক্তির মধ্যে কোনটা শ্রেষ্ঠ তাহা উদ্ধৃত করিয়া প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব। নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, ভক্তশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, "স্বয়ং শ্রীভগবান যাঁর রথের সারথি," তিনি শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥" গীতা ১২।১

হে ভগবান! যাহারা তোমার ভক্ত, এবং যাঁহারা অক্ষর ব্রহ্মে আসক্ত চিত্ত, তাহাদের মধ্যে কে উৎকৃষ্ট যোগী? শ্রীভগবান উত্তর দিতেছেন,—

"ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাঃ স্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥" গীতা ১২।২

হে অর্জ্জুন! আমাতে শ্রদ্ধাসম্পন্ন নিত্যযুক্ত ভক্তই শ্রেষ্ঠ যোগী। কেননা আমি ভক্তিরই বশ। বিশেষতঃ আমাকে যাঁহারা লাভ করেন, ঐ অক্ষর ব্রহ্ম বা পরমাত্মা লাভ তাহাদের আনুসঙ্গে ঘটিয়া যায়। কারণ ব্রহ্ম আমার অঙ্গপ্রভা, পরমাত্মা আমার অংশ প্রকাশ। অতএব আমাতে ভক্তি লাভই জীবের পরম প্রাপ্তি। ইহার উপরে আর কিছুই নাই।

(শ্রীঅমৃত নাথ মুখোপাধ্যায়) শ্রীকালাচাঁদ

শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র দাস প্রসঙ্গ।

(৪)

[আড়িয়াদহ বাগানে যাতায়াত]

[আমার কতকগুলি ডাইরির মত খাতা ছিল। দুর্ভাগ্য বশতঃ (মস্তিষ্ক বিকৃতিতে) সেগুলি নষ্ট করিয়া ফেলি। এজন্য বিস্তর আবশ্যকীয় সংবাদ আর জানিবার উপায় নাই। কতক কতক মনে আছে কতক কতক বা স্থানে স্থানে লেখা আছে সেই গুলিই এক্ষণে লিখিতেছি।]

বাবাজী মহাশয়ের মধুর চরিত্রের আলোচনা বিষয় আমি একেবারে অনুপযুক্ত। তবে, যে সমুদায় ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছি বা তাঁর শ্রীমুখ হ'তে শুনেচি, সেইগুলিই সংক্ষেপে বিবৃত করবার ইচ্ছা। কিন্তু ইহাতেও ভয় হয় পাছে কোন প্রকারে তাঁহার উজ্জ্বল মহিমা খর্ব্ব করিয়া ফেলি। আবার ভরষাও আছে তিনি পিতা আমি তাঁহার অজ্ঞান সন্তান।

বাবাজী মহাশয় এবং নবদ্বীপ দাদা আড়িয়াদহের বাগানে প্রথম বার এসে প্রায় দুই মাস ছিলেন। সেখান হইতে কলিকাতায় এবং কলিকাতা হইতে পুনরায় ঐ বাগানে আগমন করেন। যতদিন বাগানে ছিলেন তারমধ্যে

কখন আমি একা, কখন গোপাল মামা, কখন পুলীন দাদা এবং কখন রাম দাদার (১) সঙ্গে দর্শন কর্ত্তে যেতাম।

একদিন রাম বাবু ও আমি বাবাজী মহাশয়কে দর্শন কর্ত্তে গিয়েছি। বাবাজী মহাশয় রামকে বড়ই ভাল বাসতেন। নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ব'লে রহস্য ক'রে "ভট্‌চায" ব'লে ডাকতেন। আমরা যাবা মাত্রই বল্লেন "কি বাবা! আহার হ'য়েছে না এখানে হবে? স্বপাকে যদি হয় তবে সবই উপকরণ আছে।" আমরা হাস্‌চি এমন সময়ে ললিতা দিদি আমাদের নিকটে এলেন। কয়েক বার যাতায়াতে এঁরা আর আমাদের কাছে আস্‌তে সঙ্কোচ করেন না। দিদি বল্লেন;—"ভাই আমাদের হাতে খাবে কি? আমরা কি জাতের মেয়ে, তোমরা ব্রাহ্মণ।" দিদির স্নেহমাখা কথা এই প্রথম আমরা শুন্‌লাম। আমাদের খুবই আনন্দ হ'তে লাগলো। আর এঁদের সব কি সুন্দর ভাব, তাই ভাবতে লাগলাম। তারপরে বাবাজী মহাশয় ও নবদ্বীপ দাদার কাছে বসে বসে অনেক কথা বার্ত্তা হ'তে লাগ্‌লো। এই সময়ে ডাক পিয়ন একখানি পত্র ও খবরের কাগজ দিয়ে গেলো। বাবাজী মহাশয় আমাদের হাতে দিয়ে বল্লেন "কি লিখেচে পড়্।" আমরা—"আপনিই পড়ুন না।" বাবাজী মহাশয়—"আরে আমি কি লেখাপড়া জানি।"

তারপরে খবরের কাগজে যেখানে সরকারী কর্ম্মচারীদের বদ্‌লী সংবাদ থাকে, সেই খান্‌টা আমাদের পড়তে বল্লেন এবং কটকের কে কে কোথায় বদ্‌লী হ'লো—জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

আর একদিন দুপুর বেলা আমি ও রাম গিয়ে দেখি, বাবাজী মহাশয় হল ঘরে বসে আছেন এবং একটা পিতলের পানের ডিবে নিয়ে মেঝেতে বালকের মত ঘোরাচ্চেন ও নাচাচ্চেন। ডিবেটা গড়িয়ে যাচ্চে উনি ব্যস্ত হ'য়ে কুড়িয়ে নিয়ে লুকুচ্চেন, আবার গড়াতে গড়াতে দু-খণ্ড হ'য়ে গেলে তাড়াতাড়ি জুড়ে দিয়ে পূর্ব্ববৎ কর্‌চেন। চেহারার দিকে চেয়ে দেখি—চোখ মুখের ভাব

(১) এই রামদাদা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইনি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত অধ্যাপক স্বর্গীয় গিরিশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সঙ্গীতরত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। ইনিও সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ অভিজ্ঞ। নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ পরিবার। বিস্তর শিষ্য যজমান ছিল। কিন্তু ইহার ভাব নিজেই উদ্ধার হইলাম না আবার শিষ্যদের উদ্ধার করিব কি করিয়া? এজন্য সমুদায় শিষ্য যজমান ছাড়িয়া দিয়াছেন। এবং বর্ত্তমানে পানিহাটীতে থাকিয়া শিক্ষকতা করেন।

অন্ত প্রকার। যেন খুব তন্ময় হ'য়ে কচ্চেন। আমরা কোন কথা বলতে সাহস করচি না। ভাবচি ইনি খেলা ক'রচেন।

খানিক বাদে চেতন বা হুঁস হবার মত হ'য়ে ব'লে উঠলেন—"যাঃ চলে! সব পালিয়ে গেলো। পানের বাটা নিয়ে কেমন কাড়া কাড়ি কর্‌ছিলো; আহা!"

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম,—"কে পালিয়ে গেলো? আপনিতো একাই র'য়েছেন।"

আমাদের দিকে চেয়ে একটু হেসে বল্লেন—"শ্রীমতী রাধারাণী ও সখীরা সব পালিয়ে গেলো, পানের বাঁটা নিয়ে কেমন কাড়াকাড়ি করছিল।"

আমাদের তখন চমক্ ভাঙ্‌লো। যেটা ভাবছিলাম বাবাজীমহাশয় খেলা করছেন তার ভেতর এত বড় জিনিস! তখন থেকে বুঝতে পারলাম—ইনি বৃথা কাজে কখন থাকেন না, যে কাজই করেন তার ভিতর—ইঁহার আরাধ্য শ্রীভগবানের লীলা থাকে আর ইনিও সর্ব্বদাই লীলাতে মগ্ন হ'য়ে থাকেন। খানিক পরে আমাদের সঙ্গে কথা কহিতে লাগলেন। রামকে বল্লেন—"ভট্‌চায! তুই আমার সঙ্গে যাবি?"

রাম বল্লে—"যদি একেবারে সব ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারেন তবে যাই।"

তারপরে আমার দিকে চেয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন—"তুই ব্যাটা যাবিনি? তোর মাগও চাই কৃষ্ণও চাই, না? (১) তারপর আমাদের উভয়ের দিকে চেয়ে বল্লেন—পা টেপ্।" আমি দক্ষিণ চরণ এবং রাম বাম চরণ ভাগকরে সেবাকরতে লাগ্‌লাম। খানিক পরে বাবাজী মহাশয় আমাদের গা টিপে দিতে উদ্যত হ'য়েছেন দেখে আমরা হাস্‌তে হাস্‌তে দৌড়ে পালিয়ে গেলাম।

ঐ বাগানবাড়ীর কিছু দূরে রায়বাহাদুর মহাশয়ের খুব বৃহৎ গোলাপ

---

(১) অন্তর্য্যামী অন্তরের কথা টেনে ব'লেছিলেন। প্রকৃতই আমার ভাব ঐ রূপ। ধর্ম্ম কর্ম্ম আর কিছুনয় কেবল হুজুগ আর লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা। সত্যই ঐ সময়ে কয়দিন" যাতায়াতে আমার প্রাণে বিষম ভয় হ'য়েছিল, যদি কোনদিন বাবাজী মহাশয় "ভেক্ দিয়ে দেন। সংসার ছাড়া, বাপ্‌রে! সে আমার দ্বারা হবে না। এইরূপ মনের ভাবের সঙ্গে ঐ কথা শুনে ভাবলুম, না—ওঁরকাছে কিছুতো লুকোবার উপায় নাই। আমার মনের কথা সবই যে উনি জান্‌তে পেরেছেন। সেইদিন হ'তে ভয় হ'তে লাগলো। কিন্তু নবদ্বীপ দাদার কাছে কিছুমাত্র ভয় হ'তো না। মনে হ'তো দাদাদেন আমাদের মা আর বাবাজী মহাশয় যেন বাপ। ছেলেরা যেমন বাপেরকাছে ভয় করে, আর মায়কাছে আবদার করে। আমাদেরও ঠিক তেমনধারা হলো।

বাগান। নিত্য গাড়ী গাড়ী ফুল ফোটে। মিউনিসিপাল মার্কেটে ঐ সব ফুল বিক্রি হয়, এবং সাহেবদের উপহার দেন। খুব ভাল ভাল ফুল ফুটে সৌন্দর্য্য ও গন্ধে চারিদিক আমোদ ক'রে রেখেছে। বাবাজী মহাশয় একটু বেড়াবার জন্য ঐ বাগানে গেলেন এবং রামবাবুকে সঙ্গে নিলেন। আমি নবদ্বীপ দাদার কাছে বসে তাঁর কথা শুন্‌তে লাগলাম।

রামদাদা ফিরে এসে সব ঘটনা ব'লেছিল কিন্তু মনে নেই, দুই একটী যা মনে আছে তা এই :—

রামদাদা, বাবাজী মহাশয়কে কি একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, ঠিক সেই সময়ে দূর থেকে একটী লোক অন্য একটী লোককে চীৎকার ক'রে, কি বলছিলো, কিন্তু অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় রাম দাদার যা প্রশ্ন তারই যেন উত্তর বলেদিয়ে গেলো। বাবাজী মহাশয় রামকে বল্লেন "দেখ্‌লি! এরই নাম দৈববাণী।"

জগদীশবাবু ব'লে একটী অতীব বৃদ্ধ এবং মহাভক্ত বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য (এঁরকথা অন্যস্থানে বলিব।) তিনি বাবাজী মহাশয়কে খুঁজতে গোলাপবাগে এসেছেন। বাবাজী মহাশয় ওঁকে দেখে ফস্‌করে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছেলেদের মত "টু"—"টু"—ক'রে শব্দ কর'তে লাগলেন। শব্দ ধ'রে জগদীশবাবু যেই সেইস্থানে যান উনিও আবার ফস্‌ক'রে অন্য-গাছের আড়ালে লুকিয়ে ঐরূপ "টু" "টু" ক'রে শব্দ ক'রতে থাকেন। এইরূপ অনেকক্ষণ বালকবৎ লুকোচুরি খেলা খেলে পরে দেখা দেন। এবং নানা কথাবার্ত্তার পর ফিরে আসেন।

[রায় বাহাদুরের বাগানের স্মৃতি]

কয়েক দিন বাগান বাড়ীতে যাতায়াত কর্ত্তে কর্ত্তে এঁদের সব দৈনিক কার্য্য কলাপ দেখ্‌লুম ;—বাবাজী মহাশয় খুব ভোরে সকলকে জাগিয়ে দেন এজন্য খুব ভোর হ'তেই কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনান্তে ভক্তগণ স্নান আহ্নিক কর্ত্তে থাকেন। তারপরে ভোগরাগের ব্যবস্থা, তারপরে সকলে জলযোগ ও প্রসাদাদি প্রাপ্ত হন। অপরাহ্নে রামদাদা শ্রীচৈতন্য ভাগবত বা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত সুমধুর স্বরে পাঠ করেন আর সকলে শ্রবণ কর্ত্তে থাকেন।

পরিশেষে সন্ধ্যার পর কীর্ত্তন আরম্ভ হয়, অনেক রাত্র পর্য্যন্ত সে আনন্দ স্রোত চল্‌তে থাকে। তারপরে প্রসাদাদি পেয়ে সকলে বিশ্রাম বা শয়ন করেন। শয়ন সামান্য ক্ষণ, দিবা রাত্রই আনন্দ।

বাবাজী মহাশয়ের আগমন সংবাদ খুবই প্রচার হ'য়েছে। সকলেরই মুখে "আড়িয়াদহে একজন মহাপুরুষ এসেচেন" শুনতে পাই। নিত্য বাগানে নানা সম্প্রদায়ের ভক্তের আগমন হয়। বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী, গৃহী বিশেষতঃ কলিকাতা হইতে গাড়ি জুড়ি ক'রে বিস্তর বাবুরাও আসেন। কেহ আর্ত্তিভাবে, কেহ তর্ক করিতে কেহ বা যাচাই করিতে। নানা লোকে নানা ভাবে আসেন এবং নানাবিধ তর্ক ও প্রশ্ন করেন। বাবাজী মহাশয় সকলকেই সামান্য সামান্য কথায় এমন উত্তর দেন যে, তাঁদের সংশয় দূর হ'য়ে পরিতৃপ্ত হ'য়ে যায়, শিক্ষিত লোকেরা বিজ্ঞান সম্মত উত্তর পেয়ে অধিক আশ্চর্য্য হ'তে থাকেন। কথা বার্ত্তার মধ্যে গ্রাম্য ভাষা ভিন্ন একটীও ইংরাজী বা অন্য ভাষা ব্যবহার করেন না। আবার কত লোকে ইতিমধ্যে শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণও ক'রেছেন।

হলের সম্মুখের বারাণ্ডায় বিস্তর বেঞ্চ ও উডের চেয়ার। বাবাজী মহাশয় সকাল বিকাল সেইখানে বসে বসে কথা বার্ত্তা করেন। আমি মধ্যে মধ্যে বাগানে গিয়ে এক পাশে বসে সেই সকল কথা হাঁ করে শুন্‌তাম। একদিন একটী বাবু জিজ্ঞাসা করলেন ;—"দেখুন আমাদের পৌত্তলিক বলে অনেকে গালাগালি দেয়। এমন কি মুসলমান ও খৃষ্টানগণ বলে—তাদের শাস্ত্রে আছে বিগ্রহ পূজা ভয়ানক অপরাধ, এসব ক'রলে ঈশ্বর রুষ্ট হ'য়ে ভয়ানক দণ্ড দিবেন।"

বাবাজী মহাশয় :—বাবা! বিগ্রহ পূজা ক'রলে যে ভগবান্ রুষ্ট হবেন—আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে তো তা বুঝ্‌তে পারি না। শাস্ত্রের বচন বা মহাপুরুষদের কথার গভীর অর্থ আমরা ঠিক ভাবে গ্রহণ ক'রতে পারিনা ব'লেই যত বিরোধ বাঁধিয়ে ফেলি।

"আচ্ছা বাবা! মনেকর একজন তারী রাজ ভক্ত-প্রজা। কিন্তু সে অতীব দরিদ্র, সামান্য লোক ; রাজ-দর্শন তার পক্ষে দুঃসাধ্য, কিন্তু ভক্তি বশতঃ সে যদি রাজার চিত্র নিয়ে পূজা করে, আর রাজা যদি দৈবক্রমে একদিন তার গৃহে এসে দেখেন যে আমারই এক প্রতিমূর্ত্তি-তলে ফুলচন্দন দিয়ে সুন্দরভাবে সাজিয়ে আমারই এক দীন হীন প্রজা চক্ষের জলে বুক ভাসিয়ে আমারই

আরাধনা ক'চ্চে, তখন সে রাজা কি সে প্রজাকে কেটে ফেল্‌তে হুকুম দেবেন? আপনার আমার মত সামান্য লোকের মনটার কি বলে বাবা?

আর একটী বাবুর সহিত কথায় কথায় কৌলিক আচারাদি সম্বন্ধে কথা উঠে। বাবাজী মহাশয় ঐ কথায় একটী গল্প বল্লেন তা শুনে সকলে হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

বাবাজী মহাশয় বল্লেন—

"বাবা! একজন বড়লোকের বেড়াল পুষবার খুব সখছিল, এজন্য বাড়ীতে বিস্তর বেড়াল রেখেছিলো। বড় লোকের বাড়ী—বার মাসে তের পার্ব্বন, তাই কোন ক্রিয়া কর্ম্মের সময়ে পাছে ঠাকুরদের ভোগের দ্রব্যে তারা মুখ দেয় এজন্য পূর্ব্ব হ'তে সব বেড়ালগুলোকে একস্থানে বেঁধে রাখ্‌তো। এই বেড়াল পোষা বাতিকটা কর্ত্তার পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে চল্‌তে থাকে, এবং ঐরূপ ক্রিয়া কর্ম্মের সময় সকলেই বেঁধে রাখ্‌তো। শেষে নিম্নতম বংশধরদের ভিতরে এটা একটা নিয়ম হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেলো। তখন বাড়ীতে বেড়াল না থাকলেও কোন ক্রিয়ার সময়ে অপর বাড়ী হ'তে বা রাস্তা থেকে বেড়াল ধ'রে এনে এক জায়গায় বেঁধে রেখে তবে কাজকর্ম্ম সমাধা হ'তো। লোকে জিজ্ঞাসা করলে ব'লতো—"কি ক'রবো বল, এটা আমাদের কৌলিক আচার, বাপ পিতামহ ক'রে গেছেন কেমন করে তা ছাড়ি বল।"

"বাবা! ঐ রূপ আমরাও মূল উদ্দেশ্য ভূলে গিয়ে বাহিরের কাজকেই নিয়ে টানা টানি করি।"

একদিন সকালে বাবাজী মহাশয় বারাণ্ডায় চেয়ারে বসে আছেন পাসেতে অনেক লোক বসে কথা বার্ত্তা শুন্‌চেন; সেই সময়ে একজন যুবক শিষ্য (বাবাজী) একটী পিতলের বাটীতে জল নিয়ে বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণামৃত নিতে এলেন। সমাগত লোকদের প্রতি লক্ষ্য ক'রে বাবাজী মহাশয় বল্লেন—

"দেখুন! এঁরা আমার শিষ্য নয়, এঁরা আমার গুরু। আমি অশক্ত তাই সকলে কৃপা ক'রে আমাকে অনবরত নাম শ্রবণ করাবার জন্যই সঙ্গে সঙ্গে থাকেন।

এমনও শুনেছিলাম, শিষ্যেরা যেরূপ কর্ত্তেন বাবাজী মহাশয়ও সেইরূপ একদিন জোর ক'রে শিষ্যের পাদোদক পান ক'রে ছিলেন।

একটু পরেই ভক্ত বাবাজী ঠাকুরের শ্রীচরণামৃত ও চরণতুলসী এনে বাবাজী মহাশয়কে পান ক'রতে দিলেন। বাবাজী মহাশয় উহা মস্তকে রেখে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন "তুই এইটা খেয়ে ফেল, তোর সব ভাল হবে।" আমি তাড়াতাড়ি পান ক'রে ফেললুম।

একদিন বাগানে গিয়ে শুন্‌লাম বাবাজী মহাশয়, সকলে নিদ্রাগেলে পর গভীর রাত্রে উন্মাদের মত ঘরথেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তারপরে "পাম" বা তালকুঞ্জের ভেতর হ'তে মূর্চ্ছিত অবস্থায় তাঁকে তুলে আনা হয়। চেহারা ঠিক মাতালের মত, চোক লাল। আজ কাল কীর্ত্তনে যোগ দিলে একটা না একটা কাণ্ড ক'রে ফেলেন, এজন্ত রামদাদা তাঁকে কীর্ত্তন কর্ত্তে দেন না। তাই হলের ভিতর যখন কীর্ত্তন হয় বাবাজী মহাশয় তখন বাহিরের বারাণ্ডায় বসে সমাগত ভক্তদের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কহিতে থাকেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে থাকতে পারেন না কীর্ত্তনের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করেন।

আর আমাদের নবদ্বীপ দাদা, এঁকে কোনদিনই কীর্ত্তন করতে দেখি নাই, তিনি হয় নিজের ঘরে, না হয় বাহিরে বা বাগানের এদিক ওদিকে বসে থাকেন, কখন বেড়ান। কোন নতুন লোক দেখ্‌লে তার সঙ্গে আলাপ করেন। বিশেষ ছেলে ছোক্‌রা পেলে তাদের সঙ্গে এমন ভাবে মেসেন যে, তাদের প্রাণের মধ্যে একেবারে বসে পড়েন। শেষে বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণে অর্পণ ক'রে দেন। আমি বাগানে গিয়ে বাবাজী মহাশয়ের দর্শনান্তে নবদ্বীপ দাদার কাছে বসে থাকি কখনও বা তাঁর সঙ্গে বেড়াই। আজকাল দাদাও যেন মাতালের মত অবস্থায় থাকেন।

অচ্যুতানন্দ ব'লে একটী ৯।১০ বৎসরের উড়িয়া বালক, কালরং গলায় মালা, মস্তকে শিখা, বহির্ব্বাস পরা; দেখতে বেশ সুন্দর; যেন বালবৈরাগী। বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে থাকেন ওঁকে; "বাবা" এবং ললিতা দিদিকে "মা" বলে ডাকে। বালকটীকে বাবাজী মহাশয় উড়িষ্যাদেশ থেকে পেয়েছেন।

অচ্যুতানন্দ বালক—খেলাকরে, দৌড়াদৌড়িকরে ললিতা দিদির কাছে ঠিক মায়ের মতই আব্দার করে। আবার বাবাজী মহাশয়কে ভয় করে। সে যখন তিলকসেবা ক'রে ঝোলা নিয়ে নাম ক'রতো তখন বড়ই সুন্দর দেখাতো। তার গলার স্বর বড়ই মধুর। আপনার মনে যখন বাগানের নিভৃত স্থান হ'তে "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম" গান ধরিত তখন প্রাণমন মোহিত ক'রে দিত। একদিন প্রভাতে সে গঙ্গাস্নান

ক'রে ঐ নাম গাহিতে গাহিতে আসছিলো—সেই সুর সেই রব যেন এখনও আমার কাণে বাজছে। (অচ্যুতানন্দকে ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনে রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুরের বাড়ীতে দেখেছিলাম! বাবাজীমহাশয়ের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ বনমালীবাবু ঐ বালকটীকে নিজের কাছে রেখেছিলেন। অচ্যুতানন্দ সুন্দর সুন্দর ফুলের মালা ও গহনাদি প্রস্তুত ক'রে শ্রীবিগ্রহকে দেয়। শ্রীবৃন্দাবনে রাজর্ষিগৃহে ঐ কার্য্যেই সে নিযুক্ত আছে। এখন সে যুবক।)

কলিকাতার যোগেন্দ্রনাথ বসু বেশ বড়লোক। তিনি বাবাজী মহাশয়ের বিশেষ ভক্ত। বাগানে প্রায়ই আসেন। বাবাজী মহাশয়কে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্যে খুব আগ্রহ কচ্চেন। উনিও যাবেন ব'লেছেন।

যোগেন্দ্রবাবুর একটী জামাই, বয়স আন্দাজ ২০।২২ বৎসর, কোর্ট পেণ্টলুন পরেই সংকীর্ত্তনে যেতে গেছেন। তারপরে একদিন দেখি জামাইবাবু একেবারে গেরুয়া কাপড় চাদর পরে সন্ন্যাসী সেজে একটা ঘরে চুপ করে বসে আছেন। রাত্রিতে যোগীনবাবু বাগানে এসে হাজির, এবং বাবাজী মহাশয়কে অনুনয় ক'রে বল্লেন ;—"ওকে বুঝিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিন ; ও সংসার ছেড়ে চ'লেযাবে মতলব ক'রেছে।

বাবাজী মহাশয় হাস্তে হাস্তে বল্লেন—"সেজন্য বাবা কোনই ভয় নেই জামাই বাবু এখনই বাড়ী যাবেন।"

কীর্ত্তনের পর জামাইবাবুকে ডেকে বল্লেন "দেখ! তোমার শ্বশুর মহাশয় এসেছেন, তার সঙ্গে যাও।" জামাই বাবু বাড়ী যেতে চান না। বৈরাগ্যের কথা বল্তে থাকেন। খানিক বাদে "পাশের কখানা সার্টিফিকেট্ আছে? ৩।৪ খানা সার্টিফিকেট্ না দেখালে আমি কাউকে মন্ত্র দেই না বা ভেক দিইনা, তুমি কি রকম লেখা পড়া জান তার প্রমাণ দাও তবে তোমাকে ভেক দেবো। আর ঐ সব যে বাবাজীদের দেখ্‌চো ও সব সার্টিফিকেট্ দেখিয়ে তবে বাবাজী হ'য়েছে" এই বলে হাস্তে লাগলেন।

জামাইবাবু কিন্তু নাছোড়বান্দা, তিনি কোনমতেই বাড়ী যাবেন না। তখন বাবাজী মহাশয় একটু ক্রুদ্ধস্বরে বল্লেন—"দেখ আমাকে যদি গুরু বোলে জ্ঞান হ'য়ে থাকে, তবে আমার আজ্ঞা পালনই তোমার ধর্ম্ম। আর কিছু না ব'লে খুব ক্ষুন্নমনে শ্বশুরের সঙ্গে নিকটেই বাড়ীর গাড়ি ছিল তাহাতে উঠিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট

সম্পাদকীয় মন্তব্য

বিগত ভাদ্র মাসের ভক্তিতে জানান হইয়াছিল যে, আশ্বিন ও কার্ত্তিক দুই মাসের কাগজ কার্ত্তিক মাসের প্রথমেই বাহির হইবে; কিন্তু এ কাজের যাঁহারা ভুক্তভোগী তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারেন যে, কর্ম্মকর্ত্তার ইচ্ছায় কিছু হয় না। ছাপাখানার কর্ত্তারা যতদিন না দয়া করিবেন ততদিন কিছুই হইবার উপায় নাই। আজ কাল করিয়া ক্রমেই কার্ত্তিক মাস শেষ করিয়া দিলেন, তথাপি ভক্তি বাহির হইল না। শেষে বিশেষ করিয়া তাঁহাদের ধবায় তাঁহারা আজ ভক্তি বাহির করিয়া দিলেন। গ্রাহকগণের নিকট হইতে বহু পত্র আমরা পাইয়াছি, কিন্তু পৃথকভাবে সকলকে উত্তর না দিয়া বিলম্বের কারণ ভক্তিতেই প্রকাশ করিয়া দিলাম। খুব আশা করা যায়, এরূপ বিলম্ব ভবিষ্যতে আর হইবে না। ইতি

ভক্তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

(২১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ সাল)

প্রার্থনা

জাগাও আকুল পিপাসা, (তোমায়) দেখিবারে হৃদে লালসা,
ভাবে ভুলে যাই, আপনা হারাই,
নাম শ্রবণ মনন কীর্ত্তনে।

হে দয়াময় দীনবন্ধো! যতই তোমার দয়ার কথা ভাবি ততই তোমার দিকে আকৃষ্ট না হইয়া পারি না। এমন দেবদুর্ল্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া যে সকল কার্য্য করা উচিত তাহা ত কিছুই করিলাম না, তপস্যা করিয়া, যোগক্রিয়া করিয়া ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা চিত্তস্থির করিয়া পরমাত্মা রূপী যে তুমি, তোমাতে একবারের জন্যও মনোনিবেশ করিতে পারিলাম না। তারপর, তোমাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া কায়মনোবাক্যে একেবারে যাঁহারা তোমার হইয়া গিয়াছেন, সর্ব্বদা তোমার নাম-গুণগানে বিমল আনন্দ লাভে যাঁহারা ধন্য হইয়াছেন, ক্ষণ-মাত্রও যদি তাঁহাদের সঙ্গ পাইতাম তাহা হইলেও জীবন ধন্য হইত। কিন্তু বিষয়রূপ মদিরাপানে হতজ্ঞান হইয়া একবারও তাঁহাদের সঙ্গলাভের জন্য লালায়িত হইলাম না। পক্ষান্তরে বিষয়মদের নেশায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া যাহাতে পাপ, তাপ ও সর্ব্বদা মনের অশান্তি আসে, সেই প্রকার কার্য্যেই দিবারাত্রি মগ্ন রহিয়াছি। এখন আমার যেরূপ অবস্থা হইয়াছে তাহাতে আশাও করিতে পারি না যে, তোমার নিকট কৃপা পাইব। তুমি ত অন্তর্য্যামী, সকল কথা, সকল অবস্থাই ত তুমি জানিতেছ।

এখন আর তোমাকে আমার বলিবার কিছু নাই। যে সকল গুণে তোমার দয়ার পাত্র হওয়া যায়, তাহার কোনটীই আমার নিকটে পাইবে না। তবু তোমার নিকট আজ প্রার্থনা করিতে উপস্থিত। কি চাহিব, কি চাহিলে আমার সন্তাপিত চিত্ত শীতল হইবে, কি করিলে প্রাণ তোমার জন্য যথার্থ ব্যাকুল হইবে কৃপাকরিয়া সেই উপায় আমাকে বলিয়া দাও।

যাঁহারা তোমার একান্ত ভক্ত হইয়াছেন, সর্ব্বান্তঃকরণে সকল প্রকার কর্ম্ম যাঁহারা তোমাতে অর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা ত ধন্য হইয়াছেনই; আমি কিছু করিতে পারিলাম না বলিয়া কি সারাজীবন এই দারুণ যন্ত্রণাদায়ক অভাবের বিকট মূর্ত্তি দর্শন করিয়া করিয়া ভয়েই মরিব? আমি যদিও তোমার উপর ষোলআনা বিশ্বাস ঢালিয়া দিতে পারিতেছি না, যদিও প্রাণ খুলিয়া তোমার মঙ্গলময় নাম করিতে পারিতেছি না, তথাপি আমার কাছে কি একবারও দয়া করিয়া প্রকাশ হইবে না? জীব যদিও তোমাকে ভুলিয়া থাকে তুমি ত ক্ষণকালও তাহার সঙ্গ ছাড়িতে পার না। কেননা তুমিযে জীবের জীবন? তোমাকে বাদ দিলে যে, জীবের জীবত্বই থাকে না। আমি তোমায় ডাকিতে পারি বা না পারি—তোমাকে চাই বা না চাই, তুমি ত আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না—সেই ভরসায় আজ ভাবুকের সুরে সুর মিলাইয়া প্রাণ খুলিয়া বলি—

"আমি নাইবা হে ভালবাসিতে জানিনু
তুমি ত জান হে ভালবাসা।
আমি নাইবা জানিনু সাধনা কেমন
তুমি ত জানহে সেধে আসা॥
নাইবা পারিনু ডাকিতে তোমারে
নাইবা বিদায় দিনু বাসনারে,
নাইবা পাইনু ত্রাণ রিপু-করে
(তবু) ঠেলিবে না আছে ভরসা॥
নাইবা গাহিনু তব জয় গান,
নাইবা গলিল এ পাষাণ প্রাণ,
নাইবা পারিনু দিতে প্রতিদান
তুমি ত রাখনা (কিছু) পাবার আশা॥

ঘৃণার নয়নে বিশ্ব হেরে যায়,
তোমার করুণা সে ত না হারায়,
আশা তাই স্থান পাব রাঙ্গাপায়
সেরে দু'দিনের কাঁদা হাসা ॥"

সম্পাদক

বিশ্বরূপের সঙ্গীত

[৪]

৬।—শ্যামল সুন্দর　　তনু মনোহর
নটবর রূপ ধন্য ধন্য।
বামে রাসেশ্বরী　　রাধিকা সুন্দরী
সাজে কি কিশোর কিশোরী ভিন্ন ?
হেলাইয়ে অঙ্গ শ্রীরাধা-অঙ্গে,
যদি একবার দাঁড়ায় ত্রিভঙ্গে,
ধরে দুই করে　　মুরলী অধরে
তবে, হরে অনঙ্গেরে কি কব অন্য ॥
হেন কৃষ্ণ যাঁর হেন রূপ গণি,
রাধা নাম তাঁর সুধা সঞ্জিবনী
সাধে মনোসাধে　　"রাধে" জয় জয় ধ্বনি
বাঁশী যন্ত্রখানি তাঁহারি জন্য ॥
গায় 'বিশ্বরূপ' কৃষ্ণ-রূপ ভেবে,
রাধারমহিমা তবে সে জানিবে,
রাধা ভাবে যবে　　উঁহারে কাঁদাবে
রাধিকার রূপে লুকাবে চিহ্ন ॥

—•—

৭।—পদে রুণু ঝুনু রুণু ঝুনু নূপুর বাজত
নাচত নদীয়া বিহারী।
নটন রঙ্গ নিজ অঙ্গনে শচী মাই
নিরখত দু'নয়ন ভরি।

নন্দগোপ সুত আবেশে নিমাই,
রাখালিয়া নাট প্রকট সুখ পাই,
ভালি নটন হেরি তালি বাজাই হরি—
হরি বোলত পুরনারী ॥
পুরবভাবে কত ভঙ্গি রাঢ়াই,
নাচিয়া নবনী চাহে জননীকো ঠাঁই,
স্তনক্ষীরে দু'নয়ন নীরে শচী মাই—
ভাসে গোরাচাঁদ মুখ হেরি ॥
মন্দ-হসনে মুখ-চন্দ্রচ্ছটা,
(যেন) চাঁদ ফাটিয়া বহে অমিয়া ঘটা,
নয়নে পলক হরে সেরূপ নেহারী হেরি—
সে নটন রঙ্গ মাধুরী ॥
'বিশ্বরূপ' ভণে হের শচীনন্দনে,
স্নেহ বাৎসল্য প্রীতির বন্ধনে,
যেমন নাচায় নাচে তেমনি আপনে মানে—
দীন প্রেমাধীন হরি ॥

সম্পাদক

মহাত্মা তুলসীদাস

চিত্রকূটের পূর্ব্বাংশে ও প্রয়াগের পশ্চিমাংশে অবস্থিত রাজাপুর গ্রাম মহাত্মা তুলসীদাসের জন্মস্থান। তাঁহারা কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ। তাঁহার পিতার নাম আত্মারাম দুবে এবং মাতার নাম হুলাসী দেবী। এই দম্পতির দুইটী পুত্র হইয়াছিল। 'প্রাম-সরল' গ্রন্থ প্রণেতা নন্দদাস জ্যেষ্ঠ ও তুলসীদাস কনিষ্ঠ। ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তুলসীদাস জন্মগ্রহণ করেন। আট বৎসর বয়সে তুলসীদাসের পিতৃবিয়োগ হয়; ইহার কিছুকাল পরে তিনি বিদ্যার্জ্জনের নিমিত্ত কাশীধামে গমন করেন। এইস্থানে প্রায় দ্বাদশ বর্ষ থাকিয়া তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

পরে বিবাহ করিয়া তিনি সংসারে প্রবিষ্ট হন। কথিত আছে তাঁহার স্ত্রী পরম লাবণ্যবতী ছিলেন এবং তিনি তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন।

তিনি এতদূর স্ত্রৈণ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, পত্নীকে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্তও চক্ষের অন্তরালে রাখিতে পারিতেন না। কাজেই তাঁহার পত্নীর পিত্রালয়ে গমন করা দুর্লভ হইয়াছিল। পুনঃ পুনঃ লোক ফিরাইয়া দেওয়ায় লজ্জিত হইয়া একদিন হুলসী দেবী পুত্রের অজ্ঞাতসারে স্বীয় বধূমাতাকে তাঁহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেন। তুলসীদাস গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বীয় মনোরমা প্রণয়িনীর মুখচন্দ্রমা দর্শন করিতে না পাইয়া বড়ই ব্যাকুল হইলেন। পরে প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কালবিলম্ব না করিয়া শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলেন। ইহাতে তাঁহার স্ত্রী বড়ই লজ্জিতা হইয়া তাঁহাকে মৃদু ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হইয়াছিল। আর তাহার পরই তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া একেবারে কাশীধামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। জন্মজন্মান্তরীণ সাধনাপূত জীবনে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শ্যামদূর্ব্বাদলকান্তি ফুটিয়া উঠিল। ভক্তের হৃদয়ক্ষেত্রে তাঁহার ইষ্টদেবতা চিরতরে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি একাগ্রচিত্তে সাধন ভজনে নিবিষ্ট থাকিতেন। প্রাতে উঠিয়া কাশীধামের সীমানার বাহিরে গিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিয়া শৌচের অবশিষ্ট জল একটী ঝোপের মধ্যে ফেলিয়া দিতেন। ঐ ঝোপে এক প্রেত বাস করিত, সে প্রতিদিন ঐ জল পান করিয়া তৃপ্ত হইত। একদিন তুলসীদাস ঝোপের মধ্যে জল না ফেলায় ঐ প্রেত তুলসীদাসকে দেখা দিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করে। তুলসী দাস বলিলেন, অদ্য শৌচের জল সমস্ত ব্যয় হওয়াতে উহা আর ঝোপে ফেলিবার আবশ্যক হয় নাই। এই পিশাচ তাঁহার উপর প্রীত হইয়া বর দিতে চাহিলে তুলসীদাস তাঁহার ইষ্টদেবতা শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পাইবার বর প্রার্থনা করিলেন কিন্তু তাহার এইরূপ বর দিবার ক্ষমতা না থাকায় তাঁহাকে কর্ণঘণ্টা নামক স্থানে এক ব্রাহ্মণের নিকট যাইতে আদেশ দিল। তুলসীদাস সেই ব্রাহ্মণের নিকট রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করেন এবং তথায় ছয়মাস ব্যাপী কঠোর সাধনা করিয়া সেই মহামন্ত্রে সিদ্ধ হইয়াছিলেন।

অপর মতে প্রেত তাঁহাকে বলিয়াছিল—এখানে একটী মন্দিরে রামায়ণের কথা হয়। সেখানে বহুলোকের সমাগম হয়। কিন্তু একটী বৃদ্ধব্যক্তি সকলের পূর্ব্বে শুনিতে আসিয়া সকলের পরে চলিয়া যায়। তিনি ছদ্মবেশী হনুমান, তাঁহাকে ধরিতে পারিলেই আপনার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে।

প্রেতের বাক্যে তুলসীদাস মহাপ্রীত হইয়া স্নান পূজা সমাপনান্তে সেই মন্দিরে গমন করিয়া দেখিলেন ঘটনা প্রকৃত। রামায়ণপাঠ শেষ হইলে তিনি সেই বৃদ্ধকে অনুসরণ করিলেন, পরে একটি নির্জ্জনস্থানে আসিয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া আপন মনোবাসনা জ্ঞাত করিলেন। তাঁহার কাতরতায় ছদ্মবেশী হনুমানের দয়া হইল। তিনি বলিয়াদিলেন চিত্রকূট-পর্ব্বতে যাও তথায় ভগবানের সাক্ষাৎ পাইবে। এই স্থানেই সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তুলসীদাস ত্রেতাযুগের রামলীলা সমস্ত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

তুলসীদাসের প্রশ্নে সেই প্রেত তাহার জীবন কাহিনী এইভাবে প্রকাশ করিয়াছিল——"আমি পূর্ব্বজন্মে বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ ছিলাম, আমি জীবনে কোন সৎকার্য্যই করি নাই। কেবল জনৈক পিপাসার্ত্ত ব্রাহ্মণকে জল পান করাইয়াছিলাম। সেই পুণ্যবলেই আমি আপনার নিকট পিপাসায় জল পাইয়াছি। ঐদেশীয় এক রাজা আমার যজমান ছিল, তাঁহার বাটীতে আমার অনেক লভ্য হইত। আমি অত্যন্ত লোভী ও দুষ্ক্রিয়াসক্ত ছিলাম। পূজাপার্ব্বন ও ব্রতাদিতে যাহাকিছু প্রাপ্য হইত তাহা আমার চক্রান্তে অপর সাধুসজ্জন বা ব্রহ্মণপণ্ডিতেরা প্রায় কিছুই পাইতেন না। আমিই সমস্ত গৃহে লইয়া যাইতাম। আমার আত্মীয় স্বজনদেরও আমার প্রভাবে তথায় ঐরূপ প্রতিপত্তি ছিল। একদিন রাজা কাশীযাত্রা করেন, আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। এই ঝোপের নিকট এক বিষধর সর্পের দংশনে আমার প্রাণবিয়োগ হয়। মৃত্যুর পর একদিকে যমদূতগণ ও একদিকে শিবদূতগন আমাকে লইতে আসিলেন। যমদূতগণ বলিলেন,—এব্যক্তি অত্যন্ত পাপী আমরা ইহাকে নরকে লইয়া যাইব। শিবদূতগণ বলিলেন,—না তাহা হইতে পারে না, এ যখন কাশীর মার্গে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তখন তোমরা এই মহাতীর্থের মহাবলে ইহাকে স্পর্শ করিতেও পারিবে না। এব্যক্তি ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়া বহুকাল এইস্থানেই থাকিবে এবং ক্ষুধা ও পিপাসা ভোগ করিয়া স্বীয় কর্ম্মফল ভোগকরিবে। পরে কোন হরিভক্ত ব্রাহ্মণের জলপান করিয়া মুক্ত হইবে। অতএব হে বিপ্রবর, কাশীর মহিমাবলেই আমার নরকদর্শন হয় নাই এবং আপনার প্রদত্ত জলপান করিয়া অদ্য আমি মুক্ত হইলাম।" এই বলিয়া সেই প্রেত অদৃশ্য হইয়াছিল।

তুলসীদাস কিছুকাল শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু তথায় সীতা রামের পরিবর্ত্তে রাধাকৃষ্ণ নাম শ্রবণ করিয়া আপন বাসা হইতে

বাহির হইতেন না। একদিন কোনব্যক্তি তাঁহাকে শ্রীরামচন্দ্র দর্শন করাইবার নাম করিয়া মদনগোপালের মন্দিরে লইয়া গিয়াছিলেন। তুলসীদাস মদন গোপালের হস্তে বংশী দেখিয়া বলিয়াছিলেন—

"কাঁহা কহোঁ ছবি আজিকী ভালেবণে হো নাথ।
তুলসী মস্তক তব্ নোয়ে ধনুক বাণ লেও হাত॥
ভক্তবছল ভগবান্‌কি বেদ বিদিত ইহ গাথ।
মুরলী মুকুট চুরাউকে নাথ ভঁয়ে রঘুনাথ॥"

হে নাথ। আজ কি অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইয়াছেন; কিন্তু ধনুর্ব্বাণ হস্তে ধারণ না করিলে তুলসী মস্তক নত করিবে না। এই কথা শুনিয়া বেদপ্রসিদ্ধ ভক্তবৎসল হরি মুরলী মুকুট লুকাইয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন।

একদিন কাশীতে জনৈক ব্রহ্মহত্যাকারী তুলসীদাসের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ এপাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তুলসীদাস তাঁহার কাতরতায় তাঁহাকে রামনাম জপকরিতে উপদেশ দিলেন। কিছুকাল একাগ্রচিত্তে রামনাম জপকরিবার পর তুলসীদাস যখন বুঝিলেন ব্রাহ্মণের পাপ মুক্ত হইয়াছে তখন তিনি সেই ব্রাহ্মণের সহিত একত্রে আহার করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ ইহাতে তুলসীদাসের প্রতি বিরক্ত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে বলেন যে, রামনামের প্রভাবে ইহার পাপরাশি ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে। আপনারা ইচ্ছা করিলে ইহার পরীক্ষাও করিতে পারেন। তখন পণ্ডিতগণ বলিলেন,—যদি বিশ্বেশ্বরের প্রস্তর নির্ম্মিত বৃষ এই হত্যাকারীর হস্ত হইতে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে তবেই আমরা আপনার কথা বিশ্বাস করিব। তুলসীদাস তাঁহাদিগের কথায় সম্মত হইয়া হত্যাকারীকে সর্ব্বসমক্ষে বিশ্বেশ্বরের বৃষের সম্মুখে খাদ্যদ্রব্য ধরিতে আদেশ করিলেন। কি আশ্চর্য্য। সেই ব্রাহ্মণ ঐ প্রস্তর নির্ম্মিত বৃষের সম্মুখে খাদ্যদ্রব্য ধরিবামাত্র জীবিত বৃষের ন্যায়েই ঐ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়াছিল। এই পরমাশ্চর্য্যকর ঘটনাদৃষ্টে সকলেই অতঃপর তুলসীদাসকে ভগবানের বিশেষ কৃপাপাত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন।

আর একসময়ে জনৈক ব্রাহ্মণকন্যা মৃতপতির সহিত সহমৃতা হইতে যাইতেছিলেন। তিনি পথিমধ্যে তুলসীদাসকে দেখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন। তুলসীদাস কিছুই জানিতেন না, তিনি তাঁহাকে সৌভাগ্যবতী হইয়া

কালযাপন করিতে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন সেই রমণী ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, তুলসীদাস তাঁহার ক্রন্দনের কারণ ক্রমে সমস্তই জ্ঞাত হইলেন। এবং চিন্তিতচিত্তে তাঁহাদিগের সহিত শ্মশান ভূমিতে গমন করিয়া একাগ্রচিত্তে রামনাম জপকরিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে মৃতব্যক্তি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন, এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে সকলেই আনন্দ ও বিস্ময়ে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

তুলসীদাসের যশঃরাশি ক্রমশঃ দিল্লীর বাদশাহের কর্ণগোচর হইলে তিনি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া দিল্লীতে লইয়া গেলেন। বাদশাহ তাঁহাকে কিছু অদ্ভুত কৌশল দেখাইতে অনুরোধ করিলেন। ইহাতে তুলসীদাস বলিলেন যে, তিনি ক্ষুদ্র মানুষ, অলৌকিক কিছু দেখাইবার তাঁহার ক্ষমতা নাই। ইহাতে বাদশাহ নিজকে অপমানিত বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। ঐ সময়ে অসংখ্য বানর ও হনুমান রাজপ্রাসাদে আসিয়া বিষম উৎপাৎ করিতে লাগিল। বাদশাহ ইহাতে চমৎকৃত হইয়া সভাসদগণ ও প্রধান বেগমের অনুরোধে তুলসীদাসকে কারামুক্ত করিয়াদেন।

তুলসীদাসের যে শ্রীরামচন্দ্র বিগ্রহ ছিল তাঁহার গাত্রে কিছু মূল্যবান অলঙ্কার ও পূজারজন্য কিছু স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্র ছিল। কোন চোর তাহা চুরিকরিবার মানসে তাঁহার আশ্রমে প্রবিষ্ট হয়। সে তুলসীদাসকে ধ্যানমগ্ন দেখিয়া যেমন ঐসকল দ্রব্য চুরিকরিবার নিমিত্ত হাতবাড়াইবে অমনি দেখে যে, একজন দিব্যপুরুষ ধনুর্ব্বান হস্তে তাহাকে লক্ষ্যকরিতেছে, তস্কর উহা দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। এইরূপে তস্কর পুনঃ পুনঃ চেষ্টাকরিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিল না তখন সে সাধুর চরণে পড়িয়া সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিল। তুলসীদাস ইহাতে চমৎকৃত হইয়া তাহার ভাগ্যের ভূয়সী প্রসংসা করিয়া সমস্ত মূল্যবানদ্রব্য ঐ তস্কর ও দীন দুঃখিকে দানকরিয়া দিলেন। কিন্তু তখন ঐ অসাধুব্যক্তিরও ঘোর কাটিয়াছে, সে আপন সমস্তদ্রব্য বিতরণ করিয়া তুলসীদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল।

বিগত শ্রাবণ সংখ্যা "ভারতবর্ষে" তুলসীদাস সম্বন্ধে জনৈক লেখক কয়েকটী উপাদেয় সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, এস্থলে তাহার কিছু কিছু উদ্ধৃত হইল।

১৫৮৯ সম্বতে অভুক্ত মূল নক্ষত্রে তুলসীদাস জন্মগ্রহণ করেন। এই নক্ষত্রে জন্মিলে পিতার অনিষ্ট আশঙ্কা থাকে। সুতরাং তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে

শৈশবেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শিশু তুলসীদাস অতঃপর জনৈক সাধুর দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন। এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যালাভ করিয়া তুলসীদাস অদ্বৈতবাদী হইয়াছিলেন এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড শ্রীরামচন্দ্র ময় দেখিতেন। তিনি বলিয়াছেন—

"বিনু সৎসঙ্গ ন হরিকথা তেহিবিনু মোহ ন ভাগ।
মোহ গয়ে বিনু রামপদ হোয় দৃঢ় অনুরাগ ॥ ৮৫ ॥" (উত্তরাকাণ্ড)

সৎসঙ্গ ব্যতীত হরিকথা শোনা যায় না, আর হরিকথা ব্যতীত মোহ দূর হয় না এবং মোহ দূরীভূত না হইলে শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মে দৃঢ় অনুরাগ জন্মে না। শ্রীরামই তাঁহার ব্রহ্ম। তিনি পুনরায় বলিতেছেন—

"জড় চেতন জগজীবকে সকল রাম ময় জানি।
বন্দোঁ সবকে পদকমল সদা যোরি যুগ পাণি। ১০॥" (বালকাণ্ড)

"সিয়ারাম ময়সব যুগ জানি।
করোঁ প্রণাম যোরি যুগ পাণি॥" ঐ

জড় চেতন যাবতীয় বিশ্বজীবকে আমি শ্রীরামচন্দ্র ময় জানি, অতএব যুক্ত করে সদা সকলকেই বন্দনা করি।

নিখিল জগত সীতারাম ময় জানি। করজোড়ে তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি।

"ধ্যান ন পাবহিঁ জাসু মুনি নেতি নেতি কহ বেদ।
কৃপাসিন্ধু সোই কপিন্ সো করত অনেক বিনোদ ॥ ৭৩ ॥" (লঙ্কাকাণ্ড)

যাঁহাকে মুনিগণ ধ্যানে জানিতে পারেন না, যাঁহার বিষয়ে বেদের উক্তি ইহা না ইহা না, সেই কৃপাসিন্ধু শ্রীরামচন্দ্র কপিগণ সহ কত আনন্দই করিতেছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শিশু তুলসীদাসকে তাঁহার মাতাপিতা ত্যাগ করিলে জনৈক সাধু শিশুকে আশ্রয় দেন, কিছুকাল পরে সাধুই তাঁহাকে তাহার পিতামাতার হস্তে প্রত্যর্পণ করেন। যথাকালে তুলসীদাস দার পরিগ্রহ করেন। স্ত্রীর নাম রত্নাবলী, রত্নাবলী রূপে গুণে অসামান্যা—অধিকন্তু রাম ভক্ত তুলসীদাসের পত্নীপ্রেমের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি স্ত্রীকে শ্বশুরালয় হইতে আনিতে যাইলে রত্নাবলী তাঁহাকে যাহা বলিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা মূল হিন্দি হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

"লাজ না লাগত আপুকি দৌড়ে আয় হো সাথ।
ধিক্ ধিক্ এয়সে প্রেমকো, ক্যা কহুঁ ময় নাথ॥
অস্থি চর্ম্মময় দেহ মম, তাকাঁর যেয়সী প্রীত।
তৈসি যো শ্রীরাম মহঁ, হোতনা তো ভবভীত॥"

তুমি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া আসিলে, প্রিয়তম? তোমায় লজ্জা বোধ হইতেছেনা? কি আর বলিব নাথ! ধিক—শতধিক এমন প্রেমকে। অস্থিচর্ম্মময় আমার এই দেহের উপর তোমার যত প্রেম শ্রীরামচন্দ্রের উপর তোমার তত প্রেম থাকিলে ভব ভয় থাকিত না।

যে জ্ঞান-বহ্নি সংসার ভস্মে এতদিন আচ্ছাদিত ছিল, পত্নীর সুস্নিগ্ধ বচন সমীরণ পাইয়া তাহা ধিকি ধিকি জ্বলিয়া উঠিল। তুলসীদাস তথা হইতে একেবারে কাশীধামে গিয়া—

"বিনতী কর বিশ্বেশ্বর পাহী।
রাম ভক্তি দিউজ মোহি কাঁহী॥

প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "হে বিশ্বেশ্বর! তোমার চরণে আমার এই প্রার্থনা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি আমার ভক্তি হউক। হে প্রভো! নিয়ত মুমূর্ষু জীবের কর্ণ-বিবরে তারকব্রহ্ম যে রাম নাম ঢালিয়া দিয়া তাহার মুক্তি বিধান করিয়া থাক। হে বিশ্বেশ্বর! সেই তারক ব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি আমার ভক্তি জন্মাইয়া দাও। আরাধনায় বিশ্বেশ্বর প্রসন্ন হইলেন। প্রসন্ন হইয়া তিনি তুলসীদাসকে বলিলেন "হরিভক্ত হরের বড় প্রিয়। ভোলা যে নামে ভুলিয়া আছে, তুমিও সেই নামের ভিক্ষুক। বল তুলসীদাস, তুমি কখনও কাশী ত্যাগ করিবে না?" তুলসীদাস বলিলেন হে কাশীনাথ! হে দয়াময় দীনবন্ধো শিবশম্ভো! দয়া করিয়া তুমি যাহাকে তোমার পুণ্য পবিত্র কাশীধামে স্থান দাও, সেই ভাগ্যবানই কাশীতে বাস করিতে পারে। আমার কাশীবাস করা, সেও দয়াময়, তোমারই দয়ায় উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে তোমার দয়া অসীম এখন আমার ভাগ্য। কাশীনাথ তুলসীদাসের ভক্তিতে বড়ই প্রীত হইলেন।

পরম ভক্ত হনুমানের কৃপায় তুলসীদাসের মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছিল ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

একদিন তুলসীদাস চিত্রকূটের ঘাটে স্নান করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দুইটী সুন্দর কুমার সেখানে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—

"কাহুও দেউ চন্দন মোঁহি বাবা।
তুলসীদাস তব সহজহি পাবা॥
চন্দন দেহুঁ চরচি অঙ্গ মাহী।
রাম লক্ষ্মণ তুম্ হোকী নাহি॥"

"বাবা, আমাদের চন্দন মাখাইয়া দাও; তুলসী দাস বলিলেন—"বাবা, তোমাদের অঙ্গে চন্দন মাখাইয়া দিতেছি, আগে বল, তোমরা রামলক্ষ্মণ দুইটী ভাই কি না।"—শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—

"বালক কহে সাধু জগজেতে।
রাম লক্ষ্মণকী মুরতি তেতে॥"

জগতের সাধুজন এই যুগল মূর্ত্তিকে রাম লক্ষ্মণের মূর্ত্তি বলিয়া থাকেন। ধন্য, তুলসীদাস মহারাজ, ধন্য! তোমার ঐ এক কথা—রাম লক্ষ্মণ তুম্ হোকী নাহি"—এবং তদুত্তরে বালকের উক্তি "রাম লক্ষ্মণকী মুরতি তেতে।" শ্রুতির নেতি নেতি বাক্যে মধুর মিলন ঘটাইয়া দিল; অবাঙ্মনস গোচর অব্যক্ত ব্রহ্মকে জগতের সমক্ষে ব্যক্ত, প্রকটিত করিয়া দিল, অন্ধ, অভক্ত, অবিশ্বাসী জনের চক্ষুরুন্মীলিত করিয়া দিল। বলিহারি ভক্তি, বলিহারি ভক্ত কর্ত্তৃক ভগবানের পরীক্ষা, বলিহারী ভক্তের নিকট ভগবানের আত্ম পরিচয় প্রদান ও ভক্তের আত্মসমর্পণ।—

দর্শন পাইয়া তুলসীদাসী যে দোঁহা গাহিয়া গিয়াছেন, আজও তাহা প্রতি হিন্দুস্থানী নরনারী—প্রতি হিন্দুস্থানীর পোষা তোতা পাখীর কলকণ্ঠ হইতে উদ্গীত হইতেছে—যাবৎ জগতে রাম ভক্ত হিন্দুস্থানী নরনারী থাকিবে তাবৎ সেই অমৃত গাথা তাহাদের মুখ হইতে মুখরিত হইতে থাকিবে।

"চিত্রকুটকে ঘাটমে ভঁই সাধুনকী ভীর।
তুলসীদাস চন্দন ঘিসে তিলক করে রঘুবীর॥

চিত্রকুটের ঘাটে সাধু সমাগম হইল। তুলসীদাস চন্দন ঘষিলেন, আর রঘুবীরকে তিলক দিলেন। তারপর একদিন—

"রথ সওয়ার প্রভু চারিহুঁ ভাই।
করত পবন মৃত পদ সেবকাই॥
তুলসীদাস তব আরতি সাজা।
লখয়ে নয়ন ভরি রঘুকুল রাজা॥"

"দৈ পরদক্ষিণ বিহ্বল ভয়উ।
রঘুপতি পদ-পঙ্কজ শির ধরউ॥
রহি বিধি প্রগট দরশ তব পায়োঁ।
আওরণকো নাহি ভেদ সে সবয়ো॥"

প্রভুরা চারিভাই রথে বসিয়া আছেন। হনুমান পদসেবা করিতেছেন। তুলসীদাস আরতি সাজাইয়া রঘুকুল রাজাকে নয়ন ভরিয়া দর্শন করিলেন। ভক্তি বিহ্বল চিত্তে প্রদক্ষিণ করিয়া রঘুপতির পদ-পঙ্কজে মস্তক নত করিলেন। এই প্রকারে তুলসীদাস প্রকট দর্শন পাইলেন। অপর কেহ তাহা পান নাই।

যাঁহাকে পাইলে আর কিছু প্রাপ্য বা অপ্রাপ্য থাকে না, আজ তাঁহাকে পাইয়া তুলসীদাস সংসার ছাড়িলেন, সন্ন্যাসী হইলেন, রামনামে ডুবিলেন।

সন্ন্যাসী হইবার পর তিনি তাঁহার পত্নীর একখানি পত্র পাইয়াছিলেন; পত্নী লিখিয়াছিলেন—

"কটিকী খীনী কনকনী রহত সখীন সঙ্গ কোই।
মোহি ফাটে কি ডর নহিঁ অনত তটে ডর হোই॥"

সখীগণ সহ কনকবরণী, ক্ষীণকটি আমি বাস করিতেছি। আমার বুকফাটে ফাটুক তাহাতে ভয় নাই; কিন্তু ভয় হয় পাছে তুমি অন্য রমণীর প্রেমে পড়।

তুলসীদাস উত্তর দিলেন —

"কটে এক রঘুনাথ সঙ্গে বন্ধিজটা শির কেশ।
হমত চাখা প্রেমরস, পত্নীকে উপদেশ॥

মাথায় জটা বাঁধিয়া একমাত্র রঘুনাথের সঙ্গেই আমি দিন কাটাইতেছি। পত্নীর উপদেশে আমি প্রেমরসের আস্বাদন পাইয়াছি।

পত্রপাইয়া পত্নী আশ্বস্ত হইলেন এবং প্রাণ ভরিয়া উদ্দেশে পতির চরণ বন্দনা করিলেন। সন্ন্যাসী হইবার পর পত্নীর নিকট পতির এই প্রথম পরীক্ষা।

তারপর বহু বর্ষ কাটিয়া গেল। তুলসীদাস এখন বৃদ্ধ। তাঁহার জীবন এখন সমস্তই রাম ময়। পিতা মাতা, জায়া, গৃহ, ধন, সম্পত্তি সমস্তই এখন মন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। অন্তরে বাহিরে মনে মুখে কেবল রাম। তিনি যেখানেই যান আর যেখানেই অবস্থান করেন রাম তাঁহার অগ্রে, রাম তাঁহার পশ্চাতে, রাম তাঁহার পার্শ্বে, রাম তাঁহার সঙ্গে, রাম তাঁহার ঊর্দ্ধে, রাম তাঁহার অধে।

নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া একদিন দৈবাৎ তুলসীদাস আপনার শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বহুকাল পূর্ব্বে বিরহ কাতর তরুণ তুলসীদাস যেখানে আসিয়া পত্নীর উপদেশে প্রেমরসের আস্বাদন পাইয়াছিলেন, তপস্বী তুলসীদাস দৈবাৎ আজ সেই শ্বশুরালয়ে পুনরাগত। রত্নাবলী এখন বৃদ্ধা। তিনি এখন তাঁহার পিতৃভবনেই বাস করিতেছেন। পতি ও পত্নী কেহ কাহাকেও চিনিতে পারিতেছেন না। রত্নাবলী অতিথি সৎকার করিতেছেন। অতিথি বৈষ্ণব—স্বহস্তে রাঁধিবেন। রাঁধিবার দ্রব্যাদি রত্নাবলী আয়োজন করিয়া দিলেন; দুই এক কথার পর রত্নাবলী তুলসীদাসকে, চিনিতে পারিলেন বুঝিলেন এই অতিথিই তাঁহার ইহকাল ও পরকালের পরম আরাধ্য দেব। রত্নাবলী ধৈর্য্য ধরিলেন, আত্মগোপন করিয়া পতির পরীক্ষা আরম্ভ করিয়া দিলেন। রত্নাবলী বলিলেন, মরিচ আনিয়া দিব কি? তুলসীদাস—না, থাক, আমার ঝুলিতেই আছে।

র—একটু ঘাস আনিয়া দিব কি?

তু—না, তাহাও আমার ঝুলিতে আছে।

র—একটু কর্পূর দেই?

তু—না, তাহাও আমার ঝুলিতে আছে।

পরে রত্নাবলী অতিথির চরণ সেবা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অতিথি নিষেধ করিলেন, রত্নাবলী ক্ষুণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্র—আপনি কি আমায় চিনিতে পারিতেছেন না?

উ—না।

প্র—আপনি এখন কাহার বাড়ীতে আছেন বলিতে পারেন কি?

উ—না।

প্র—এই স্থানের নাম কি জানেন?

উ—না।

রত্নাবলী দেখিলেন পূর্ব্বের কোন কথাই স্বামীর এখন মনে হইতেছে না। তখন তিনি সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন, এবং স্বামী-সেবা প্রার্থনা করিলেন। পত্নীর নিকট তুলসীদাসের এই দ্বিতীয়বার পরীক্ষা। তিনি সঙ্কটে পড়িলেন। ভাবিলেন, রাম-সঙ্গ ছাড়িয়া পত্নী-সঙ্গ ধরিবেন, না পত্নী-সঙ্গ ছাড়িয়া রাম-সঙ্গ লইয়াই থাকিবেন। এক সঙ্গে পরস্পর বিরুদ্ধ দুই সঙ্গ ধরিয়া থাকা অসম্ভব।

"যাঁহা রাম তাঁহা নহি কাম, যাঁহা কাম তাঁহা নহি রাম।
রবি রজনী দোনো নহি বৈসে এক ঠাম ॥"

যেখানে রাম সেখানে কাম থা'কতে পারে না ; আর যেখানে কাম সেখানেও রাম থাকিতে পারে না। যেমন রবি ও রজনী দু'জনে কখনই একসঙ্গে বাস করিতে পারে না।

তুলসীদাস অবিলম্বে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন—পত্নীর প্রার্থনায় অসম্মতি জানাইলেন।—পত্নী হৃদয়ে ব্যথা পাইয়া বলিল—যখন তোমার ঝুলিতে থরী হইতে কর্পূর পর্য্যন্ত নানা দ্রব্য স্থান পাইল, তখন প্রিয়তম ! তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করা উচিত হইতেছেনা। হয় আমাকে তোমার ঝুলির মধ্যে একটু স্থান দাও, নয় সর্ব্বত্যাগী হইয়া ভগবানে অচল অনুরাগী হও।

একি ? এযে এক নূতন আলোকে তুলসীদাসের হৃদয় ভরিয়া উঠিল। যাহার মায়া ত্যাগ হয় নাই তাহার চিত্ত কিরূপে রামময় হইল। পত্নীর নিকট তিনি দ্বিতীয় বার চৈতন্য লাভ করিলেন, বলিলেন রত্নাবলী, তুমি উচ্চে, আমি নিম্নে, তুমি যেখানে গিয়াছ আমি আজিও তথায় পৌঁছিতে পারি নাই।

তাহার পর আসক্তির সেই শেষ চিহ্ন ঝোলাটী জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়া তুলসীদাস রাম নাম করিতে করিতে সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন।

কিছুদিন পর অর্থাৎ—

"সম্বত ষোলহ শায় অশী, অসিবরনাকে তীর।
শ্রাবণ শুক্লা সপ্তমী, তুলসী ত্যজয়ো শরীর ॥"

১৬৮০ সম্বতে শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষে সপ্তমী তিথিতে কাশীধামে অসিতীরে তুলসী তনু ত্যাগ করেন।

সিভিলিয়ান গ্রিয়ারসন সাহেব ইণ্ডিয়ান এ্যাণ্টিকোয়ারিতে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্যের সমাবেশ করিয়াছেন। নিম্নে আমরা তাহা পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

তুলসীদাসের জন্ম তারিখ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। অনেক আলোচনায় ১৫৩২ খৃষ্টাব্দই তাঁহার জন্ম বৎসর বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। তাঁহার জন্মভূমি সম্বন্ধেও মত ভেদ আছে। হস্তিনাপুর, গাজিপুর বা রাজাপুর গ্রাম তাঁহার জন্মভূমি বলিয়া অনেকে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তারি প্রামই তাঁহার প্রকৃত জন্মভূমি। আত্মারাম শুক্লা দোবে তাঁহার পিতা এবং মাতার নাম হুলসী. তাঁহারা সন্তানের নাম 'রামবোলা' রাখেন। তাঁহার বংশসম্বন্ধেও

গোলযোগ দৃষ্ট হয়। কেহ তাঁহাকে কাণ্যকুব্জ বংশজ এবং অপরে তাঁহাকে সরায়ুপারিন্ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে বলিয়াছেন "আমি দোবে বংশজ পরাশর গোত্রসম্ভূত।"

গ্রিয়ারসন্ সাহেবও তাঁহার নক্ষত্র দোষ জনিত বাল্যে পিতামাতা কর্ত্তৃক পরিত্যাগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সাধু তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন এবং বিষ্ণুপাদপদ্মে উৎসর্গীকৃত তুলসীপত্র খাওয়াইয়া তাঁহাকে পবিত্র করিয়া লইয়া ছিলেন বলিয়া তুলসীদাস নাম রাখিয়া ছিলেন। এই সাধু সংসর্গেই তুলসীদাস অদ্বিতীয় রামভক্ত হইতে পারিয়াছিলেন।

তুলসীদাসের শ্বশুর দীনবন্ধু শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন এবং তাঁহার সংসর্গ হইতেই তাঁহার দুহিতা রত্নাবলীও ভক্তিলাভ করিয়াছিলেন, তুলসী দাসের একটী পুত্র হইয়াছিল তাহার নাম তারক।

পত্নীরবাক্যে গৃহত্যাগ করিয়া তিনি প্রথমে অযোধ্যায় পরে বারাণসীতে বাস করেন। অযোধ্যায় তিনি স্মার্ত্ত বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, সময়ে সময়ে তিনি শঙ্করের উপাসনা করিতেন এবং শঙ্করাচার্য্যের নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ প্রচারের প্রতি তাঁহার খুব আসক্তি ছল। কিন্তু একদিন স্বপ্নে শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ পাইয়া তিনি ভাষায় রামায়ণ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। অরণ্যকাণ্ড সমাপ্ত হইবার পর বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের সহিত তাঁহার আহারাদির আচার ব্যবহার সম্বন্ধে মতান্তর হইলে তিনি অযোধ্যা ছাড়িয়া বারাণসীতে গিয়া বাস করেন এবং সেখানেই রামায়ণ শেষ করেন। কিন্তু ইহার রচনা কাল এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে—

"সম্বৎসোলহসৌইকতৈসন।
করৌ-কথা হরিপদধরি সীসা॥
নমি ভৌমবার মধু মাসা।
অবধ পুরয়হ চরিত প্রকাশা॥

অর্থাৎ ১৬৩১ সংবতে চৈত্রমাসে মঙ্গলবার নবমী তিথিতে হরিপদ ধ্যান করিয়া অযোধ্যায় বসিয়া এই রামচরিত শেষ করিলাম। তুলসীদাসের দোঁহাবলী গৃহী ও সাধকের কণ্ঠহার স্বরূপ। আমরা তাঁহার কয়েকটী দোঁহা পাঠকগণকে উপহার দিয়া এই পরম মধুময় ভক্ত জীবনীর আলোচনার উপসংহার করিব।

(১)

"রাম্ রাম্ সব্ কোই কহে, ঠক্ ঠাকুর ক্যা চোর।
বিনা প্রেম্‌সে রীঝ্‌ৎ নহি, তুলসী নন্দকিশোর॥"

হে তুলসী দাস। কি শিষ্ট আর কি অশিষ্ট সকলেই রামনাম উচ্চারণ করিয়া থাকে সত্য; কিন্তু তাহাতে তাহাদের তাদৃশ ফল লাভ হয় না, কারণ ভক্তি ও প্রেম ভিন্ন নন্দকিশোর প্রসন্ন হন না।

(২)

"এক রাহমে দোতে হৈঁয়, তুলসী মূত আউর পূত।
রাম ভজে তো পুতহিঁ, নহেতো মূতকামুত॥"

হে তুলসীদাস। মূত্র ও পুত্র একরাস্তাতেই বহির্গত হয়, যে ভগবান রামচন্দ্রের ভজনা করে সেই পুত্র, নতুবা অধার্ম্মিক পুত্র মূত্র হইতেও নিকৃষ্ট।

(৩)

"তুলসী জগৎ মে আইয়ে, সব্‌সে মিলিয়া ধায়।
না জানে কোন্‌' ভেক্‌সে নারায়ণ মিল্‌ যায়॥"

হে তুলসী, জগতে আসিয়া সকলের সহিত মিলিত হইয়া চলিতে হইবে, কারণ বলিতে পারা যায়না যে, নারায়ণ কোন ভেকে অর্থাৎ কোনরূপে তাঁহাকে দর্শন দিবেন।

"দিন্‌কা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী
পলক্‌ পলক্‌ লহু চোষে।
দুনিয়া সব বাউরা হোকে,
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে॥

দিনে মোহিনী ও রাত্রে বাঘিনীর মত হইয়া যাহারা পলকে পলকে রক্ত চুষিয়া খায়, জগতের লোক সকল পাগল হইয়া ঘর ঘর সেই সকল বাঘিনী পুষিতেছে।

শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ

(৫)

ক্রোধ—কাম রিপুর ন্যায় ক্রোধও জীবের ভয়ানক অনিষ্টকারী রিপু। তবে কামও যেমন জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির হৃদয়ে থাকিয়া নিজ বিক্রম প্রকাশ করিতে পারেনা অর্থাৎ জীবকে তাহার ইচ্ছানুসারে চালাইতে পারেনা, পরন্তু সেই ব্যক্তির ইচ্ছানুসারেই চালিত হয়। ক্রোধও সেইরূপ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির নিকট আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাকে। প্রয়োজন হইলে সেই ব্যক্তির ইচ্ছানুসারেই নিজ বিক্রম প্রকাশ করে। পুরাণাদি আলোচনায় বহুস্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঋষিগণ অভিসম্পাত দ্বারা অনেক সময় ক্রোধ প্রকাশ করিতেন। পরন্তু সে যে ক্রোধের বশীভূত হইয়া করিতেন এমন বলা যায় না। দুষ্ট-দমন জন্য, পাপীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান জন্যই তাঁহারা ক্রোধকে আশ্রয় করিয়া অভিসম্পাতাদি প্রদান করিতেন। কামনার বিরোধী বিষয়কে যেমন কামুক পরিহার করে, ক্রোধও সেইরূপ ভক্তের সঙ্গ পাইলে ভক্তের কামনার বস্তু ভগবত্তত্ত্বের প্রতিকূল ভাবসকল নষ্ট করিয়া ভক্তের পরমোপকারই সাধন করে। ক্রোধ অজ্ঞানীর নিকট যেমন হিতাহিত জ্ঞানের বিলোপক বলিয়া মনেহয়, জ্ঞানীর নিকট সেই ক্রোধই বৈরাগ্য নামে অভীহিত হইয়া হিতাহিত জ্ঞান বিস্তার পূর্ব্বক সাধ্যবস্তু শ্রীভগবানকে বিশেষ রূপে আকৃষ্ট করিয়া রাখে। অতএব বুঝিয়া চলিতে পারিলে যাহা বিশেষ অনিষ্টকর তাহাই হিতকর হয়। যে বিষ প্রাণ নাশ করিতে পারে, সেই বিষই অবস্থা বিশেষে যথাবিধি প্রয়োগ করিতে পারিলে জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। যাহা হউক এখন এই ক্রোধের উৎপত্তির কারণ বলা যাইতেছে।

শাস্ত্রকারগণ বলেন—"রজোগুণাৎ ভবেৎ ক্রোধঃ।" অর্থাৎ রজোগুণোদ্ভূত অভিমান হইতেই ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ক্রোধের বশীভূত হইয়া জীব ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা ভুলিয়া গিয়া এক এক সময় এমন কার্য্য করিয়া ফেলে যে, পরিণামে তাহার জন্য ঘোরতর অনুতাপ করিতে হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—

> "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
> সঙ্গাৎসংজায়তে কাম কামাৎক্রোধোঽভিজায়তে॥ (গীতা ২। ৬২)

অর্থাৎ বিষয়ের ভাবনা করিতে করিতে পুরুষের তাহাতে যে অনুরাগ জন্মে সেই অনুরাগ হইতেই কামনা এবং সেই কামনা হইতেই ক্রোধ জন্মায়। আমি শ্রেষ্ঠ, আমি ধনী বা আমি বলবান সুতরাং আমি যাহা চাই তাহাই হউক এই ভাবে প্রথমে অভিমান বৃদ্ধি পাইতে থাকে কিন্তু কোন কারণে ঐ অভিমানের বিপর্য্যয় ঘটিলেই ক্রোধের উদয় হয়। এ বিষয়ের প্রত্যক্ষতা আমরা সচরাচর প্রায়ই দেখিতে পাই। ক্রোধের উৎপত্তির বিষয় আর বাহুল্য না করিয়া কি ভাবে উহাকে জয় করা যায় এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাউক। তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ ক্রোধ-জয়ের উপায় বলিয়াছেন—

"সুখদুঃখাদিকং সর্ব্বং আত্মনঃ কর্ম্মনির্বাহ।
জায়তে চেতি সংচিন্ত্য তং ক্রোধং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥"

অর্থাৎ ক্রোধ হইতে বহু অনিষ্ট হয়। ক্রোধ হইতেই পাপ ও নানাবিধ বিপদ উপস্থিত হয় এই ভাবিয়া এবং সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ, সম্পদ বিপদ প্রভৃতির দাতা অন্য কেহই নহে, জীব আপন আপন কর্ম্মফলেই ঐ সকল ভোগ করিয়া থাকে এই ভাবিয়া কেহ কটু বলিলে বা অনিষ্ট সাধন করিলে উহা স্বকৃত কার্য্যেরফলই হইল মনে করিয়া উহাতে উপেক্ষা করিতে পারিলে সহজেই বলবান ক্রোধরিপু পরাজিত হয়।

ক্রোধের সময় হিতাহিত জ্ঞান থাকেনা সত্য কিন্তু যদি সেই সময় কোনও প্রকারে অতি অল্প সময়ও স্থিরভাবে কোন বিষয় ভাবনা করিতে পারা যায়, অথবা ক্রোধের সময় নিজ মূর্ত্তি কিরূপ বিকৃত হইয়াছে তাহা যদি দর্পণে দেখা যায়, বিজ্ঞব্যক্তিগণ বলেন তাহা হইলে ক্রোধ দমন হইতে পারে।

কেহ কেহ ক্রোধকে চণ্ডাল বলিয়া থাকেন। যথার্থই ক্রোধ চণ্ডাল। কিন্তু খুব অল্প সময়ও যদি ক্রোধী ব্যক্তি চিন্তা করিতে পারে যে, আমার উপর একটা দুর্দ্দান্ত রিপু নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছে, তাহা হইলে আর তাহার ক্রোধ থাকিতে পারেনা। মোটকথা একেবারে একদিনে কিছু না হইলেও ক্রমে ক্রমে চেষ্টাদ্বারা সকলই সাধিত হইতে পারে। একবার দেশ ভ্রমণ উপলক্ষে চক্রধরপুরে গিয়াছিলাম, সেখানে একজন প্রবীন চিকিৎসককে বলিতে শুনিয়া ছিলাম যে, ক্রোধ হইলে যে কোনও প্রকারের অঙ্গ চালনা বা কিঞ্চিৎ শীতল জল পান করিলে ক্রোধ প্রসমিত হয়।

লোভ—"লোভে পাপ পাপে মৃত্যু" এই প্রবাদটী অতিসত্য।

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, লোভীব্যক্তি নানাবিধ ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলেন—

"বিষয়েন্দ্রিয়নিত্যত্ব জ্ঞানাৎ লোভঃ প্রজায়তে।
রিপুনাং কারণং লোভঃ শরীরস্থো মহান্ রিপুঃ ॥

অর্থাৎ—বিষয় ও ইন্দ্রিয় এই দুইটীই নিত্য এই জ্ঞানের দ্বারাই প্রধানতঃ লোভোৎপত্তি হয়। লোভের বশীভূত হইয়া জীব নিষিদ্ধ কর্ম্ম, নিন্দনীয় ও দুঃখপ্রদ আহার বিহারাদি করিয়া থাকে তাই শাস্ত্রকার লোভকে মহানশত্রু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণতঃ অজ্ঞ জীবকেই লোভে বেশী অভিভূত হইতে দেখাযায়।

শাস্ত্রকারগণ যে সকল দ্রব্য আহারে বিশেষ রূপে নিষেধ করিয়াছেন লোভের বশীভূত হইয়া তাহা আহার করিলে নানাবিধ পীড়া জন্মায়, যদিও রোগ যন্ত্রনায় তখন অনুতাপ আসে কিন্তু অবিবেকতা হেতু সে অনুতাপ ততটা কার্য্যকরী হয় না। পণ্ডিতগণ বলেন—

"বস্তুতত্ত্ববিবেকেন চিত্তশুচি চিন্তয়া।
লোভাৎপাপং ততোমৃত্যুং জ্ঞাত্বালোভং বিনির্জ্জয়েৎ ॥"

অর্থাৎ বস্তুর নিত্যতা ও অনিত্যতা এবং শুচি ও অশুচি ভাব চিন্তা এবং চিত্তের নির্ম্মলতা রক্ষা করিবার জন্য যত্নবান হওয়া এবং লোভ হইতেই অধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম হইতেই নানাবিধ রোগ এমনকি মৃত্যু পর্য্যন্ত হয় এই সকল বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া কার্য্য করিলে সহজেই লোভ দমন হয়।

এই লোভ একদিকে যেমন অনর্থকারী, ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে উহাই ভাবান্তরিত হইয়া নামে-রুচি ও সাধুসঙ্গ-লিপ্সা নামে অভিহিত হয়। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়াদি দ্বারা পূর্ব্বে যেরূপ রসনার তৃপ্ত সাধিতে যত্নবান হইত ভক্ত ভাবের উদয় হইলে ভগবন্নাম গ্রহণে ও ভক্তসঙ্গ লাভে ততোধিক প্রীতি আইসে, ভক্ত দিবারাত্রি রসনাদ্বারা শ্রীনাম ও মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিয়া পরমানন্দে অমৃত রস আস্বাদন করে। এদিকে যেমন লোভ হইতে অন্যান্য নানাবিধ বিঘ্ন হয়, ভক্ত হৃদয়ে সেই লোভই ভাবান্তরিত হইয়া নামে রুচি ও ভক্তসঙ্গ লাভে আসক্তি জন্মাইয়া সর্ব্ব প্রকার সাত্ত্বিক ভাবের উদয় করাইয়া থাকে।

মোহ—মোহ অজ্ঞানের স্বরূপ বলিয়া পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। "অজ্ঞানাৎ মমতাভ্যাসাৎ মোহঃ সংজায়তে হৃদি।" তমোগুণান্বিত আহার বিহারাদির দ্বারাই মোহের উৎপত্তি হয়। আমার বাড়ী, আমার ধন জন, আমার পুত্র কন্যা

ইত্যাকার আমার আমার ভাবের দৃঢ়তাই মোহের পরিচায়ক। মোহমুগ্ধ জীব হিতাহিত জ্ঞান রহিত হইয়া দেহাদির পরিবর্ত্তন এবং আমার বলিয়া যাহাকে অতিশয় ভালবাসা যায় তাহার স্নেহশূন্যতা দেখিয়াও মনকে সেই আসক্তি হইতে ফিরাইতে পারে না। ক্ষণকালের জন্যও সাধুসঙ্গে বা ধর্ম্মালোচনায় যোগ দিতে পারে না। যদিও কখন কোন বন্ধু সাধু সঙ্গাদির কথা বলে তবে এমন ভাবে উত্তর করে যে, তাহা শুনিলে হাসি পায়। সমস্ত দিনরাত্রি বৃথা আমার আমার করিয়া ছুটাছুটি করে কিন্তু এক মুহূর্ত্ত সাধুসঙ্গ বা ভগবদ্বিষয় আলোচনার জন্য বলিলে অমনি বলিয়া বসে "মহাশয়! বলেন তো কখন যাই, সময় কৈ?" মুগ্ধ জীব বোঝে না যে, এভাবে তার জীবন কাটিবে না, বা সময় নাই বলিলে যম দূত কখনও ছাড়িবে না। তাই সাধু মহাত্মাগণ জীবের প্রতি করুণা করিয়া বলিয়াছেন। "বস্তুতত্ত্ব বিবেকেন সংজয়েৎ মোহমাত্মবান্॥" অর্থাৎ একমাত্র ভগবান্ ভিন্ন আর সকলই অনিত্য এইভাব দৃঢ় হইলে ক্রমে চিত্ত সত্যগুণ প্রধান্ হয়। চিত্ত সত্ত্বগুণ প্রধান হইলে মোহ দূর হয়। আমার বলিতে কিছুই নাই, সকলই সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরম করুণাময় পরমেশ্বরের দয়া, এইরূপ চিন্তা মোহকে জয় করিয়া দেয়।

মোহ মুক্ত হইলে বাহিরের অনেক ব্যাপার মোহমুগ্ধ ব্যক্তির ন্যায় হইলেও কিন্তু ভাবের তারতম্য হয়। যেমন মোহমুগ্ধ ব্যক্তি আমার গৃহ, আমার পুত্র কলত্রাদি ইত্যাকারভাবে অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া কখন সাধুসঙ্গ করিব, কখন ভগবদ্ভজন করিব, সময় নাই ইত্যাদি বলে; মোহমুক্ত ভক্তও সেইরূপ শ্রীভগবানের সেবা একান্ত নিষ্ঠা সহকারে করিয়া থাকে। যদি কেহ কখনও পার্থিব বিষয়ালোচনার নিমিত্ত ডাকে, তবে ভগবৎ সেবা পরায়ণ ভক্ত বলিয়া থাকে "কখন যাইব সময় নাই" উভয়েই সময় নাই বলে কিন্তু পার্থক্য অনেক। একজন বিষয়কূপে ডুবিয়া সময় পায় না আর একজন ভগবৎ সেবায় মসগুল হইয়া অষ্টপ্রহর তাঁহারই ভাবের আলোচনায় মগ্ন থাকিয়া বলেন সময় নাই। ভগবৎ সেবায় বিমুগ্ধ হওয়াও মোহ বটে কিন্তু বিষয় মোহের ন্যায় দুঃখদ নহে। পরমানন্দপ্রদ ও পরিণামবিরস দুঃখজনক অজ্ঞতার বিনাশক। তাই ভক্ত বলিয়াছেন—

"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বা মনুস্মরত স্বামিন্হৃদয়ান্মাপ সর্পতু॥"

অর্থাৎ—বিষয়ী ব্যক্তি যেমন বিষয়ে মুগ্ধ, হে প্রভু! আমি যেন সেইরূপ তোমার কার্য্যে, তোমার সেবায় বিমুগ্ধ হইতে পারি।

মদ—মদ বলিতে অহঙ্কার বুঝায়। এই অহঙ্কার যে পরম শত্রু তাহা বোধ হয় আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে না।

"রজস্তমোভ্যামাক্ষিপ্তো জনোমত্তোভবেৎসদা।
অহংমহাত্মা ধনবান মত্তুল্যঃ কোঽস্তিভূতলে।
ইতিযজ্জায়তে চিত্তং মদঃ প্রোক্তঃ স কোবিদৈঃ॥"

রজোগুণ মিশ্রিত তমোগুণের আধিক্যবশতঃ তমোগুণপ্রধান আহার বিহারে মদের উৎপত্তি হয়। মদ বলিতে যে অহঙ্কার বুঝায় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আমি মহাত্মা, আমি ধনবান, আমার ন্যায় আর কে আছে, এই প্রকার চিত্তবৃত্তিই মদের পরিচায়ক। অহঙ্কারী জীব পাপী হইতেও নিকৃষ্ট, কারণ পাপীর প্রতি দয়ালু ভক্তগণ কৃপা করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের কৃপায় পাপীর পাপ দূর হয়। কিন্তু মদগর্ব্বী ব্যক্তি আপনা অপেক্ষা অন্যকে ছোট মনে করে বলিয়া কাহারও সঙ্গ করে না। সুতরাং চিরকাল দুঃখ পায়।

দুঃখাদি ইচ্ছা না থাকিলেও আসিতেছে ও যাইতেছে। আজ যে অতুল ধনের অধিকারী, কালের গতিতে দুই দিন পরেই সে নির্ধন হইতেছে। দেহেন্দ্রিয়াদির প্রতি পলে পলে পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। সুতরাং জীবের কোন বিষয়েই ক্ষমতা নাই এই সকল বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি অহঙ্কারকে জয় করিবে। মদ বলিতে অহঙ্কার এবং এই অহঙ্কার যে পরম শত্রু তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ভগবৎ কৃপা প্রভাবে অহঙ্কারও অন্য রূপ ধারণ করে। আমি ধনী, আমি পণ্ডিত, আমি মহাত্মা ইত্যাদি ভাব না আসিয়া "আমি ভগবানের দাস, আমি শ্রীহরির সখা, আমার কৃষ্ণ ইত্যাদি সাত্ত্বিক অভিমানের উদয় হয়। ঐরূপ ভাবের নিষ্ঠায় ভক্ত মহা বলবানের ন্যায় বলিয়া থাকেন "রে কামাদি রিপুগণ আমার প্রতি তোদের অধিকার নাই, আমি কৃষ্ণদাস।" এই যে অহঙ্কার ইহা বন্ধনের কারণ হয় না এ অহঙ্কার সকল বিঘ্ন বিপত্তি বিনাশ করিয়া দেয়।

মাৎসর্য্য—পরের উন্নতি ও সুখে ঈর্ষাভাবই মাৎসর্য্যের লক্ষণ। এই মাৎসর্য্য রজোগুণমিশ্রিত তমোগুণের কার্য্য। অসৎসঙ্গ হইতে অজ্ঞানের আধিক্য এবং তাহাতেই মাৎসর্য্যের উৎপত্তি হয়। যথা—

"পরোৎকর্ষে দুঃখভাবঃ মাৎসর্য্যং পরিকীর্ত্তিতং।
দুঃসঙ্গাৎজায়তে তত্তু তৎসারজসান্বিতাৎ॥"

মাৎসর্য্য জীবের চিত্তকে সর্ব্বদা ব্যথিত করে। মাৎসর্য্যবানব্যক্তি প্রায়ই কপট ও কুটিল প্রকৃতির হয়। মাৎসর্য্যকে জয় করিতে হইলে শুভাশুভ কর্ম্মফলদাতা শ্রীহরির কৃপা চাই। জীব সুখদুঃখভোগ করে আপনাপন কৃতকর্ম্মের ফলে। কেহ যে কাহাকেও সুখী বা দুঃখী করিতে পারে না এই ধারণা সর্ব্বদা মনে জাগরূক রাখিতে পারিলেই মাৎসর্য্য বিদূরিত হয়।

এই মাৎসর্য্যই ভক্তের নিকট অন্যভাবে অবস্থান করে। ভক্ত নিজের পাপ স্মরণ করিয়া এক একবার হতাশ হয় আবার শ্রীভগবান অসংখ্য পাপীকে

উদ্ধার করিয়াছেন মনে করিয়া ঈর্ষাবশতঃই প্রাণের আবেগে বলিয়া থাকে—"পতিত পাবন, তুমি আমায় দয়া করিবে না কেন? তুমি মহাপাপী অজামিলকে উদ্ধার করিয়াছ, বালক ধ্রুব ও প্রহ্লাদকে দেখা দিয়াছ, বিদুরের ঘরে ক্ষুদ খাইয়া প্রীতিলাভ করিয়াছ, চণ্ডালকে কোল দিয়াছ, খল কালীয় নাগেরও মস্তকে চরণ দিয়াছ—আমাকে দিবে না কেন?" ভক্তের নিকট—মাৎসর্য্য অর্থাৎ ঈর্ষাভাব এইভাবেই বাস করে। ইহাতে অনিষ্টের কোনও কারণ নাই বরং ভাবপুষ্টিরই সহায়ক।

সংক্ষেপে ষড় রিপুর বিষয় লিখিত হইল। তবে এইটী মনে সর্ব্বদা রাখিতে হইবে যে, রিপু মরে না, ঐরূপই থাকে কেবল উহার ক্রিয়া ভক্তের ভাবানুযায়ী হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা নরোত্তম দাস ঠাকুর প্রেমভক্তি চন্দ্রিকায় বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণসেবা কামার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্ট লাভ বিনে, মদ কৃষ্ণ গুণগানে
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥"

ষড়রিপুর দমনের বিষয় যাহা বলা হইল যদিও উহা অতি সহজ কিন্তু যাহাদের শাস্ত্রজ্ঞান নাই, সৎসঙ্গাদিরও সম্ভাবনা নাই তাহারা কি প্রকার ক্রিয়া করিলে দুর্দ্দমনীয় রিপুকুলের হাত হইতে নিস্তার পাইবে সে বিষয় সংক্ষেপে বলিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গ শেষ করিব।

যাহার যেমন অবস্থা সেই সেই ভাবেই সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীভগবানকে জানাইবে, অন্য উপায় না থাকিলেও গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র যাহার লাভ হইয়াছে তাহার আর কোনই অভাব নাই। যেমন রিপুকুল প্রবল হইয়া উঠিবে অমনি যথাশক্তি ইষ্টমন্ত্র জপ বা শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তন করিলেই রিপুর অত্যাচার প্রশমিত হইবে। পূর্ব্বোক্ত উপায় সমূহ হইতে এই উপায় অতি সহজ। উচ্চকণ্ঠে ভগবন্নামকীর্ত্তনে প্রাণ সুশীতল হয়, মনের দুর্ব্বলতা সকল দূর হইয়া চিত্ত নির্ম্মল করে। ভগবন্নামে যে ফল, মন্ত্রজপেও সেই ফল। যাহার যেমন সত্তা তিনি সেইরূপ ভাবেই আচরণ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।"

সহৃদয় পাঠকগণ! ক্ষীরোদচন্দ্রের লিখিত খাতায় ষড়রিপুর বিষয় যাহা পাইয়াছি তাহাই উপরে লিখিত হইল। এবিষয় অন্য রকমের আলোচনা অন্য সময় করা যাইবে। আগামীবার হইতে মহাপুরুষের সহিত আমার কি ভাবে কয়েকটী দিন কাটিয়াছিল এবং যে সকল মধুময় উপদেশ পাইয়াছিলাম ক্রমশঃ তাহাই আপনাদিগকে জানাইবার ইচ্ছা রহিল।

ক্রমশঃ—

শ্রীশীতল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মাধুর্য্য-দশক

জয় জয় গুরুদেব বিপিন বিহারী।
মাধুর্য্য-দশক রচি তব কৃপা স্ম'রি॥
জয় জয় ছয় গোসাঁই করুণা সাগর।
জয় নিত্যানন্দ জাহ্নবার প্রাণেশ্বর॥
জয় জয় মহাপ্রভু জয় সীতানাথ।
জয় গদাধর শ্রীবাস ভক্তগণ সাথ॥
সবাকার পদরেণু দেও মোর শিরে।
মাধুর্য্য-দশক-গান যেন স্ফুরে মোরে॥

[১]

উজ্জ্বল কজ্জ্বল চিক্কণ শ্যাম।
মাণিক নূপুর পদে দামিনী দাম॥
দশনখে শশধর ছবি পরকাশ।
পদতল রাতুল উৎপল বিকাশ॥
চন্দন তুলসী সীধু সাধু মধুকর।
অন্তর-রঞ্জন আনন্দ-আকর॥
যা'র লাগি কত কত যোগী ঋষিবৃন্দ।
সতত ধেয়ায় হৃদে না পায় সম্বন্ধ॥
সেখানে অগম্যনিধি পীরিতে সুলভ।
ব্রজভাবে গোবিন্দ ভজ ভাই সব॥

[২]

বিপরীত-বর্ত্তী রম্ভাতরু সমতুল॥
কিবা সে চরণস্তম্ভ স্নিগ্ধ সুবর্ত্তুল॥
তদুপরি রাজে নীল বপু মনোহর।
শ্যামল তমাল শিরে নব জলধর॥
যাঁ'র প্রতি লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
নিশ্বাস প্রশ্বাসে ক'রে গমনাগমন॥
এ হেন শরীর ধরে যে পদ যুগল।
কত দৃঢ়, বড়, ভাব হ'য়ে অচঞ্চল॥
যশোমতী মাতা কোলে সে 'শিশু ঘুমায়।
ব্রজভাব বিনা তাঁর লাগ কেবা পায়॥

[৩]

চামীকর-কিঙ্কণী বেষ্টিত শ্রীকটি।
নীলকান্ত কায় ঢাকি পিতবাস ধটি॥
রবিকর করম্বিত যেন কাদম্বিনী।
মানস-মুকুরে হের সুখ সুধাখানি॥
দশাঙ্গুলে অঙ্গুরীর সূর্য্যকান্ত মণি।
দশসূর্য্য সমুদিত করে হেন মানি॥
যাঁর ঠাঁই রবি বহ্নি পাইছে কিরণ॥
তাঁর অঙ্গে সূর্য্য, নহে কপোল-কল্পন॥
অঙ্গ-প্রভা এত যাঁর কে যাবে সেথায়।
বিনা ব্রজে ভজি তাঁর কে পাবে সন্ধান

[৪]

তারে যদি কৃপাকরি নরহরিরূপে।
ব্রজমাঝে না আনিয়া রাখিত স্বরূপে॥
সেই যদি না খেলিত রাখালের সাথ।
কেবা তার লাগ পেত কে বাড়াত হাত॥
সে যদি না গোপগণে করিত নির্ভয়।
তবে বল কে তারে বলিত প্রেমময়॥
সে যদি গোপিকাবৃন্দে অঙ্গের পরশে।
না ডারিত প্রেমানন্দে সাধনার শেষে॥
কেবা তার নাম নিত ক বত সাধন।
ব্রজভাবে ভজ সবে গোবিন্দ চরণ॥

[৫]

মণিময় অঙ্গদ বলয় সু-করে।
তড়িত জড়িত যেন মেঘের উপরে॥
কর নয় করি শুণ্ড বরষে করুণা।
যা'র কণা ল'ভে ধন্য গোপ গোপাঙ্গনা॥
গিরিরাজ গোবর্দ্ধন ধারণে সক্ষম।
বাম করে বামাঙ্গুল কত মনোরম॥
বিশাল-বিগ্রহ গ্রহ উপগ্রহ কত।
কটাক্ষ ইঙ্গিতে কক্ষে ভ্রমে অবিরত॥
তাঁরে যদি পেতে চ'ত বিনা ব্রজভাবে।
হ'তনা, হ'তনা, তাঁরে ব্রজে ভজ সবে

[৬]

কম্বকণ্ঠে কমনীয় কুসুমের মাল।
আন্দোলিত বৈজয়ন্তি ধরিয়া সুতাল॥

কম্বুগ্রীবা পরিসর সুবক্ষ চুমিয়া।
লালসা চরণে পড়ে হেলিয়া ছুলিয়া॥
কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ সুখে করি আস্বাদন।
আপনি আনন্দে মাতি করে বিতরণ॥
সেই পরিমল দান করিতে গ্রহণ।
ভকত ভ্রমর ধায় ব্রজে অগণন॥
মেঘে যেন রামধনু শোভে সেই মাল।
ব্রজভাবে ভজ সবে যশোদা দুলাল॥

[৭]

সে যদি গলায় পরি' হীরকের মালা।
দ্বারকার রাজতক্ত করিত উজলা॥
ব্রজের রাখাল সেথা পারিত কি যেতে।
দারিদ্র্য দেখিয়া দ্বারী বাধা দিত পথে
আপনি গোপাল সাজি ধেনু না ফিরাত
কে বল তাহারে আজ ধরিতে পারিত॥
সন্তুষ্ট না হ'ত যদি ননী ক্ষীর সরে।
কাশ্মীরী আঙ্গুর যদি সুখদিত তারে॥
ব্রজের রাখাল তারে তুষিত কেমনে।
ব্রজভাবে ভজ সবে গোবিন্দ চরণে॥

[৮]

নীল গগনচ্ছটা বদনে সুন্দর।
গুঞ্জা গঞ্জন তাহে সু-ওষ্ঠ অধর॥
মরকত মাঝে যেন খচিত প্রবাল।
ভূঙ্গে ইন্দি নিন্দি শোভে অলকে শ্রীভাল।
নাসায় তিলক মতি কি জ্যোতি বিকাশ।
খেলিছে বিজলি যেন উজলি আকাশ॥
কৃষ্ণমাতা না সাজাতো গোপাল-বদন
কি চিন্তা করিত তবে উপাসকগণ॥
শূন্ত কিম্বা কান্তি চিন্তা করিলে কি হবে?
গোবিন্দ মুখারবিন্দ ভাব ব্রজভাবে॥

[৯]

আস্যে হাস্য আরাধিকা অপাঙ্গে নিরখি।
নয়নে বিজলি খেলে চমকি চমকি॥
রাকাশশী নেহারিলে নীল সাগর।
আনন্দে উথলে যেন বাড়ে কলেবর॥
সেইরূপ শ্যামসিন্ধু বাড়িয়া হরষে।
রাধা ইন্দুমুখ হেরি অমিয়া বরষে॥
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম বপু হইল লীলায়।
রাই ইন্দু না উদিলে সে লীলা কে পায়॥
যুগল ভজন তাই হ'য়েছে বিধান।
ব্রজে শ্রীযুগল ভজ হ'য়ে সাবধান॥

[১০]

সে মাধুরী হেরি মেঘ ভাবিয়া ময়ূরী।
আনন্দে নর্ত্তন করে স্ব-পুচ্ছ প্রসারি॥
প্রেমাবেগে দেয় শিখি-পাখা উপহার।
চূড়ায় পরায় পাখা প্রেয়সী আবার॥
শিরে যদি কোহিনুর হইত পরাতে।
বল ভাই কে পারিত শ্রীকৃষ্ণ ভজিতে।
আনন্দ-হিল্লোল বাড়ে শ্রীরাধা দর্শনে।
এই রাধা নাম লেখা সেই পাখাগণে॥
প্রিয়া লাগ পাবে ব'লে চূড়া হেলে বামে।
ব্রজে শ্রীযুগল ভজ অনন্য স্মরণে॥
মহাপ্রভু চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
মাধুর্য্য-দশক গায় অধম কিঙ্কর॥

শ্রীসত্যচরণ চন্দ্র বি, এল,

ভক্তি

BENGAL LIBRARY
CALCUTTA

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

(২১শ বর্ষ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ও মাঘ, ১৩২৯ সাল)

প্রার্থনা

"নান্যং বদামি ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি
নান্যং স্মরামি ন ভজামি নচাশ্রয়ামি।
ভক্ত্যা ত্বদীয়চরণাম্বুজমন্তরেণ
শ্রীশ্রীনিবাস পুরুষোত্তম দেহি দাস্যম্ ॥"

হে ভগবন্! সারাজীবন নানাবিধ অসৎআলাপ করিয়া বাক্‌যন্ত্রকে অত্যন্ত কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছি এখন ইচ্ছাহইলেও সহজে তোমার নাম বলিতে পারি না, নানাপ্রকার কুৎসিৎ বাক্য শ্রবণকরিয়া শ্রবণ শক্তিও তোমার নাম-গুণ ও লীলা-কথাশ্রবণে ক্রমে অশক্ত হইয়াছে, বিষয়ের চিন্তাকরিয়া হৃদয়-খনিতো শ্মশানতুল্যই হইয়াছে, তোমার স্মরণ, তোমার ভজন যে আমার একমাত্র কর্ত্তব্য তাহা ভুলিয়াই গিয়াছি। যাহা অসত্য, যাহার আশ্রয়ে সুখের পরিবর্ত্তে ঘোর যন্ত্রণাদায়ক দুঃখই অবশ্যম্ভাবী তাহাই আশ্রয় করিয়া এতদিন দুঃখের উপরদুঃখ, শোকের উপর শোক, যন্ত্রণারউপর যন্ত্রণা পাইতেছিলাম। যতদিন আমার এ অজ্ঞানতা বুঝনাই ততদিন শোক-দুঃখের যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইয়া হা হুতাশ করিতে করিতে একরকম ছিলাম, কিন্তু তোমার কৃপা, তোমার চিহ্নিত ভক্তের অপরিসীম ভালবাসায় যখন সে ঘোর কাটিয়াছে তখন আর আমাকে এ দুঃখময় কূপে ফেলিয়া রাখিয়া যন্ত্রণা দিওনা।

এখন দয়াকরিয়া এই কর যে, যেকটাদিন আর বাঁচিব, যেন তোমার ভুবনমঙ্গল নামগুণকীর্ত্তনভিন্ন অন্যকথা বলি না, তোমার লীলাকথাভিন্ন অন্য বাজেকথা শুনি না, তোমার সুমধুর লীলামাধুরী চিন্তাতেই যেন দিবারাত্র বিভোর-থাকি। তোমার স্মরণ, তোমার ভজন এবং কায়মনোবাক্যে তোমার চরণা-শ্রয়ভিন্ন অন্য কিছুতে যেন মন যায় না। তুমিই সর্ব্বোত্তম জানিয়া, তোমার সাধনভজনই একমাত্র জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ইহা বুঝিয়া, তোমার হইয়া যাহাতে জীবন আনন্দময় করিতে পারি তাহা কর। জীবনভোর অনেক চাহিয়াছি,তোমার কৃপায় অনেক পাইয়াওছি আবার সাধ্যমত তাহাভোগকরিয়াও দেখিয়াছি কিন্তু কিছুতেই শান্তি পাই নাই, তাই এখন সকল ছাড়িয়া তোমার নিকট এই প্রার্থনা লইয়া উপস্থিত, তুমি দয়াকরিয়া আমার আশা পূর্ণকর।

"দীনেরআশা কর পূরণ।
(ওহে) দীনদয়াময় দীনশরণ ॥
বড়আশা আছে মনে হে দীনশরণ, দিবানিশি তোমার ভাবে রহিব মগন,
(আশা পূর্ণ কর—প্রাণে প্রাণে ভাবদিয়ে)
বিষয় বাসনা বিষেরজ্বালায় জ্বলিতেছি অনুক্ষণ ॥
ভাবিতে পারিনা নাথ তব ভালবাসা, অহর্নিশি আসেমনে কতই দুরাশা,
(আর আশা নাই—সাধনভজনকরি এমন)
বৃথাধনজনের ভালবাসায় হ'তেছি পাপেমগন ॥
ভুলায়ে রেখনাহরি মায়াময়সংসারে, ঘুরে ঘুরে জনমগেল পরকে আপন ক'রে,
(সাধনহ'লনা—দিনেদিনে দিন গত হ'ল)
তুমি আপনগুণে এ নির্গুণে, আপনক'রে দাও প্রেমধন ॥
যেমনক'রে ভালবাসি অসার সংসারে, তেমনক'রে কবে ভালবাসিব তোমারে,
(আশাপূর্ণহবে—প্রাণে প্রাণে তোমায় ভালবেসে)
(আমি) ডুবেপ্রেমসিন্ধুনীরে জুড়াব পরাণমন ॥"

দীন—সম্পাদক

বিশ্বরূপের সঙ্গীত

(৫)

৮।—গৌরচন্দ্র দয়াল দীনজন শরণ তাপদুঃখহরণ হে।
বিষ্ণুপ্রিয়াবর নাগর নদীয়া নাগরীগণ মনমোহন হে॥
কেলি-কীর্ত্তন নটনানন্দ সু-ললিত মধুরত্রিভঙ্গ হে।
রঙ্গ-কৌতুক হাস্যরসময় রসিকজন চিত্তরমণ হে॥
সর্ব্ব-মঙ্গলকারণ কলিজন ক্লেশকলুষ নাশন হে।
বৃন্দারণ্য সু-যশমহিমাগুণ স্বজনগণকৃত গায়ন হে॥
মত্তমানস চপলরূপরস ভোগবিলাসে নিমগ্ন হে।
(যেন) তপ্তমরুমাঝে ভ্রান্তিমরিচিকা তৃষিত জনেরাখ শরণ হে॥
বিশ্বরূপ বিহিতচাহে শুনি নাম পতিতপাবন হে।
জনম মরণ এযাতনা পুনঃ পুনঃ রক্ষ প্রভু দীনতারণ হে॥

৯।—গৌরকচি সুন্দর সু-ঠাম হেম কলেবর।
পিরিত মাখা মুরতিবাঁকা নবকিশোর নটবর॥
দাঁড়ায়ে জাহ্নবীকূলে বকুলমূল করিআলো,
নাসিতেসতী যুবতীমতি জাতি ধরম কুলশীল,
অধরে মধুরহাসি অমিয়া ঝুরে রাশিরাশি,
সে হাসি মরমে পসি উদাসিকরে অন্তর॥

(কিবা) কুঞ্চিকৃত কেশপাশ কলাপে রচিত চূড়া,
কুন্দ ফুল বকুল মল্লিকামালতিমালা বেড়া,
শ্রবণে কুণ্ডলদোলে উজলেধরা,—
ললাটতটে প্রকট কোটাইন্দু রবিনিন্দন,
চন্দনতিলক শোভা ঝলকে অলকাগণ,
নয়নযুগল পরে ভ্রূভঙ্গি করে নর্ত্তন,
কীর্ত্তন-নটনরঙ্গ আবেশে সদা গরগর॥

(কিবা) হেমভুজ দণ্ডগলে লম্বিত কুসুমমাল,
প্রসন্ন হিয়াপর দোলে পবনভরে চঞ্চল,
পট্ট পীতবাস পরিধান উজ্জল ;—

নূপুরবাজে রুণুঝুনু শ্রীচরণসরোজপরে,
মরকন্দ-পানে মত্ত মধুপকুল গুঞ্জরে,
নিরখি রসভূপ কেবা ধৈরজ ধরিতেপারে,
বিশ্বরূপ ওরূপহেরে প্রেম-শরে জরজর ॥

সম্পাদক

নির্ব্বাণ কি প্রেম ?

জীবের পরম লক্ষ্য কি ? নির্ব্বাণ না প্রেম ? প্রেমই জীবের পরম লক্ষ্য, নির্ব্বাণ নহে। কেন না জীবের স্বরূপ নিত্য ভগবদ্দাস, অতএব কৈঙ্কর্য্যই তাহার সাধনার চরম পর্য্যবসান। নিত্য সত্য শ্রীভগবানে শুদ্ধা অহৈতুকী ভক্তি লাভই মরণ-ধর্ম্মশীল জীবনের অমৃতত্ব লাভের একমাত্র উপায়।

"নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে"

জীব কখনও অখণ্ড জ্ঞানরাশি ব্রহ্মস্বরূপ নহে, কেননা তাহাহইলে তাহাতে কখনও মায়ার আবরণ পড়িতে পারে না, এবং মায়ার আবরণ না পড়িলে কেন সে অল্পজ্ঞ হইল ? যদি বলা যায় মায়া অতাত্ত্বিক, ভ্রমই জীবের অল্পজ্ঞানতার কারণ, তবে বলি ভ্রম কোথায় ? ব্রহ্মে কি জীবে ? "নাদ্যঃ- বিজ্ঞানঘনরাশেঃ তস্যাসম্ভবাৎ" ব্রহ্মের ভ্রম অসম্ভব, যেহেতু তিনি বিজ্ঞান ঘনরাশি ; নাদ্যঃ প্রাগভ্রান্তেস্তস্যৈবাভাবাৎ"

জীবভাব প্রাপ্তির মূলকারণ হইল ভ্রম বা অবিদ্যা। এর পূর্ব্বে সে ব্রহ্ম-স্বরূপছিল ; এক্ষণে কথা হইতেছে যে, যদি বিজ্ঞানঘনরাশি ব্রহ্মসম্বন্ধে ভ্রম একেবারেই অসম্ভব হয়, তবে জীবভাবপ্রাপ্তির অন্য কোন কারণই ত নাই। অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, জীব কখনই ব্রহ্ম নহে, ব্রহ্মদাস। এই দাসত্বের বিস্মৃতিই তাহার সংসার, এবং উদ্বোধনই তাহার মুক্তি।

"মুক্তিহিত্বান্তথারূপং স্বরূপেন ব্যবস্থিতি"

জীব দ্বিবিধ, এক নিত্যমুক্ত, আর অনাদিবদ্ধ। এই উভয়বিধ জীবই ভগবদ্দাস। তবে যাহারা নিত্যমুক্ত, তাহারা শ্রীভগবানের নিত্যধামের পরিকর, আর আমরা তাঁহার সংসার-লীলার সহায়ক। পার্থক্য এই যে, আমাদের সে স্বভাবের বিস্মৃতি আছে, এ বিস্মৃতি কোনও অজ্ঞানিত সুদূর অতীতকাল লব্ধ, কিন্তু তাঁহাদের তাহা নাই, তাহাদের হৃদয়ে সে বোধ নিত্যই জাগরূক।

এক্ষণে একটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, বেদাদি সত্যশাস্ত্রে একটী বস্তুকে তত্ত্ববলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, তত্ত্ববিদগণ তাহাকে অদ্বয় তত্ত্বরূপে ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু সেস্থলে এমন প্রভু-ভৃত্য ভাব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যেহেতু স্বগত স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদরহিত বস্তুই অদ্বয় তত্ত্ব।

"বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্র পুষ্পফলাঙ্কুরৈঃ।
বৃক্ষান্তরাৎ স্বজাতীয়ঃ বিজাতীয়ঃ শিলাদিত ॥"

পত্র, পুষ্প, ফল ও অঙ্কুর হইতে বৃক্ষের যে ভেদ তাহা স্বগত ভেদ, এক জাতীয় বৃক্ষহইতে অন্যজাতীয় বৃক্ষের যে ভেদ তাহা স্বজাতীয় ভেদ, এবং শিলাদি হইতে বৃক্ষাদির যে ভেদ তাহা বিজাতীয় ভেদ নামে কথিত হয়। এবম্প্রকার ত্রিবিধ ভেদরহিত বস্তুই অদ্বয় তত্ত্ব। এরূপস্থলে জীবেশাদির কল্পনা করাও বাতুলতা মাত্র, তদুত্তরে বলি যে, দ্রব্যান্তরের শক্তির সাহায্য না লইয়া যে বস্তু স্বতই শক্তিশালিনী তাহাই তত্ত্ব হইতে ভিন্ন। এইরূপ ভেদরহিত তত্ত্ববস্তুই অদ্বয় তত্ত্ব। শ্রীভগবানের সহিত জীবের এইরূপ ভেদ নাই। যেহেতু জীব তাঁর শক্তি। "শক্তি শক্তিমতোরভেদাৎ" "শক্তি শক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদ কথঞ্চন" জীব যে তাঁর শক্তি, তাহা বহুশাস্ত্র হইতেই প্রমাণিত করা যাইতে পারে।

"বিষ্ণুশক্তি পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞন্যাঃ তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ (বিষ্ণুপুরাণ)

অনন্ত শক্তির আধার শ্রীবিষ্ণুর পরা, অপরা, এবং অবিদ্যা নামক তিনটী শক্তিই প্রধান। পরাশব্দে চিৎশক্তি অপরা শব্দে জীবশক্তি এবং অবিদ্যাশব্দে তাঁর মায়া শক্তিকে বুঝায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

"অপরেয়মিত স্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥" (গীতা)

হে মহাবাহো, মনাদি হইতে আর একটী আমার উৎকৃষ্টা প্রকৃতি আছে তাহাকে জীব বলা হয়, তাহা দ্বারাই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ধৃত হইয়া আছে। অতএব জীব যে তাঁর শক্তি এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। শক্তির কর্ত্তব্য শক্তিমানের অনুগত হইয়া তাঁর সেবা করা, ইহাই তার পরম ধর্ম্ম। "স বৈ পুংসাম্ পরোধর্ম্মঃ যতো ভক্তি রধোক্ষজে" অধোক্ষজ শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তি লাভ করাই জীবের পরম ধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত তার আত্মার চির শান্তি কিছুতেই লাভ হইবে না। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা যাক্ নির্ব্বাণ বস্তুটী কি। প্রাকৃত মনের লয়ই নির্ব্বাণ, জীবাত্মা বা তার স্বরূপাত্মক অহমিকার নাশ নহে। অহমিকা দ্বিবিধ, অস্মদ শব্দ বাচ্য এবং স্বরূপাত্মক। ত্রিগুণাত্মক মনের বৃত্তি রূপে যে অহঙ্কার প্রকাশ পায়, তাহা অস্মদ শব্দ বাচ্য, আর যাহা শুদ্ধ জীবের স্বরূপের সঙ্গে বর্ত্তমান থাকে, তাহা স্বরূপাত্মক। মুক্তিকালে জীবের অস্মদ শব্দ বাচ্য অহমিকারই নাশ হয়, স্বরূপাত্মক অহঙ্কার থাকে, নতুবা মুক্তি সুখ ভোগ করিবে কে? যদি মুক্তিকালে স্বরূপের অহম্ বোধেরই অভাব ঘটিয়া যায়, তবে প্রকারান্তরে আত্মনাশই ঘটিয়া গেল। এরূপ মুক্তি কাহারও প্রার্থনীয় নয়। বিশেষতঃ বেদাদি শাস্ত্র ভাল করিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, মায়িক অহঙ্কার ব্যতীত অন্যবিধ অহঙ্কার রহিয়াছে।

"একোঽহং বহুস্যাম প্রজায়েয়:" শ্রীভগবানের এই ইচ্ছাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যদি অস্মদ শব্দ বাচ্য অহঙ্কার ব্যতীত অন্যবিধ অহঙ্কার না থাকিত তবে প্রকৃত অহঙ্কারাদির সৃষ্টির বহু পূর্ব্বে শ্রীভগবানের এতাদৃশ ইচ্ছার উদ্গম হইতে পারিত না। ইহাই স্বরূপাত্মক অহঙ্কার। সুষুপ্তির মাঝে জীবের মন বুদ্ধি অহঙ্কার সব লয় পায়, কিন্তু স্বরূপাত্মক অহঙ্কার বিদ্যমান থাকে, যেহেতু জাগ্রত অবস্থায় অনেককেই বলিতে দেখা যায়, "সুখমহমস্বাপ্সম্ ন কিঞ্চিদবেদিষম্" আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারি নাই। এখানেও অস্মদ শব্দ বাচ্য ব্যতীত অন্যবিধ অহঙ্কার রহিয়াছে। মুক্তাবস্থায় এরূপ অহঙ্কার স্বরূপের সঙ্গে নিত্য বর্ত্তমান থাকে তাই মুক্তপুরুষগণ মধ্যেও ভগবদ্ভজন অনুষ্ঠিত হয়, শাস্ত্রে এরূপ ভাব শ্রুত হওয়া যায়। "মুক্তা হ্যেনমুপাসতে।"

উপনিষদ ত অতি স্পষ্ট ভাষায়ই মুক্তিকালে জীবের স্বরূপাত্মক মন, বুদ্ধি,

অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়, এবং সত্য সঙ্কল্পময় শরীরের কথা ঘোষণা করিতেছেন। "শৃণ্বন্ শ্রোত্রং ভবতি, স্পৃশন্ ত্বগ্ ভবতি, পশ্যন্ চক্ষুর্ভবতি, জিঘ্রন্ ঘ্রানং ভবতি, রসয়ন্ রসনা ভবতি, মন্বানো মনো ভবতি, বোধয়ন্ বুদ্ধির্ভবতি চেতঃশ্চিত্তম্ভবতি অহঙ্কুর্ব্বাণোঽহঙ্কারো ভবতি।" (শতপথ ব্রাহ্মণ)

মুক্ত জীবের ব্রহ্ম সাক্ষাৎ জনিত প্রাকৃত ইন্দ্রিয় সমূহের নাশ হইলেও শুনিবার জন্য দিব্য শ্রবণ, স্পর্শ করিবার জন্য ত্বগ, দেখিবার জন্য চক্ষু, আঘ্রান লইবার নিমিত্ত নাসিকা, আস্বাদ লইবার নিমিত্ত জিহ্বা, স্মরণ করিবার জন্য মন, চিন্তা করিবার নিমিত্ত বুদ্ধি, চেতনার নিমিত্ত চিত্ত, এবং অহম বোধের নিমিত্ত অহঙ্কার লাভ হইয়া থাকে। এ সমস্তই মায়াগন্ধ বিবর্জ্জিত, শুদ্ধ অপ্রাকৃত। কঠো নিষদে দৃষ্ট হয়,

"যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহু পরমাং গতিম্॥"

যে অবস্থায় শুদ্ধ স্বরূপাত্মক পঞ্চেন্দ্রিয়, মন এবং জ্ঞান বিদ্যমান থাকে, এবং বুদ্ধি স্থিরাবস্থা লাভ করে, তাহাকেই পরমাগতি বা মুক্তি বা নির্ব্বাণ বলে। নির্ব্বাণ শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয়গত অর্থও তাই। নি+বা ধাতুর উত্তর অনট্ প্রত্যয় করিয়া নির্ব্বাণ শব্দ নিষ্পন্ন। "বা" ধাতুর অর্থ গতি, গতি রাহিত্যই নির্ব্বাণ। অর্থাৎ যে স্থান লাভ করিলে জীবকে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, জনম মরণের হাত হইতে তার চির অব্যাহতি লাভ হয়, সেই আনন্দময় সুখস্বরূপ অবস্থাই নির্ব্বাণ, জীবাত্মার লয় নহে। ব্রহ্ম নির্ব্বাণ বলিয়া শাস্ত্রাদিতে যেটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যাহাতে জীব ব্রহ্মের অভেদ ভাব সাধিত হয়, সেটী ব্রহ্ম ভাবাখ্য মাত্র। সাধনার প্রথম অবস্থা হইতে "অহং ব্রহ্ম পরং ধামঃ" "ব্রহ্মাহং পরমং পদম্" ইত্যাকার অভেদ ভাব ভাবনা করিতে করিতে সাধকের হৃদয়ে একটা ব্রহ্মাকার বৃত্তি জন্মিয়া যায়। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" তখন সে স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া অর্থাৎ নিজের অনুত্ব ভুলিয়া গিয়া ব্রহ্ম ভাবে "সোঽহং" অভিমান করিয়া থাকে ইহা একপ্রকার ভাব মাত্র। ভূতাবিষ্ট ব্যক্তি যেমন নিজের স্বরূপের কথা বিস্মৃত হইয়া আপনাকে ভূত ভাবিয়া বসে, ভূতের মত আচরণ করিয়া থাকে, অভেদ পন্থার পথিকগণও ভাবনার গাঢ়তা বশতঃ তদ্রূপ ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া থাকে। বিদেহ মুক্তি কালেও জীবাত্মা পরমাত্মার অন্তর্ভূত হন মাত্র, লীন হন না। নিত্য বস্তুর কখনও লয় হয় না, যেহেতু "লয়"

শব্দে নাশকেই বুঝায়। নিত্য বস্তুর নাশ বলিলে উন্মত্তের প্রলাপ ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? জীব নিত্য শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ, "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একো বহূনাং বিদধাতি যো কামান্॥ তমাত্মস্থং যেঽনু পশ্যন্তি ধীরাস্তেষাম্ শান্তি শাশ্বতী নেতরেষাম্॥" যিনি বহু নিত্যের মধ্যে এক নিত্য, বহু চেতনের মধ্যে এক চেতন, যিনি সকলের কামনা পূর্ণ করেন, সেই আত্মস্থ পরমাত্মাকে যে সমস্ত ধীর ব্যক্তি দর্শন করেন, তাঁহারাই নিত্য শান্তি লাভ করেন, অন্যে নহে।

"অথো বাচ নিত্যানি পুরুষ প্রকৃতিরাত্মা কাল" পুরুষ, প্রকৃতি, আত্মা ও কাল এই চারিটী নিত্য। ইহারা অনাদি কাল হইতে আছেন, এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত থাকিবেন। ইহাদের কখনও বিনাশ বা লয় নাই।

মোট কথা নির্ব্বাণ বলিতে সাধারণত আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, যেমন জীবাত্মা পরমাত্মার স্বরূপে এক হইয়া যাওয়া, দার্শনিক হিসাবে তাহা কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। যাঁহারা বলেন জলে জল মিশার মত জীব ব্রহ্মে লয় পায়, তাঁহারা একটু স্থির চিত্তে চিন্তা করিলেই বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, এক জল অন্য জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া লোক চক্ষে একাকার দেখাইলেও ভিন্ন বস্তু-নিবন্ধন, উহা একের অন্তর্গত বলিয়া বুঝিতে হইবে। বস্তুর লয় বা নাশ স্বীকার হইতে পারে না। বিশেষতঃ শুদ্ধ সত্য সনাতন শ্রীভগবানের শক্তি স্থানীয় এই জীব কখনও শ্রীভগবানের সহিত মিশিয়া লয় পাইতে পারে না। শক্তি শক্তি-মানে যে নিত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ, সে ভেদাভেদ অচিন্ত্য। অগ্নিও তাহার দাহিকাশক্তিকে কেহ কখনও একেবারে মিশাইয়া দিতে সমর্থ হন না। তদ্রূপ জীবও নিত্য, ঈশ্বর ও নিত্য, জীবও চৈতন্য স্বরূপ, ঈশ্বরও চৈতন্য স্বরূপ, তবে একজন অনুচিৎ, অন্যটী বিভুচিৎ বা চৈতন্যরাশি; একটী নিয়ম্য দাস, অন্যটী তার নিয়ন্তা প্রভু, জীবে ভগবানে এই সম্বন্ধ, এ সম্বন্ধ নিত্য। এই নিত্য সম্বন্ধের বিস্মৃতিই তাহার বহির্ম্মুখাবস্থা, উদ্বোধনই পরমানন্দময় স্ব স্বরূপাবস্থা প্রাপ্তি বা মুক্তি। জীবের স্বরূপ নিত্য ভগবদ্দাস, সেবা করাই পরম ধর্ম্ম, প্রেমই তাহার প্রয়োজন, এবং সর্ব্বার্থ প্রসবিনী সর্ব্বানন্দ প্রদায়িনী ভক্তিই তাহার আত্যন্তিকী দুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র উপায়।" "নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়"

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা, ভক্তি প্রেম স্বরূপিণী
ভক্তিরানন্দ রূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

সচ্চিদানন্দময়ী রস স্বরূপা ভক্তি সেবা রূপা, ভক্তি ভক্তকে ভগবৎ সেবা প্রদান করে, ভক্তকে প্রেমসিন্ধুর মধুর প্রেম রসে অক্ষয় অমর করিয়া রাখে, ভক্ত হৃদয়ে আনন্দের পাথার বহাইয়া দেয়, সে আনন্দের হ্রাস নাই, সে আনন্দ নিত্য নব নব ভাবে বর্দ্ধনশীল। আনন্দরসময়ী ভক্তি ভক্তের জীবন।

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে." "সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা" নিখিলজন-মন-প্রাণ শীতলকারিণী সাগরপ্রবাহিণী সুনির্ম্মলমন্দাকিনীধারার মত প্রিয়ভক্তহৃদয়োত্থিত ঘনীভূত ভাবরাশি যখন শ্রীভগবানের শ্রীচরণোদ্দেশে ধাবিত হয়, যখন কোনবাধা কোন বিঘ্নই সে ভাবসাগরের উদ্দাম তরঙ্গের মুখে স্থির থাকিতে পারে না, মদমত্ত মাতঙ্গ ঐরাবতেরন্যায় কোথায় ভাসিয়া যায়, সেই ফলানুসন্ধানশূন্য অনুরাগময়ী ভালবাসার নাম ভক্তি বা প্রেম। এই প্রেমের ভিতর দিয়াই ভক্ত পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট রসস্বরূপ শ্রীভগবানের অনন্ত অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য আস্বাদনকরে; অন্য কোন উপায়েই এরূপ আস্বাদন হয় না। প্রেম অনন্তস্বরূপ হইয়াও নিত্য নব নবায়মান, নির্ব্বাণাদি অন্য আনন্দসমূহ তার-তুলনায় অতিতুচ্ছ।

ত্বৎসাক্ষাৎ করণাহ্লাদ বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্যমে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রহ্মান্যপি জগদ্গুরোঃ॥ (হরিবংশ)

মহামতি প্রহ্লাদ বলিয়াছেন "হে জগদ্গুরো, আপনার এই সৌম্যমধুর আনন্দ-রসময় সুঠাম বিগ্রহ দর্শন করিয়া আমি যে শুদ্ধআনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইতেছি, তার তুলনায় সেই ব্রহ্মানন্দও গোষ্পদের মত বলিয়া বোধ হইতেছে।

"পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেম আনন্দেরসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে একবিন্দু॥" (চৈঃ চঃ)

ব্রহ্মানন্দ হইতে প্রেমানন্দ অধিক মধুময়ী না হইলে কখনও শ্রীশুক, শ্রীসনক প্রভৃতি ব্রহ্মানন্দসেবীর চিত্তে শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দের মকরন্দ পানে আকাঙ্ক্ষা জাগিতে পারিত না। ভগবানের অপ্রাকৃত লীলার এমনই সুমধুর আকর্ষণ যে, আত্মারাম মুনিগণ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। যাহাই হউক, ভক্তিই যে জীবের চরম প্রাপ্য, এবিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না।

শ্রীকালাচাঁদ

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রদাস প্রসঙ্গ।

(৫)

একদিন বৈকালে কলিকাতায় পুলীনদাদার সঙ্গে দেখা হ'তে তিনি বল্লেন —"আমার সঙ্গে বাবাজী মহাশয়কে দেখ্‌তে চল।" আমি কোন আপত্তি না ক'রে তাঁরসঙ্গে বিডনষ্ট্রীট হইতে সেয়ারের গাড়ীতে উঠে বরাহনগরে নেমে রায়-বাহাদুরের বাগানবাড়ীতে গেলাম। আমাদের দেখে বাবাজী মহাশয় খুব আনন্দিত হলেন। পুলীনদাদার সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হতে লাগলো; আমি কাছে বসে বসে শুনতে লাগলুম। তারপরে নবদ্বীপ দাদার নিকটে গিয়ে কত কথাই হ'লো। নবদ্বীপদাদা পুলীনদাদাকে "পুলে" ব'লে ডাকেন। পুলীনদাদাও নবদ্বীপ দাদাগত প্রাণ। রাত্রে প্রসাদ পেয়ে বাগানেই থাক্‌লুম, বাবাজী মহাশয়ের জন্য পূর্ব্বদিকের ঘরে রায়বাহাদুর মহাশয় একখানি খাট ও পরিস্কার বিছানা দিয়াছেন, বিছানাটী খুব বড়। সৌভাগ্যক্রমে আমি ও পুলীনদাদা বাবাজী মহাশয়ের চরণতলে শয়ন করবার আদেশ পেলাম। এই ঘরটীতে নিত্যসেবারজন্য চিত্রপট ও আম্রশাখা সমেত একটী পূর্ণঘট আছে। শ্রীমতী ললিতাদিদি ও অন্যান্য দিদিরা এইঘরেই কুলবধুর মত থাকেন। বাবাজী মহাশয়ের প্রতি ইঁহাদের সেবা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হলাম। সারারাত্রি কেহই ঘুমান না, রাত্রিতে বাবাজী মহাশয়ের ভাবের আতিশয্য হয়, তিনি বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করতে থাকেন, কখন উঠেন কখন বসেন, সময়ে সময়ে ঘর হ'তে বাহিরে বেরিয়ে পড়েন। একদিন রাত্রিতে ঐরূপভাবে বাহিরে গিয়ে—গাছের তলাতে মুর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে ছিলেন, এইজন্য দিদিরা সকলেই সারা রাত্রি জেগে থাকেন, এবং যখন যা দরকার তাই করেন। ললিতাদিদি চিত্রপটের নিকটে ব'সে পরদিনের ভোগের জন্য বাদাম পেস্তাগুলি ছাড়াতে লাগলেন। পুলীনদাদার সঙ্গে বাবাজীমহাশয়ের কথাবার্ত্তা হ'তে লাগলো, আমি খানিক পরে ঘুমিয়ে পড়লাম। খুবভোরে সুমধুর প্রভাতিসুরে বাকিরের হলে রামদাদার কীর্ত্তন শুনে ঘুম ভাঙলো। প্রাতে পুলীনদাদা কলিকাতায় চলে-গেলেন, আমি বাগানে নবদ্বীপদার কাছে থাকলুম।

(নবদ্বীপদাদার দীনতা)

বাগানবাড়ীতেই আজ বাবাজীমহাশয়গণের সঙ্গে প্রসাদ পেলাম ও বৈকাল বেলা আন্দাজ ৩টার সময় বাড়ী যাবার জন্তে বেরুলে. নবদ্বীপদাদাও আমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে আসতে লাগ্‌লেন।

বেশ মনে আছে আমার হাতে একখানি বিশ্বকোষ অভিধান ছিল, পূর্ব্বদিন উহা "ছায়াপথ" প্রণেতা প্রসিদ্ধভক্ত পূর্ণচন্দ্র গুপ্তের নিকট হ'তে নিয়ে আসি। কথায় কথায় নবদ্বীপদাদা আমার সঙ্গে বারাকপুর ট্র্যাঙ্ক-রোডে এসে পড়েন, এবং বেশ নির্জ্জনস্থান দেখে দুজনে একটী গাছের তলাতে বসি। আমরা যেখানে বসেছি তার পাশদিয়ে একটী সরু রাস্তা পূর্ব্বদিকে মাটের মধ্যে গিয়েছে, এবং পশ্চিমদিকে আড়িয়াদহের রাস্তা। দাদা বসে বসে আমার গায়েতে হাত বুলোতে বুলোতে নানাবিধ উপদেশ দিচ্ছেন; এমন সময়ে একটী বাবু এসে দাদাকে বল্লেন ;—"ওরে ওরে" "এই এই" "বনহুগলীর রাস্তা কোন্ দিকে ব'লতে পারিস্।" বাবুটী এরূপ অভদ্রভাবে কথা বলাতে আমার খুব রাগহ'লো। আমিও বিদ্রুপ ক'রে বাবুটীকে বল্‌তে যাচ্ছিলুম—"কাপুড়ে বাবু, কথা কইতে এখনো শিখোনি, কার সঙ্গে কথা কইচো জাননা, পোষাক দেখেই মানুষ চেনো।" —ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার রাগের কথা বাহির হ'তে না হ'তেই দাদা সেই বাবুর মুখের দিকে চেয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে তাকে দণ্ডবৎ কল্লেন ও কত ভালবাসা মাখান স্বরে পথ বলে দিলেন। দাদার কথার স্বর এবং দণ্ডবৎকরা দেখে বাবুটী যেন অপ্রস্তুত হ'য়ে গেলেন। ভাবে বোধ হলো খুবই লজ্জিত হয়েছেন, তাই আর কিছু না বলে দাদাকে দণ্ডবৎ করে গন্তব্য পথে চলে গেলেন। যাবার সময় ২।১ বার দাদার দিকে চাইতে চাইতে যেতে লাগলো। আমি কিন্তু রাগে বাবুটির দিকে কটমটিয়ে চেয়ে রইলুম। দাদা আমার ভাব বুঝে আমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলেন। সে চাওয়ার অর্থ তখন বুঝলাম না; পরে বল্লেন "যা বাড়ী যা।" আমি পদধুলি নিয়ে উঠ্‌লাম ও ২।৩বার পশ্চাৎ ফিরে ফিরে দাদাকে দেখতে দেখতে রাস্তায় চলতে লাগলাম,—ক্রমে দাদা বড়রাস্তা ছাড়িয়ে গ্রাম্য পথে প্রবেশ করাতে আর দেখ্‌তে পেলাম না। তখন আমি খুব জোরে জোরে পথ চলতে লাগলাম।

এইবার পথে চলতে চলতে আমার ভিতরে যেন কি একটা ক্রিয়া হ'তে লাগলো—একটা অপরূপ আনন্দ। সেরূপ আনন্দ কখন অনুভব করি নাই, আর একটা দীনহীন ভাব ক্রমে ক্রমে আমার প্রাণের মধ্যে যেন সঞ্চিত হ'তে লাগলো। তারপর হঠাৎ মনে হলো—যেন আমার দেহটা রাস্তাময় ছড়িয়ে পড়লো, আর সেই দেহের প্রত্যেক স্থান হ'তে যেন আনন্দ স্ফূরিত হচ্ছে। যেই কোন লোক রাস্তা দিয়ে চলে আসচে অমনি আমার বোধ হচ্ছে যেন আমার দেহের উপর দিয়ে যাচ্ছে, আর আনন্দ উৎস উথলে পড়চে। আমি তখন যেন একেবারে মাটীর সঙ্গে মিশে গেছি। প্রত্যেক লোক আমার উপর দিয়ে মাড়িয়ে যাক্, তা'হলেই যেন আমার পূর্ণানন্দ ভোগ হবে—এইরূপ ভাব। ক্রমে ক্রমে আমার হুঁস রইল না; পাস দিয়ে লোক চলে গেলেও দেখতে কি জানতে পারছি না, সে অপূর্ব্ব আনন্দ স্রোতে হাবুডুবু খেতে খেতে কখন যে সমুদয় পথ অতিক্রম করেছি তার ঠিক ছিল না। বাড়িতে এসেও সেই আনন্দ চলতে লাগলো। যাদের সঙ্গে ঝগড়া আছে, তাদের সেদিন আনন্দময় পরম মিত্র দেখচি। এইরূপ একটা অদ্ভূত নেশার মত ভাব ২।৩ দিন খুবই প্রবল-ভাবে ছিল, পরে ক্রমে ক্রমে কমতে থাকে, সাত দিন পর্য্যন্ত এই ভাবের জের বুঝেছিলাম। ওই সময়ে বন্ধুরা আমাকে দেখে বলতো—"তোর একি হ'লোরে অমূল! ক্ষেপ্‌লি নাকি ?"

পরে দাদার মুখে শুনেছিলাম "এরই নাম প্রকৃত দীনতা", উহাই নবদ্বীপ দাদার বিশেষ সম্পত্তি। আমি যে ভাবের কণামাত্র সাময়িকক্ষণ উপলব্ধি ক'রে ছিলাম—নবদ্বীপ দাদার ভিতর ওই ভাব অষ্টপ্রহর পূর্ণভাবে বিরাজ করচে।

এর পরে নিজের ভণ্ডামী বেশ বুঝতে পেরেছিলাম,—লোকের কাছে পায়ের ধুলা নিয়ে "আপনি বড় আমি ছোট" ইত্যাদি বলে যে সব দীনতা করি তা দীনতাই নয়, কেবল ভণ্ডামী।"

কেননা দীনভাব দেখিয়ে নিজে বলচি —"আমি মহাপাপী, নরাধম, অজ্ঞান, মূর্খ ইত্যাদি।" কিন্তু ঠিক ওই কথাগুলিই যদি কেউ আমাকে বলে—"তুমি মহাপাপী নরাধম ইত্যাদি।" তাহ'লে তখন সে লোকের উপর যে কি রকম রাগ হয় তা আর বলবো না,—কিন্তু কেন—আমার নিজের কথাই যা পুনঃ পুনঃ লোককে নিত্য বলি—সেই কথাই তো তারা প্রতিধ্বনির মত বললে, এতে রাগ আসে কেন! তাই বেশ মনে হলো দীনতা হীনতা যা কিছু করি ও আসল নয় ভণ্ডামী, আর লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার জন্ত।

পরে বুঝেছিলাম দাদা আমাদের কত বড়—কত উচ্চ। দাদা কৃপা করলে মুহূর্ত্তের মধ্যে আমরা উদ্ধার হ'য়ে যেতে পারি। দাদার করুণা-কটাক্ষে অধমেও প্রেম সাগরে সাঁতার দিতে পারে।

কিন্তু হায়! এখন হৃদয়ের সে সব বাল্যের কোমল বৃত্তি দূরে চলে গেছে, এখন কামিনী কাঞ্চনের দাস হ'য়ে মায়ার লাথি খাচ্চি, জেনে শুনেও খুব ভাল ক'রে নরকের পথ পরিষ্কার করচি, সব হারিয়ে ফেলেচি। কিন্তু সব হারালেও সেদিনের সেই সুমধুর স্মৃতি এখনও প্রাণ থেকে যায়নি।

[বাবাজী মহাশয় ও নবদ্বীপ দাদার আড়িয়াদহ বাগান হতে বরাহনগরে গমন।]

পুলীন দাদা "নেবুতলায়" আর জান না, কেবল সেখানের গুরুদেবকে সপ্তাহে সপ্তাহে যে আফিং দিতেন, সেইটি দিয়ে আসেন। এজন্য পুলিন দাদার সঙ্গে খুব কমই দেখা হয়। অথচ পুলিন দাদার নিকট হ'তে বাবাজী মহাশয়দের সব সংবাদ সব ব্যাপার না শুনলে যেন মন তৃপ্তিলাভ করে না। একদিন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ রায় চৌধুরীর বাসাতে রাত্রে পুলিন দাদাকে পেয়ে খুব আনন্দ হলো। দু'জনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রায় রাত্র বারটা পর্য্যন্ত নানাবিধ প্রাণের কথা হলো। দাদা যে আর নেবুতলায় যাবেন না তা বিশেষ করে বুঝলুম। এইখানে শশীবাবুর একটু পরিচয় দিব। ইনি "ডেবরিয়ার শ্রমজীবি বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠাতা; মহা সাধু। ঐ সময় কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের কিং এণ্ড কোং ঔষধের দোকানের উপরে ডাক্তার বাবুর বাসায় থাকতেন। এই কর্ম্মবীর মহাপ্রাণ শশীবাবু বিগত ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ২৯এ চৈত্র স্বধামে গমন করিয়াছেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় মাত্রেই ইঁহাকে জানেন। শ্রীযুক্ত অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ এম,এ মহাশয় ইঁহার জীবন-চরিত লিখিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন ইঁহার জীবনী প্রকাশিত হইলে একটী সুন্দর জিনিষ হইবে।

একদিন প্রাতে আড়িয়াদহের বাগানের বাইরের বারাণ্ডায় বাবাজী মহাশয় বেন্ট উডের চেয়ারে বসে আছেন, নিকটে কয়েকটী ভক্তও আছেন। কামেখ্যা চরণ বাবাজী নামক জনৈক বরাহনগরবাসী বৈষ্ণব বাবাজী মহাশয়কে নিজ গৃহে নিয়ে যাবার জন্য আগ্রহ করচেন ও নানারূপ কথাও হচ্ছে। আমার সঙ্গেও দুই একটী কথা বলচেন, (কথাগুলি নেবুতলায় ও গোপাল দাদার সম্বন্ধে কিছু কিছু ছিল) বলতে বলতে হঠাৎ বাবাজী মহাশয় "হরিবোল" বলে

হুঙ্কার করে উঠলেন, এবং আমাকে বল্লেন "তোমার গোপাল মামাকে দেশ থেকে শীঘ্র এখানে আসতে পত্র লেখো।" সেই আজ্ঞা পেয়ে আমি গোপাল মামাকে পত্র দিলাম। পানিহাটী হ'তে ওই সময়ে গোপাল মামা দেশে চলে গিয়েছিলেন। পরে গোপাল মামার মুখে শুনেছিলাম "তিনি এমন একটা কার্য্যে রত হচ্ছিলেন যাতে তাঁর ভবিষ্যতে মহা অনিষ্ট হতো। একেবারে সবই ঠিক হ'য়েছিল কিন্তু হঠাৎ সেই সময়ে বাবাজী মহাশয়ের আজ্ঞাযুক্ত আমার পত্রখানি পেয়ে তাঁর প্রাণে যে কিভাব হয় তা তিনি বলতে পারছিলেন না। শ্রীভগবানের অসীম করুণা, অসীম দয়া ওই পত্রের আজ্ঞাতে বুঝতে পেরে পূর্ব্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি পানিহাটীতে চলে আসেন। পরদিন শনিবারে তাঁতে আমাতে বৈকালে আড়িয়াদহের বাগানে যাবার জন্য বেরুলুম। বড় রাস্তাতে "দৈত্যের খালের" পোলের নিকটে গিয়ে একটু বিশ্রাম কচ্চি, এমন সময়ে দেখি রামবাবু একখানি গাড়ীতে বাড়ীর মেয়েদের নিয়ে থিয়েটার দেখাতে যাচ্চেন। আমাদের দেখে আমরা যে বাবাজী মহাশয়ের নিকট দুজনে যাচ্চি তা বুঝতে পারলেন এবং মনটাও আমাদের সঙ্গে যাবার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়েছিল। (রাম দাদার এ যাত্রায় থিয়েটার দেখে বেরুবার সময় হটাৎ জুয়াচোরে সোণার চেন ও ঘড়িটা চুরি করে নেয়। পরদিন রামদাদা নিজেই এসে বল্লেন।)

তারপর বাগানবাড়ীতে যাবামাত্র শুনলাম এখনই সকলে বরাহনগরে কামিখ্যা চরণ বাবাজীর বাড়ীতে চলে যাবেন। দুই একদিন পরে সেখান হতে কলিকাতায় যাবেন। নবদ্বীপ দাদা আমাদের দেখে বল্লেন "আমাদের সঙ্গে বরাহনগরে রাত্রে থাকবি।" বাবাজী মহাশয় গোপাল মামাকে দেখে বল্লেন "আমার সঙ্গে চল বাবা, রাত্রে তোমার সঙ্গে কথা কইবো।" কাজেই আমরাও বরাহ নগরে যেতে প্রস্তুত হলাম। যাবার সময়ে যা হলো আমি তা দেখে একবারে অবাক।

বাগানের একখানা কাঠের গাড়ীতে করে বাবাজীদের সমস্ত পোটলা পুটুলি আগে চলে গেলো। ঠিক সন্ধ্যার সময়ে সব বাবাজীরা বাগানের বাহিরে এসে দাঁড়ালেন। তারপরে বড় বাবাজী মহাশয় বাগান বাড়ীর প্রত্যেক ঘরে গিয়ে বাস্তুদেবতা থেকে গৃহের কীট পতঙ্গকে পর্য্যন্ত দণ্ডবৎ করে কত স্তুতি করতে লাগলেন অর্থাৎ "হে গৃহস্থিত দেবতা, তোমার উপর কত উপদ্রব করলুম, গৃহস্থিত কত কীট পতঙ্গের অনিষ্ট হলো তোমরা সকলে আমাকে ক্ষমা কর ইত্যাদি।" সব ঘরগুলিতে পরে বাগানের গাছ পালা পর্য্যন্ত সকলের

নিকটে গিয়ে ওইরূপ করতে লাগলেন। সে দিনের সে ছবি, সে চেহারা এখনও আমার বেশ মনে আছে।

তারপরে গেটের কাছে আসতেই সুমধুর কীর্ত্তন আরম্ভ হলো। সে কীর্ত্তনের অন্যান্য অংশ ভুলে গেলেও প্রথম ধুয়াটি বেশ মনে আছে। সেটি কি মধুর "ওকে আগে আগে যায়।"

বাবাজী মহাশয়ের শ্রীমুখ হ'তে উচ্চারিত হইবার পরই সমাগত যাত্রীরা সকলে মিলে উন্মত্তের মত গেয়ে উঠলেন—"ওকে আগে আগে যায়।" মনে হলো গায়কেরা যেন দেখ্‌তে পাচ্চেন রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে কে যেন এই মহাপুরুষের জন্য স্বর্ণ দীপ হস্তে অগ্রে অগ্রে গমন করছেন। চক্ষুহীন আমি সে দর্শনের ক্ষমতা আমার নেই কিন্তু সেই গানেই মোহিত হ'য়ে গেলাম, সর্ব্বাঙ্গ পুলকে ভরে উঠলো। সে দিনের সে গান, বাবাজী মহাশয়ের সেই ভাব এখনও খুব উজ্জ্বল ভাবেই আমার স্মৃতি পটে অঙ্কিত রয়েছে। তারপরে এক অদ্ভুত দৃশ্য।

বাগানের ফটকের কাছে ঘরে একটী রায়বাহাদুরের কোচ্‌ম্যান স্ত্রী পুত্র নিয়ে বাস করে। বাবাজী মহাশয়কে সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞানে তারা ভক্তিকরে। রায় বাহাদুরের দীক্ষার পরে তাহারাও বাবাজী মহাশয়ের নিকট কৃপা পেয়েছে। তারা বোধ হয় জানতনা যে, আজ বাবাজী মহাশয় বাগান থেকে চলে যাবেন; তাই তিনি যখন স্বদলবলে কীর্ত্তন কর্ত্তে কর্ত্তে ফটকের সীমা পার হবেন—অমনি কোচ্‌ম্যান—"বাবা হাম্‌কো ছোড়কে কাঁহা চলা যাতা।" ব'লে পুত্র শোকের মত উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠলো—। বাবাজী মহাশয় তাকে বুকে করে তুলে নিয়ে অনেক বুঝিয়ে সরকারী রাস্তায় উঠলেন। তারপরে ওমা! কোচ্‌-ম্যানের স্ত্রী (সেই সময়ে রাস্তায় খোয়া ফেলা হয়েছিল) সে কোথা হতে দৌড়ে এসে বাবাজী মহাশয়ের চরণ তলে সেই খোয়ার উপরেই সজোরে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলো ও পা জড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলো। তার আছাড় খাওয়া দেখে আমার মনে হ'লো বোধহয় শরীরের হাড় গুলো ভেঙ্গে গিয়েছে। তার কান্না আর থামেনা, চরণও ছাড়ে না খোয়ার উপর অবিরত গড়াগড়ি দিতে লাগলো। কীর্ত্তন কারীরা মুখে কীর্ত্তন কচ্ছে বটে, কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য এই কোচম্যান্ রূপী দেব দম্পতীর প্রতি। সকলেই মোহিত হ'য়ে গেছেন। আজ বাবাজী মহাশয় এদের ভক্তিতে এমন বাঁধা পড়ে গেছেন যে আর চলতে পারচেন না। তিনিও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদচেন। শেষে অনেক বুঝিয়ে বল্লেন—"উঠ

মায়ী, আবার দেখা হবে, কোন ভয় নেই কেবল নাম করবে।" অনেক ক্ষণ পরে স্ত্রীলোকটী প্রকৃতিস্থ হ'লে তবে তিনি গমন করতে লাগলেন।

আমিতো অবাক। এই নিরক্ষর দরিদ্র হিন্দুস্থানী কোচ্‌ম্যান দম্পতী, এদের গুরুভক্তির কি জলন্ত দৃশ্য ? এরা বাবাজী মহাশয়কে এমন করে চিনেছে, এদের ভেতর এমন স্বর্গীয় ভাব, এমন প্রেম, হায় হায় আভিজাত্যের অভিমানী আমি আমার মধ্যে এর যে শতাংশের এক অংশও নাই। এই কোচম্যান দম্পতীকে আমি মনে মনে প্রণাম না করে থাকৃতে পারলুম না। পরে বড় রাস্তা দিয়ে কিছুদুর গিয়ে বরাহনগরের রাস্তা হ'য়ে কামিখ্যা বাবাজীর গৃহে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন হয়ে সকলে বিশ্রাম করতে লাগলেন। কামিখ্যা বাবাজী মহাশয় দরিদ্র লোক; সংযোগী বৈষ্ণব। ২।৩ খানি মাত্র ঘর। একটী ঘরে বাবাজী মহাশয়কে বিছানা করে দিলেন সখী দিদিরা সেই খানেই রইলেন। বাকি ঘরে, দালানে, উঠানে, লোক ভরে গেলো। অনেক লোক বাবাজী মহাশয়কে দেখ্‌তে এসেছেন। খানিক বাদে বাবাজী মহাশয় গোপাল মামাকে ডেকে সাধন ভজন সম্বন্ধে অনেক কথা বর্ত্তা কইলেন। (পুনরায় বলি কাজের কথা গুলিই ভুলে গেছি; বাহিরের কথা গুলিই মনে রেখেছি।) তারপর প্রসাদ পাওয়া হলো; খিচুড়ি প্রভৃতি। বাবাজী মহাশয় মুলা ও মুড়ি ভালবাসেন এজন্য কামিখ্যা বাবাজী মহাশয় তাহাও সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু প্রসাদ পাবার শেষে মনে পড়ে যাওয়াতে মুলা মুড়ি পুনরায় তাঁকে সেবা করান ও আমাদের প্রত্যেককে কিছু কিছু দিয়ে যান।

প্রসাদ পেয়ে বাবাজী মহাশয় আচমন করবার জন্যে যখন আমার পাতের নিকট দিয়ে যাচ্ছেন, সেই সময়ে হঠাৎ আমার পাতের দুই চারিটী মুড়ি নিয়ে চল্লেন—"যা তোর জাত মেরে দিনু।" আমি "হাঁ হাঁ করেন কি করেন কি" বলতে না বলতেই তিনি মুড়ি বদনে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন। এই রূপে মহানন্দে সে রাত্র কামিখ্যাদাস বাবাজীর গৃহে আমরা থেকে পরদিন প্রাতে বাবাজী মহাশয় ও নবদ্বীপদাদার পদধুলী নিয়ে পানিহাটী চলে গেলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা কীর্ত্তন।

(শ্রীযুক্ত রামদাসবাবাজী কর্ত্তৃক গীত)

(শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাইগৌর হরিবোল)

"ভজ নিতাইগৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥"
নিতাই গৌর রাধে শ্যাম রাধে ॥
জপ হরেকৃষ্ণ হরেরাম,
(ভজ ভাইরে) নিতাই গৌর রাধেশ্যাম,
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম,
জপ রাম রাম হরে হরে—হরে কৃষ্ণ হরে রাম।
(রামে রমে মনোরমে—হরে কৃষ্ণ হরে রাম)
(শ্রীরাধারমণরাম— ঐ)
(ভজ নিতাইগৌর রাধেশ্যাম রাধে ॥)
(আমার) নিতাইগুণমণি ভজ ॥
(ভাইরে) আমার নিতাই গুণমণি,
(আমি) কি জানি গুণ, কত বা বাখানি, আমার নিতাই গুণমণি।
(নিতাই আমার) অখণ্ড প্রেমের খনি, ঐ
(সেধে যেচে) বিলায়রে প্রেম-চিন্তামণি, ঐ
আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে গিয়ে—(সেধে যেচে) বিলায়রে প্রেম-চিন্তামণি।
দন্তে তৃণধরি করি যোড় পাণি ঐ
দু'নয়নে বহে ধারা (যেন) সুরধুনী, ঐ
জাতিকুল অধিকার কিছু না গণি, সেধে যেচে বিলায়রে প্রেম চিন্তামণি ॥
ভাইরে আমার নিতাই সুন্দর—
(ও তার) গৌরপ্রেমে গড়া কলেবর,—ভাইরে আমার নিতাই সুন্দর,
(নিতাই আমার) গোরা রসে গরগর,

(নিতাই আমার) গোরাভাবে সদাই বিভোর,
জানেনা নিতাই আপন কি পর, গোরাভাবে সদাই বিভোর
(গৌর) প্রেমমদিরায় হ'য়ে বিভোর, জানেনা নিতাই আপন কি পর।
(নিতাই আমার) আচণ্ডালে ধেয়ে করে কোর, ঐ
আমরি ! প্রেমবাহু প্রসারিয়া—(নিতাই আমার) আচণ্ডালে ধেয়ে করে কোর।
(বলে)—ভাই বিনামূলে আমি হব তোর,
ও তোর পাপ তাপের বোঝা নিয়ে, বিনামূলে আমি হব তোর।
"একবার মুখে বল ভাই গৌর গৌর" "বিনামূলে আমি হব তোর ॥"
(নিতাই আমার) গৌর বলতে হারায় ঠউর,
(নিতাই চাঁদের) দু'নয়নে বহে কতশতলোর, গৌরবলতে হারায় ঠউর
(নিতাই আমার) শ্রীচৈতন্য চাঁদের চকোর।
(ওগো !) আমার নিতাই, আমার নিতাই—শ্রীচৈতন্য চাঁদের চকোর।)
(নিতাই আমার) গোরা পদ্মে মত্তমধুকর,
প্রেমমধু পানে সদাই বিভোর,—গোরাপদ্মে মত্ত মধুকর ॥
(ভাইরে) নিতাই রঙিয়া আমার।
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম বিনোদিয়া—নিতাই রঙিয়া আমার।
(আমরি) গোরারসে রসিয়া—নিতাই রঙিয়া আমার।—
(আমরি) গৌর প্রেমে উন্মাদিয়া, নিতাই রঙিয়া আমার।
(নিতাই আমার) নিশি দিশি বেড়ায় কাঁদিয়া,
(আমার) গৌর প্রেমে পাগলা নিতাই,—নিশি দিশি বেড়ায় কাঁদিয়া।
গলবাসে দন্তেতৃণ ধরিয়া—নিশি দিশি বেড়ায় কাঁদিয়া।
ঐ সুরধুনীর তীরদিয়া, নিশি দিশি বেড়ায় কাঁদিয়া।
আচণ্ডালে বলে কাঁদিয়া—
আচণ্ডালের দ্বারেতে গিয়া, করজোড়ে বলে কাঁদিয়া,
(কত শত) ধারা বহে মুখ বুক বহিয়া, কর জোড়ে বলে কাঁদিয়া :—
"আমি বিনামূলে যাব বিকাইয়া"
"তোমাদের পাপ তাপের বোঝা নিয়া" "আমি বিনামূলে যাব বিকাইয়া"
„(একবার) 'গৌরহরি' বলি আমায় লও কিনিয়া" "আমি বিনামূলে যাব বিকাইয়া।"
(আমার) নিতাই কাঁদে ফুলিয়া ফুলিয়া।
(বাহু পসারি) আচণ্ডালে কোলে তুলিয়া, (আমার) নিতাই কাঁদে ফুলিয়া ফুলিয়া।

(আমি বলি) পতিতেরে বুকে তুলিয়া। (আমার) নিতাই কাঁদে ফুলিয়া ফুলিয়া।
(নিতাই আমার) চলে যেতে পড়ে ঢলিয়া।
'রামাই' 'গৌরীদাসের' কাঁধে হাত দিয়া।
(নিতাই আমার) চ'লে যেতে পড়ে ঢলিয়া
"(ভাইরে) আমার গৌর হরি ভজ" বলিয়া। চলে যেতে পড়ে ঢলিয়া
(ভাইরে) আমার নিতাই নয়ন তারা।
ও তার গৌর প্রেমে তনুগড়া। আমার নিতাই নয়ন তারা
(নিতাই আমার) গৌর প্রেমে পাগল পারা,
ঐ ঐ গৌর প্রেমে মাতোয়ারা,
ঐ ঐ গৌর প্রেমে দিগ্‌ বিদিগ হারা;
ঐ ঐ গৌর প্রেমে আত্ম হারা,
নিশি দিশি গায় "গোরা গোরা" গৌরপ্রেমে আত্মহারা
প্রতি অঙ্গ পুলকে ভরা, নয়নে বহে শত ধারা
(শ্রীঅঙ্গ) পুলকে ভরা নয়নে বহে শত ধারা।
(নিতাই চাঁদের) দু'নয়নে বহে কত শত শত ধারা,
ঐ নয়ন ধারায় ভেসে যায় ধরা,
("গৌর" ব'লতে) নয়ন জলে ভেসে যায় ধরা
আমার প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ।
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ।
আমার পাগলের প্রাণ নিতাই
আমার ঐ গরবে হৃদয় ভরা (আমার) প্রভুর প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ।
আমি ঐ গরবে গরব করি ঐ ঐ
আমি ঐ গরবে সদাই ফিরি ঐ ঐ
নিতাই আমার অখণ্ড পরমানন্দ।
(নিতাই আমার) অক্রোধ পরমানন্দ।
(আমার) অদোষ দরশি নিতাই ঐ
অযাচিত কৃপাকারি নিতাই ঐ
নিতাই আমার পাষণ্ড দলন দণ্ড।
চাঁদ নিতাই আমার পতিতের বন্ধু।
(ওতার) পতিত উদ্ধারে সঙ্কল্প একান্ত।

[নিতাই আমার] শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম ভাণ্ড।
ওসে আমার নিতাই, আমার নিতাই। ঐ ঐ
প্রেম-বন্যায় ভাসাইলা ব্রহ্মাণ্ড। ঐ ঐ
প্রেমে মাতাইল পতিত পাষণ্ড। ঐ ঐ
[আমরি] গৌর বশীকরণ মন্ত্র।
আমার নিতাই গুণমণির নাম ঐ
শ্রীমুখে বলেছেন প্রাণ গৌরাঙ্গ ;—
"মুখেও যে জন বলে মুই নিত্যানন্দ দাসরে।
সে নিশ্চয় দেখিবে আমার স্বরূপ প্রকাশ রে॥"
"সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে রে।
যে ডুবিবে সে ভজুক আমার নিতাই চাঁদেরে রে॥"
"গোপীগণের যেই প্রেম কহে ভাগবতে রে
একলা নিত্যানন্দ হইতে পাইবে জগতে রে॥"
[বাহুতুলে বলেন গৌরহরি]
"সে আমার আমি তার, নিতাই সর্ব্বস্ব যার" [মাতন]
"আমি বিকাইলাম নিতাই করে।"
[গৌরহরি] বলেন বাহু উর্দ্ধ ক'রে ঐ
"এবার বিশ্বম্বর নাম ধরে, ঐ
"তারই হব অবিচারে, নিতাই যারে দিবে ইচ্ছাক'রে"
শ্রীমুখে বলেছেন গৌরহরি ;
"তিলার্দ্ধেক নিত্যানন্দে যার দ্বেষ রহেরে।"
[আমায়] ভজিলেও সে কভু আমার প্রিয় নহে রে॥"
"নিত্যানন্দ স্বরূপে যে প্রীতি করে অন্তরে রে।
নিশ্চয় জানিহ সে প্রীতি করয়ে আমারে রে॥"
"শ্রীনিত্যানন্দ আমার অভিন্ন তনু রে।" [মাতন]
সেখানে এখানে একই কথা
ব্রজ আর নদীয়া, ঐ
মধুরশ্রীবৃন্দাবনে, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়, রাধিকা আশ্রয়।
মধুর শ্রীনবদ্বীপে, দুই ঠাঁই একই কথা।
বৃন্দাবনে এই প্রতিজ্ঞা ;

"কিশোরী দাস, মুই পীতবাস, ইহাতে সন্দেহ যার রে।"
কোটী জন্ম যদি আমারে ভজয়ে, বিফল ভজন তার রে ॥
বৃন্দাবনে ছিল এই প্রতিজ্ঞা
(আবার) শ্রীনবদ্বীপে হ'ল এই প্রতিজ্ঞা
"তিলার্দ্ধেক নিত্যানন্দে যার দ্বেষ রহেরে।
[আমায়"] ভজিলে ও সে কভু আমার প্রিয় নহেরে ॥"
আয় ভাই আমরা নিতাই ভজি।
অবিজ্ঞাত নিগূঢ় তত্ত্ব; ঐ ঐ
অমাদের নিতাই বিনা আর গতি নাই।
কলিহত পতিত জীব মোরা, আমাদের নিতাই বিনা আর গতি নাই।
এমন কার প্রাণ কাঁদে।
পতিত দুর্গতি দেখে, ঐ
কে সেধে যেচে বিলায়রে।
অনর্পিত নাম প্রেম ;— ঐ
কেউ কি শুনেছো কোথা!
কত কত অবতার হ'য়েছে ;— ঐ
এমন করুণার কথা ;— ঐ
কে কোথায় শুনেছ?
পাপ ল'য়ে প্রেম যাচে, কে কোথায় শুনেছ
কে কোথায় পতিত আছে খুঁজে খুঁজে,—পাপ ল'য়ে প্রেম যাচে
কেউ কি শুনেছো কোথা
মার খেয়েও প্রেম বিলায় কেউ কি শুনেছো কোথা
বলে "মেরেছো বেশ করেছো।"
"মেরেছো কলসীর কাণা, তা ব'লে কি প্রেম দিব না?"
এমন দয়াল আর কে আছে?
হবে কি আর হ'য়েছে!
মার খেয়ে প্রেম যাচে—নিতাই বিনা আর কে আছে!—[মাতন]
আমার প্রভু নিত্যানন্দ।
নিত্যানন্দ দাস মুই ;—আমার প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ
গৌর করুণা মূর্ত্তিমন্ত ;— ঐ [মাতন]

নিত্যানন্দ রূপে বিহার।
গৌর করুণা মূরতি ধরে ;— ঐ [মাতন]
আরে আমার নিতাইরে।
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমের পাগল ;—আরে আমার নিতাইরে। [মাতন]
আয় ভাই আমরা নিতাই ভজি।
ভাই ভাই মিলে আয় নিতাই ভজি।
ভাই ভাই মিলেছি এক ঠাঁই।
শ্রীগুরুদেবের কৃপায় ; ভাই ভাই মিলেছি এক ঠাঁই
এমন সুযোগ আর পাই কি না পাই ; ঐ
ভাগ্যবতী সুরধুনী তীরে ;— ঐ
[আমার] নিতাই চাঁদের বিহার ভূমি।
ভাগ্যবতী সুরধুনী তীর ; ঐ ঐ
ভাই ভাই মিলেছি এক ঠাঁই।
নিতাই চাঁদের বিহার ভূমিতে ; ঐ
এ যে পদাঙ্কিত ভূমিরে—
এই ভাগ্যবতী সুরধুনী তীর ; এ যে পদাঙ্কিত ভূমিরে।
আমার প্রভু নিত্যানন্দের ; ঐ
পাগলা নিতাই নেচে গেছে।
এই সুরধুনী কূল দিয়ে ; ঐ
গৌরাঙ্গ নাম প্রেম বেচে ; ঐ [মাতন]
[আয়] প্রাণ ভরে নিতাই গুণ গাই।
এই নিতাই চাঁদের বিহার ভূমিতে বসে ; ঐ
অতি গূঢ় শ্রীনিত্যানন্দ।
এই গুপত গৌরাঙ্গ লীলায় ; ঐ
যারে জানায় সেই তো জানে ;
আমার অতি গূঢ় শ্রীনিতাই ধনে ; ঐ
ঐ প্রাণ গৌরাঙ্গ নিজ গুণে ; ঐ
আনে বল জানবে কেমনে ? জানে না গৌরেরও নিজ জনে।
গৌরহরি না জানালে নিজ গুণে ; ঐ
[তাই বলি] অতি গূঢ় শ্রীনিত্যানন্দ।

সৎস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ।

সৎ চিৎ আনন্দের— ঐ

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নিতাইয়ের প্রকাশ।

ব্রজের বলাই নিতাই আমার; ঐ

নিতাইয়ের সত্বায় জগতের সত্বা, ঐ

এতো নিতাই চাঁদের স্থূল তত্ব। ঐ

আরো গূঢ় রহস্য আছে ভাই।

একি কহিবার কথা, কহিব কোথা?

"নাগর নিতাই, নাগরি নিতাই, নিতাই কথা সে কয়।"

[নিতাই আমার] যখন যেমন তেমনি হয় রে।

শ্রীগৌরাঙ্গ বিলাসের তনু নিতাই; ঐ

প্রাণ গৌরাঙ্গে সুখ দিবার লাগি; ঐ

ভাব নিধির ভাব পুষ্টিরলাগি; ঐ

নিতাই নাগর হয়ে পায়ে ধরে রে,

প্রাণ গৌর যখন মানিনী হয়, নিতাই নাগর হয়ে পায় ধরে রে

ভাবিনীর ভাবাবেশে; প্রাণ গৌর যখন মানিনী হয়

(নিতাই) নাগর হয়ে তার পায়ে ধরে রে।

গলল্গ্নি কৃতবাসে; ঐ

"অপরাধ ক্ষমা কর" ব'লে; ঐ

"দাস ছুষি তার কি করবে বল।" ব'লে (নিতাই আমার) ঐ

আবার কখন গিয়ে দাঁড়ায় বামে।

চাঁদ নিতাই আমার সকলি জানে; ঐ ঐ

"নিতাই নাগর, রসের সাগর, সকল রসের গুরু।

যে যাহা চায়, তারে তাহা দেয়, বাঞ্ছাকল্পতরু॥"

নিতাই আমার বাঞ্ছাকল্পতরু।

যে যাহা চায় তারে তাহা দেয় নিতাই আমার বাঞ্ছা কল্পতরু

আমার নিতাই সর্ব্বরসের আলয়; যে যাহা চায় তারে তাহা দেয়

[আমার নিতাই] সর্ব্ব বাঞ্ছাকল্পতরু।

নিত্যানন্দ জগৎগুরু, সর্ব্ব বাঞ্ছাকল্পতরু—[মাতন]

"রাধার সমান কৃষ্ণে করে মান, সতত থাকয়ে সঙ্গে।

নিশি দিশি নাই, ফিরয়ে সদাই, কৃষ্ণকথা রসরঙ্গে ॥"
চেয়ে আড় নয়নে, গৌর পানে,
আধো বদনে ঘোমটা টেনে ; চেয়ে আড় নয়নে গৌর পানে
প্রাণনাথ বলি ডাকে ;
কতই না গরব ক'রে ; প্রাণনাথ ব'লে ডাকে
প্রধানা নাগরী নিতাই।
রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গের ; ঐ
"সাধন নিতাই, ভজন নিতাই নিতাই নয়ন তারা।"
[সাধন ভজন] কারে বলে কিছুই জানি না।
কলিহত জীব মোরা ; ঐ
জানিলেও শকতি নাই [আমরা] নিশ্চয় রূপে জানি তাই ।
সাধন শকতি নাই ; ঐ
শ্রীগুরুদেবের কৃপায় ; ঐ
পতিতের গতি নিতাই ; নিশ্চয় রূপে জানি তাই [মাতন]
"সাধন নিতাই, ভজন নিতাই, নিতাই নয়ন তারা।
দশদিকময় নিতাই সুন্দর, নিতাই ভুবন ভরা ॥"
কত দিনে সেদিন হবে ; বল গো গঙ্গাতীরবাসী
কৃপা করগো নিত্যানন্দ ভূমি নিবাসী।
জগৎ নিত্যানন্দ ময় হেরিব
কত দিনে সেদিন হবে ; জগৎ নিত্যানন্দ ময় হেরিব [মাতন]
গৌর প্রেমের মূরতি নিতাই
যেদিকে চাইব দেখতে পাবো, গৌর প্রেমের মূরতি নিতাই।
"গৌর ভজ" ব'লে কেঁদে বোড়াইছে ;
গৌর প্রেমের মূরতি নিতাই [মাতন]
"দশদিকময়, নিতাই সুন্দর, নিতাই ভুবন ভরা ॥"
"রাধার মাধুরী, অনঙ্গ মুঞ্জরী, নিতাই নিতু সে সেবে।
কোটি শশধর, বদন সুন্দর, সখা সখী বলদেবে ॥"
অনঙ্গ মুঞ্জরী নিতাই
শ্রীরাধার ভগিনী ; অনঙ্গ মুঞ্জরী নিতাই।
শ্রীরাধার কনিষ্ঠা ভগিনী ; ঐ

বাহু নাড়া দিয়ে বেড়ায় ভাই,
গরবিনী কনিষ্ঠা ব'লে বাহু নাড়া দিয়ে বেড়ায় ভাই ॥
"রাধার ভগিনী, শ্যাম সোহাগিনী, সব সখীগণ প্রাণ।"
অনঙ্গ মুঞ্জরী নিতাই—সব সখীগণ প্রাণ।
"যাহার লাবনী, মণ্ডপ সাজনী, শ্রীমণিমন্দির নাম॥"
অপরূপ রহস্য কথা।
একি কহিবার কথা, কহিব কেমনে অপরূপ রহস্য কথা
লাবণ্যের মূরতিয়ে।
গৌর-গোবিন্দের মণিমন্দির; ঐ ঐ
মণিমন্দির রূপ ধ'রেছে।
নিতাই চাঁদের লাবণ্য মূর্ত্তিমান হ'য়ে; ঐ
গৌর-গোবিন্দ বিলসিবে বলে; ঐ
"নিতাই সুন্দর, যোগ পীঠে ধরে, রত্ন সিংহাসন শেষে।"
ভাইরে আমার নিতাই সেজে।
সেজেছে নিতাই কতই সাজে
কতই রূপে সেবা করে রে; সকলি যে নিতাই রে।
গৌর-গোবিন্দের সেবা দ্রব্য ঐ
বিহার ভূমি নিতাই আমার।
গৌর মণ্ডল, ব্রজ মণ্ডল, ঐ
ভূমি রূপে নিতাই আমার, গৌর-গোবিন্দ বিলসিবে ব'লে।
সুরধুনী ও শ্রীযমুনার জলরূপে নিতাই আমার।
গৌর-গোবিন্দ কেলি করবে বলে; ঐ [মাতন]
জলরূপে নিতাই আমার॥
তরু গুল্মরূপে নিতাই আমার।
ফল ফুলে সেবা করবে ব'লে;—ঐ
যোগ পীঠ নিতাই আমার।
মণিমন্দির নিতাই আমার। পুষ্পশয্যা নিতাই আমার।
গৌর-গোবিন্দ বিলসিবে ব'লে;—ঐ
সকলি যে নিতাই রে।
বসন ভূষণ ভোজ্য পেয়;—ঐ

গৌর-গোবিন্দের সেবা করে—(নিতাই) অনন্ত রূপধরে ॥ [মাতন]
"বসন নিতাই, ভূষণ নিতাই, বিলসে সখীর মাঝে ॥"
"কি কহিব আর; নিতাই সবার, আঁখি মুখ সর্ব্ব অঙ্গ।"
আমার নিতাই গুণমণি।
শ্রীগৌরাঙ্গ সুখের খনি;—ঐ
আমার প্রভু নিত্যানন্দ, গৌরাঙ্গ সুখ মূর্ত্তিমন্ত।
আমার নিতাই কলেবর—গৌর গোবিন্দ বিলাসের ঘর।
শ্রীনিত্যানন্দ দেহখানি, শ্রীগৌরাঙ্গ ক্রিড়ার বসতি ভূমি ॥ [মাতন]
ওগো কেউ নাই আমার নিতাই বিনে, সুখ দিতে গৌরাঙ্গ ধনে ॥ মাতন
"কি কহিব আর, নিতাই সবার, আঁখি মুখ সর্ব্ব অঙ্গ।
নিতাই নিতাই নিতাই নিতাই, নিতাই নূতন রঙ্গ ॥"
"নিতাই বলিয়া, দুবাহু তুলিয়া, যাইব বরজ পুরে।"
ব্রজে যাবার এই তো সাধন।
নিতাই গুণ কীর্ত্তন নর্ত্তন। ঐ
আমরা নেচে গেয়ে ব্রজে যাবো।
নিতাই ভজে গোপী হব।
ব্রজে রাধ' রাধারমণ পাব।
"রাধাদাসী" নাম ধরিব।
নিতাই ভজে গোপী হব। রাধা দাসী নাম ধরিব
আমরা নিতুই নিতুই মিলাইব;
অভিসারে রাই কানু;—ঐ ঐ
"রাধাদাসী" নাম ধরিব, রাই কানু মিলাইব।
অপরূপ রহস্য কথা;—
শ্যামাঙ্গ হবে গৌরাঙ্গ—
রাই অঙ্গ ছটা লেগে। শ্যাম অঙ্গ হবে গৌরাঙ্গ [মাতন]
[অন্য প্রকার সুরে গেয়]
"শ্রীবৃন্দাবন রম্য স্থান, দিব্য চিন্তামণি ধাম, সুমধুর রসের আধার"
আমরি, চিন্তামণিময় ভূমি।
কল্পবৃক্ষময় বন। চিন্তামণিময় ভূমি
চিন্তামণিকেও তুচ্ছ করে,

ব্রজের একটী রজ রেণু. কোটি কোটি চিন্তামণিকেও তুচ্ছ করে।

শুল্ম হ'তে বাঞ্ছা করে ;

স্থষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তথায় ;— ঐ

ঐ রজ পরশে ধন্য হবে বলে ;—ঐ

দীনতার মূরতিরে।

ব্রজের তরুলতা তারা ; ঐ

ভকতি রাণীর একমাত্র আসন ঐ

তাদের সদাই অবনত শীর ; ঐ

"সুমধুর রসের আধার রে ॥"

"মদন মোহন শ্যাম, দলিত নীরদ দাম, প্রিয়া সহ সতত বিহার" ॥

(আমরি] বেদ বিধির অগোচর।

দোঁহে রতণ বেদীর পর, বেদবিধির অগোচর।

অনুভবপার লীলা।

রাই কানু প্রেমের খেলা ; সে যে অনুভব পার লীলা।

প্রাকৃত বাক্য মন বুদ্ধির ; অনুভব পার লীলা

আলোচনার অধিকার হয় না।

কাম গন্ধহীন ব্রজলীলা ; ঐ

এই প্রাকৃত দেহ স্মৃতি থাকিতে ; ঐ

গোপীভাব লুব্ধ চিত্ত না হলে ; ঐ

একমাত্র গোপীভাবের গোচর।

শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপায় ; ঐ

"প্রিয়া সহ সতত বিহার রে ॥"

"শ্যাম সহ সমরুচি, দামিনী দমন রুচি, গোপীকার গাঢ় আলিঙ্গনে ॥"

যেন তড়িত জড়িত নবঘনে।

রাই কানুর মিলনে। যেন তড়িত জড়িত নব ঘনে

"গোপীকার গাঢ় আলিঙ্গনে"

"গৌরবর্ণ অভ্যন্তর, প্রকাশিল মনোহর, সম্ভেদিয়া শ্যাম সুচিকনে ॥

(রাই অঙ্গে) শ্যাম অঙ্গ ঢাকা পড়েছে।

কিন্তু মাঝে মাঝে ঝলক্ দিছে।

[শ্যাম অঙ্গের] উজ্জ্বল নীলমণি ছটা মাঝে মাঝে ঝলক্ দিছে

"সন্তেদিয়া শ্যাম সুচিক্কনে"

"গৌরাঙ্গী গোপীনী সঙ্গে. নিরন্তর খেলারঙ্গে, শ্যাম অঙ্গ ঢাকি গৌর কায় ॥"

[আমরি] গৌরাঙ্গ হ'লরে,

রাই অঙ্গ ছটালেগে, শ্যাম গৌরাঙ্গ হ'লরে ॥

"শ্যাম অঙ্গ ঢাকি গৌর কায়"

"শ্রীনবদ্বীপ ধামে আসি, প্রেম বিলায় রাশি রাশি, তরঙ্গে যার জগত ভাষায় ॥"

ভাসালে ডুবালে।

স্থাবর জঙ্গম গুল্মলতা; প্রেমজলে ডুবালে।

একদিন ভেসেছিল সেই প্রেমের বন্যায়।

এই ভাগ্যবতী সুরধুনীর দুকুল, একদিন ভেসেছিল প্রেমের বন্যায়

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ ;— ঐ ঐ

হিমালয় হ'তে কুমারিকা ;—

তখন আমরা কোথা বা ছিলাম ॥

প্রেম বন্যায় জগৎ ভাস্‌লো যখন ; ঐ

(কেন) তখন জনম দিলি না বিধি ?

এখন সেই জনম দিলি যদি, কেন তখন জনম দিলি না বিধি।

আমরা প্রেম পাথারে সাঁতার দিতাম।

অকুল পাথার গৌরাঙ্গ প্রেম পাথারে সাঁতার দিতাম।

নিতাই নিতাই ব'লে নেচে নেচে গৌরাঙ্গ প্রেম পাথারে সাঁতার দিতাম।

"তরঙ্গে যার জগৎ ভাষায় ॥"

"বিষ্ণুপ্রিয়া আদিকরি, নবদ্বীপ সুনাগরী, (তারা) গোরা রসে নিমগ্ন সদাই ॥"

গোরা রসে আগরী,

যত নদীয়া নাগরী তারা গোরা রসে আগরী

"নবদ্বীপ নাগরী আগরী গোরা রসে গো।

কহিতে গৌরাঙ্গ কথা প্রেমজলে ভাষে গো ॥"

"ভাব ভরে ভাবিনী, পুলক ভরে ভোরা গো।"

(তাদের) শ্রবণে নয়নে মনে গোরা গোরা গোরা গো ॥"

গৌর বিনে আন শুনেনা কাণে।

গৌর ভাবিনী নদীয়া রমণী ; ঐ

গৌর বিনে আন দেখে না নয়নে।

গৌর বিনে আন ভাবে না মনে।
"গোরা রূপ গুণ অবতংশ পরে কাণে গো।
দিবা নিশি গৌর বিনে আন নাহি জানে গো ॥"
(শয়নে স্বপনে) গৌর বিনে আন নাহি জানে।
"গোরোচনা হরিদ্রা নিবিড় করিয়া মাথে গায় গো।
যতন করিয়া গোরা নাম লিখে তায় গো ॥"
গৌর নামের পানে চেয়ে বলে ;
তারা নামেতে মুরতি হেরে ;
অঙ্গে লিখিত নামের পানে চেয়ে বলে ;
"এক বার মৃদু হেসে কথা কও।"
গৌর নামেতে মুরতি হেরে বলে ; একবার মৃদু হেসে কথা কও।"
গৌর নামের পানে চেয়ে বলে ; ঐ
"গোরোচনা হরিদ্রার পুতলী করিয়া গো।
পুজয়ে চক্ষের জলে প্রাণ ফুল দিয়ে গো ॥"
"প্রীতি নৈবেদ্য তাহে বচন তাম্বুল গো।
পরিচর্য্যা করে ভাব সময় অনুকুল গো ॥"
"অঙ্গ কান্তি প্রদীপে করয়ে আরত্রিকে গো।
কঙ্কন শবদ ঘণ্টা আনন্দ অধিক গো ॥"
"অঙ্গ গন্ধ ধুপ ধুয়া বহে অনুরাগে গো।
পূজা করি দরশ পরশ রস মাগে গো ॥"
গৌর আমি তোমার হ'লাম
গৌর তুমি আমার হলে। আমি গৌর তোমার হলাম। [মাতন]
"বিষ্ণুপ্রিয়া আদি করি ; নবদ্বীপ সুনাগরী, তারা গোরা রসে নিমগ্ন সদাই ॥"
তাদের অনুগা হব, নিতাই পদরজ পাব।" নবদ্বীপ দাস গায় তাই ॥"
এবার নিতাই পেলে সকলি পাব।
গৌরাঙ্গ বিলাসের তত্ব ; নিতাই পেলে সকলি পাব
নিতাই ভজে গৌর পাব এ কথা অন্যথা নহে।
ঐ ঐ পাগল হয়ে বেড়াইব।
গৌর মুরতি হৃদে ধরে ; ঐ
গৌর প্রেমের কাঙ্গাল হ'য়ে দেশ বিদেশে বেড়াইব।

যারে দেখবো তারেই বলবো ;
[একবার] গৌরহরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, বল ভাই ॥ [মাতন]

সমাপ্ত

এই কীর্ত্তনটি ২৪ পরগণা মনিরামপুরে ৺কালীমন্দিরে ১৩২৯ বঙ্গাব্দে ২৬ কার্ত্তিক শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহাশয় কর্ত্তৃক গীত হয়।

সংগ্রহকার
শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট

অভেদ জ্ঞানই বিষ্ণু-ভক্তির লক্ষণ

"শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ, মা কুরু যত্নং সমরে সন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং, বাঞ্ছস্যচিরাৎ যদি বিষ্ণুত্বম্ ॥" মোহ মুদ্গর

শত্রু মিত্র পুত্র বন্ধু সন্ধি কিংবা রণ। এ সব বিষয়ে নাহি করিও যতন ॥
সর্ব্বভূতে সমভাব ভাব নিরন্তর। বিষ্ণুপদ বাঞ্ছা যদি করহ সত্বর ॥

সংসারে শান্তি লাভ করিয়া, সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিবার উপায়ই হইতেছে এই যে, শত্রু, মিত্র, পুত্র, বন্ধু, সম্পর্কীয় লোক, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষের পাত্র, সদাচার নিষ্ঠব্যক্তি ও পাপী, সমর কিংবা সন্ধি, লাভ কিংবা অলাভ, সুখ কিংবা দুঃখ ইত্যাদি সকল বিষয়েই সমান বুদ্ধি হওয়া। যিনি বুদ্ধি দ্বারা মনকে বশীভূত ও নিশ্চল অর্থাৎ আত্মশক্তির স্বরূপে অবস্থিত রাখিয়া, ভোগ স্পৃহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু ও সমচিত্ত হইতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত পক্ষে বিষ্ণু-পদ লাভের উপযুক্ত পাত্র ও সর্ব্বোত্তম যোগারূঢ় তাহাতে সন্দেহ নাই। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

"সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন মধ্যস্থ দ্বেষ্য বন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥"

সুহৃদ অর্থাৎ স্বভাবতঃ যিনি হিতাকাঙ্ক্ষী মিত্র অর্থাৎ স্নেহ বশতঃ যিনি উপকারী অরি অর্থাৎ শত্রু উদাসীন অর্থাৎ উভয় পক্ষেই যিনি নিরপেক্ষ

এবং মধ্যস্থ অর্থাৎ উভয় পক্ষেরই যিনি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও দ্বেষের পাত্র ও সম্পর্কীয় লোক এবং সদাচার নিষ্ঠ ব্যক্তি ও পাপী এই সকলে যাঁহার সমবুদ্ধি, তিনিই সর্ব্বোত্তম যোগারূঢ়।

"ত্যক্ত্বা বিষয়ভোগাংস্তু মনো নিশ্চলতাং গতম্।

আত্মশক্তি স্বরূপেন সমাধিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥" দক্ষ স্মৃতি। ৭।২২

মন বিষয় ভোগ পরিত্যাগ করিয়া যখন নিশ্চল হয় এবং আত্মশক্তির স্বরূপে অবস্থিত থাকে, তখন তাহাকে সমাধি বলে। ব্রহ্মজ্ঞানের নামই সমাধি বা বিষ্ণুত্ব; যাহা ভেদজ্ঞান থাকিতে লাভ করিতে পারা যায় না। তাই কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর বৈষ্ণব ও শাক্তদিগের মধ্যে যে ভ্রম ও প্রভেদ দেখিয়াছিলেন, তাহা ইঙ্গিতে দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কবিবর বুঝাইয়াছেন—

"হরি, হর, বিধি তিন অভেদ শরীর।

অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥"

এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রান্তরে আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে—

"মদ্ভক্তঃ শঙ্কর দ্বেষী মদ্দ্বেষী শঙ্কর প্রিয়ঃ।

উভৌ তৌ নরকে যাতৌ ভারিণাং ভার ভঙ্গবৎ॥"

অর্থাৎ বিষ্ণুভক্ত হইয়া যিনি শঙ্কর দ্বেষী হন ও শঙ্করের ভক্ত হইয়া যিনি বিষ্ণুদ্বেষী হন, তাঁহারা উভয়েই ভারির ভার ভঙ্গের ন্যায় নরকগামী হন। যেমন ভারির একটি কলস ভগ্ন হইলে অপরটিও তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া যায়, সেইরূপ উভয়েই অপরিণামদর্শীর ন্যায় দ্বেষ প্রকাশ করিয়া উভয় কুল চ্যুত হন। অতএব কেবল দেবতা বলিয়া নয়, সর্ব্বভূতে ভেদজ্ঞান পরিহার পূর্ব্বক সমদর্শী না হইতে পারিলে, সংসার মোচনের যে কোন উপায়ই নাই তাহা অতি সত্য।

শ্রীভূপতিচরণ বসু।

ভালবাসা

এই জীবনে অনেকবার অনেককে ভাল বাসিব বলিয়া প্রবল আশায় বুক বাঁধিয়াছি। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই কোথা হইতে যেন কি প্রকারের প্রবল ঝড় আসিয়া আমার ভালবাসার বাঁধন টুটাইয়া দিল। এই ভালবাসার সীমা এই পর্য্যন্তই শেষ করিলাম। এইপ্রকারে বহুবার বহু স্থানে ভালবাসার

শক্ত শক্ত বাঁধন টুটিয়া মনের যাবতীয় বৃত্তিগুলিকে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল, তবু ভালবাসার মূল সূত্র পাইলাম না। এখন ভাবিবার বিষয় এই যে, এতকাল কাহাকে ভাল বাসিলাম? যদি রূপে ভাল বাসিয়া থাকি তবে সেই ভালবাসা ঠিক হয় নাই। কারণ রূপ অচিরস্থায়ী। চির পবিত্রতাময় নহে। যদি শারীরিক স্বাভাবিক গুণে ভালবাসিয়া থাকি তাহা হইলে সেই ভালবাসাও ঠিক হয় নাই। কারণ এই গুণ নিষ্কলঙ্ক ও সুবিশুদ্ধ নয়। ইহার প্রতি স্তরে স্তরে স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে। তবে কাহাকে ভালবাসি? তাই নির্জ্জনে একাকী নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় বসিলেই মনে হয়, আমার ভালবাসায় বিষ উৎপত্তি হয় কেন? শোনা যায় ভালবাসা স্বর্গের সুখ ও অমৃত অপেক্ষাও প্রীতিদায়ক, আর এই ভালবাসায় বিষ উদ্গীরণ করে কেন? তবে কি আমারই ভালবাসায় ভেজাল আছে, না যাহাকে ভালবাসিতে যাই তাহারই ভালবাসা খাটি নয়? নিশ্চয়ই কাহারও মধ্যে গোলমাল আছে। নতুবা সমানে সমান মিলিয়া এক হইয়া যাইত ইহা স্বতঃ সিদ্ধ কথা। আবার ভাবিয়া দেখি, তাহাই বা কেমন করিয়া হয়; আমার ভালবাসা খাটি হইলে ত অন্যের ভেজালে আমার খাটি জিনিষ নষ্ট করিতে পারিত না। এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে একদিন শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীনবদ্বীপ লীলায় পড়ুয়াগণকে উপদেশের কথা মনে পড়িল।

"সর্ব্বদেহে ধাতুরূপে বৈসে কৃষ্ণ-শক্তি।
তাহা সনে কর স্নেহ তাহানে সে ভক্তি॥" শ্রীচৈঃ ভাঃ

এইবার যেন কতকটা চমক ভাঙ্গিল বলিয়া বোধ হইতেছে। তাই নগণ্য ভাবের উপলব্ধি তত্ত্বজ্ঞানী, পিপাসু পাঠক মহোদয় গণের গোচর করিলাম। ভালমন্দ বিচার করিয়া যিনি ইহার উচ্চতর মীমাংসায় উপস্থিত, তাঁহার সেই মীমাংসা ভক্তিতে পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত রহিলাম। ধৃষ্টতা ক্ষমা করিয়া জানাইলে বাধিত হইব।

মাতা পুত্রকে, স্ত্রী স্বামীকে, স্বামী স্ত্রীকে, ইত্যাদি; জড় জগতে পরস্পর আত্মীয়ভাবে পরস্পরকে ভালবাসে। কিন্তু এই জড়দেহের চৈতন্যরূপী পরমাত্মা শ্রীভগবান যখন দেহ হইতে অন্তর্ধান করেন, তখন জড়দেহ জড়ত্বই প্রাপ্ত হয়। যাহাকে আমরা নাম ধরিয়া ডাকি, সে বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও আর ডাকের জবাব দেয় না। পঞ্চভূতের বিকার প্রাপ্ত সেই চন্দন ভূষিত দেহটাকে ভ্রমে যাহাকে আলিঙ্গন চুম্বন দিয়া পরম যত্ন সহকারে পরম আত্মীয় মনে করি—

রাছে; সেই দেহের অবস্থা ঘৃণা-করে, ভয় করে, তারপর পোড়ায় পুতিয়া রাখে। অথবা জলে ফেলিয়া দেয়। জড়দেহের সঙ্গে সঙ্গেই জড় সম্বন্ধ ফুরাইয়া যায়। থাকে কেবল কিছুদিন ভ্রমাত্মক মায়ার শোক কান্না।

ইহার কারণ কি? এতদিন মাতা কাহাকে কোলে নিয়া দুধ দিলেন! কাহাকে ক্ষুধায় অন্ন, কান্নায় সান্ত্বনা, রোগে ঔষধ, শ্রান্তিতে বাতাস দিলেন। স্বামী স্ত্রী পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া, কাহার জন্য (স্বামী স্ত্রীর ভরণ পোষণের জন্য, স্ত্রী স্বামীর সেবার জন্য) এত দুঃসহ দৈহিক মানসিক জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। একটু সূক্ষ্ম ভাবে খুঁজিতে গেলেই চৈতন্যরূপী পরমাত্মা শ্রীভগবান ব্যতীত আর কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রকারান্তরে পুত্র, ভাবে স্বামীরূপে শ্রীভগবানেরই সেবা হইল। এবং ইহাও জানা গেল যে, এতদিন এই রক্ত পূজ সমন্বিত অস্থি মংস পিণ্ড জড় দেহটাকে ভালবাসিয়া সেবা করা হয় নাই। যাঁহাকে ভালবাসিয়া এত যত্ন করা হইয়াছে তিনি বলিয়া গিয়াছেন। শুধু মায়া ভ্রমান্ধকারে পড়িয়া এই শরীরটাকেই ভালবাসি মনে করিয়াছি। যদি শরীরের সঙ্গেই প্রকৃত ভালবাসা হইতে পারিত, তবে আর মৃত শরীর ফেলিয়া দিতাম না। যখন শরীর ক্ষণভঙ্গুর অচিরস্থায়ী তখন আর সেই ভ্রমান্ধকার সমন্বিত মায়ার ভালবাসা স্থায়ী হইবে কিরূপে? এখন ইহাই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, সর্ব্ব দেহে বিরাজিত দেহের মূল ধাতুরূপী পরমাত্মা শ্রীভগবানকে ভাল বাসিতে শিখিলে, আর সেই ভালবাসা নষ্ট হইতে পারে না। হিংসা দ্বেষ ঘৃণাত্মক আপন পর বোধ মায়ার ছায়া ভালবাসার পবিত্র আলোতে বিদূরিত হইয়া নিজ জন জ্ঞানে সকলকে সমভাবে ভালবাসার চিহ্ন স্বরূপ আলিঙ্গন দিতে ইচ্ছা হয়। এমন দিন কবে হইবে?

দীন শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন

জ্ঞান যোগ

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে জানিবার চেষ্টা আমাদের প্রবল। যার যত প্রবল, তাই তত জ্ঞান সঞ্চয়ের সুবিধা। না জানা অর্থই অজ্ঞানতা। জানা অর্থই জ্ঞান। 'জ্ঞ' ধাতুর এই জানাজানির মধ্যে বিশ্বের ও বিশ্বের বাহিরের কল্পিত ও বাস্তব, অন্তর ও বাহ্য জগতের অস্তিত্ব। বিষয়ের সঙ্গে মনের সম্বন্ধে ভাব

সঞ্চার হয়; ভাব হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে বিচার, বিচার লইতে তর্ক-বিতর্ক ও নিষ্পত্তি হয়। আবার ভাব হইতে ইচ্ছা, ইচ্ছা হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে জ্ঞান পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত হয়। বিশ্বের এই বিপুল সমুদ্রে জ্ঞান-মাঝি হাল ধরিয়া বসিয়া আছেন। জ্ঞানের অস্তিত্ব লোপ পাইলে বিশ্বের অস্তিত্ব ব্যক্তিত্বের বাহিরে আসিয়া পড়ে। জ্ঞান সরোবরে বিবেক-হংস নিবৃত্তি সলিলে ডুবিয়া মরিয়া মুক্তির স্বর্গে চলিয়া যায়।

জ্ঞানের যোগে আত্মার যোগ। আত্মা জ্ঞানের ভিত্তি, জ্ঞানের মন্দির, জ্ঞানের আধার। আত্মা হইতে জ্ঞানশক্তি স্ফূর্ত্ত। মস্তিষ্ক তাহার দেব মন্দির, মন তাহার অনুগত সেবক, চিত্তবৃত্তি তাহার অনুশীলনের উপাদান সংগ্রহকারী। পরমাত্মার প্রতিবিম্বে বহির্ম্মুখী জ্ঞান মনের সাহায্যে প্রকৃতির দ্বারে-দ্বারে জ্ঞানযোগ প্রচার করিয়া বেড়ায়। যাহা দেখি, যাহা শুনি, যাহা বুঝি, যাহা ভাবি, যাহা করি, সবই ত অফুরন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারের উপাদান। এই ধনে আমরা সকলে ধনী। এ ধনও অফুরন্ত। একটু কষ্ট করিয়া কুড়াইয়া লইলেই হয়। জ্ঞানধন অমূল্য অথচ মূল্য দিয়া কিনিতে হয় না। বিদ্যাপণ্যের বাজার বসিয়াছে বটে, বিদ্যাভ্রমে লোকে অবিদ্যাকেই ঘরে নিয়া পূজা করিয়া মাথা কুটিয়া মরিতেছে। বিদ্যা স্বয়ং স্বরস্বতী, বীণাপাণি বাগ্‌দেবী জ্ঞানের তিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী, কার কত পয়সা আছে যে, জ্ঞানকে সে পয়সা দিয়া কিনিয়া কেনা গোলাম করিয়া রাখিতে পারে? জ্ঞান অমূল্যনিধি, কহিনুরের চেয়ে লক্ষগুণে মূল্যবান জ্ঞানের একবিন্দু। সেই জ্ঞান কিনিয়া লইবে, এত কুবেরের ভাণ্ডার মর্ত্ত্যের কৃষিশিল্প বাণিজ্যে গড়িয়া ওঠে না। তবে কেনা বেচা হয় কেন? জগৎ এখন বৈশ্যজীবী। কিন্তু এ যেন জ্ঞান আজই ব্যভিচারে যোগভ্রষ্ট হইয়াছে, আজই যেন জ্ঞান-যোগ জ্ঞান-বিয়োগে পরিণত হইয়াছে। জ্ঞানের এ ব্যভিচার ছিল না কবে? অতীত হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত এই যে কালপুরুষের অফুরন্ত ঘনান্ধকার বিশ্বৎসমূর্ত্তি, এর ব্যভিচারী নরনারীর দেহ ও মনোমন্দিরে জ্ঞান দেবতা চিরদিনই অভিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

মানুষের এই যে ব্যভিচারী জ্ঞান, এ জ্ঞান তাহার সত্যের জ্ঞান নহে, আত্মার জ্ঞান বা বিবেকের জ্ঞান নহে, এ তাহার ইন্দ্রিয়ে জ্ঞান। ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান ব্যভিচারী। কিন্তু আত্মার জ্ঞান ও আশ্চর্য্যরূপে ব্যভিচারী হয়।

আত্মার এক দশমুখী ইন্দ্রিয় রন্ধ্রে পাপের বিরাট পথে মন সহস্র রুদ্ধ, সাধ্য অনুষ্ঠানেও নিরয়গামী হইতে চাহে। এই যে বিষয় ও মনের সংসর্গে কামনার জন্ম, এ বড় সার্থক জন্ম। কামনার পশুধর্ম্মে ইন্দ্রিয় আত্মার সেবায় রঞ্জিত হইয়া পদে পদে লাঞ্ছিত হয়, তবুও তাহার লাঞ্ছনায় অতৃপ্ত হয় না। কাম ও রতির মিথুন ধর্ম্মে প্রকৃতি ও পুরুষ বাসনার আসক্তি জ্বলিয়া ছাই হইয়া গেল, ইন্দ্রিয় নিরোধ করিল, আত্মায় নিবিষ্ট হইল;— কিন্তু একবার ফাঁক পায় ত ইন্দ্রিয় রন্ধ্রে মনকে ইন্দ্রিয়াসক্ত করিয়া আত্মাকে নিরয়গামী করিয়া মনই আবার অনুতাপে দগ্ধ হইবে। জ্ঞান যোগে এই যে জ্ঞানের বিয়োগ, এ বিয়োগের সংযোগের পথও ইন্দ্রিয় নিরোধ চিত্তবৃত্তির নিরোধ। যোগধর্ম্মে অন্তর্মুখী জ্ঞানই এই পশুশক্তির তেজ নষ্ট করিতে পারে।

জ্ঞান সাকার নিরাকার দুই-ই। জ্ঞান যদি সাকার না হইত, তাহা হইলে জ্ঞানবাপী কূলে অনেক তৃষ্ণার্ত্ত পথিকই সাকার জলের অভাবে পিপাসায় নিঃসন্দেহে প্রাণ ত্যাগ করিত। সাকার জ্ঞানের মূর্ত্তি পুরুষকারের মূর্ত্তি। জগতের উন্নতিকামী ব্যক্তি ও জাতি এই সাকার জ্ঞানে কি না অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছে। প্রাসাদের পর প্রাসাদ গড়িয়া শিল্পের পর শিল্প রচিয়া, বিশ্বের বাণিজ্য তরি আশার সমুদ্রে ভাষাইয়া, বিশ্বের ঐশ্বর্য্য লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়া, বিশ্বের শ্মশানে নরমুণ্ডের খেলা খেলিয়া সাকারজ্ঞান কত আত্মপরীক্ষা দিয়া বাহাদুরী লইতেছে। জ্ঞানের এ সাকার মূর্ত্তিকে কত মহাপুরুষের জ্ঞানবিজ্ঞান সাকার বিগ্রহের মত ভক্তের পূজা পাইয়া আসিতেছে। আবার এই অনুভবের নিরাকার চিন্তার নিরাকার জ্ঞান, ধ্যান, ধারণার নিরাকার জ্ঞানে কত জ্ঞান শক্তি অক্ষয় ও অব্যয় হইয়া আছেন। সাকার ও নিরাকার জ্ঞানে সাকার ও নিরাকার ঈশ্বর উপাস্য জ্ঞানমূর্ত্তি হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। সফল ও বিফল জ্ঞান ব্যক্তিত্বের শক্তির উপর নির্ভর করে। যে জ্ঞান যার কাজে লাগে না, সে জ্ঞান তার বিফল জ্ঞান। সফল জ্ঞানে বিশ্বে পণ্ডিত সভায় জ্ঞানীর আসন প্রতিষ্ঠিত। জগৎ উন্নতি পরে অগ্রসর হইতেছে। কত ব্যক্তিত্ব সফল জ্ঞানে আত্মতৃপ্ত জনপ্রিয়, সমাজ প্রিয়, জাতিপ্রিয়। আর কত ব্যক্তিত্বে বিফল জ্ঞানে আজন্ম অতৃপ্ত জনগণের অশ্রদ্ধায় অশান্তিময় জীবন যাপন করে আবার কত ব্যক্তিত্বের আজ যাহা বিফল জ্ঞান, কাল তাহা সফল জ্ঞান।

আবার কাল যাহা সফল জ্ঞান, যুগযুগান্তের পরীক্ষায় তাহা বিফল জ্ঞানে পরিণত।

জ্ঞানী অমর। জ্ঞানীর আত্মা অনন্ত কাল ধরিয়া জাতির শক্তি সঞ্চার করে। জ্ঞানের ধ্বংস নাই বলিয়া জ্ঞানীরও ধ্বংস নাই। জ্ঞান সত্য, ধ্রুব, জ্ঞান সনাতন। জ্ঞানই বেদ, বেদই অপৌরুষেয়। এই জ্ঞান যোগে ভারতের সিদ্ধি লাভ হইয়াছিল। আর আজ অজ্ঞান-যোগে ভারত অধঃপতিত হইয়া বসিয়াছে।

অজ্ঞান যোগে নারীশক্তি সুপ্তা, অজ্ঞান যোগে কোটী কোটী নরনারী মানবের জ্ঞান মন্দিরে অস্পৃশ্য। আর ভাক্ত জ্ঞান-যোগে অনুকরণে, পরকীয় ধর্ম্মের জাতি আমরা স্বধর্ম্মত্যাগী। ভাক্ত জ্ঞানযোগে আমরা ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষায় বঞ্চিত ভ্রষ্টাচারী, নৈতিক আদর্শ পথে আমরা সৎ ও সতীর মর্য্যাদা ও সংযমজ্ঞান হীন। শিক্ষার নামে শুধু অক্ষর পরিচয়ে ও ভাব পরিচয়ে ভাক্তজ্ঞানী, শুষ্কজ্ঞানী। জ্ঞান তখনই শুষ্ক, যখন তাহা স্বধর্ম্মে সরস নহে, সংযমে বিশুদ্ধ নহে, সৎকর্ম্মে আত্মশক্তি বিশিষ্ট নহে।

জ্ঞানের সঙ্গে মনের চেতনার নিকট সম্পর্ক। মন যদি না জাগিল, প্রাণ যদি না সারা দিল, আত্মা যদি না স্বাধীন হইল, তবে সে শিক্ষা সে জ্ঞান, সমাজের কি উপকারে আসিবে ?

জ্ঞান নরনারীর অমূল্য সম্পত্তি। পুরুষ জ্ঞান বৃক্ষের ফল আগে খায় নাই, নারীই আগে খাইয়াছে। জ্ঞান কল্পতরু মূলে নরনারী ফলের আশায় সমাসীন। সমাজ ও ধর্ম্মের বেড়া দিয়া যদি পারত তাহাদের গন্তব্য পথ সুপথ করিয়া দাও, অনর্থক বেড়াজালে ঘিরিয়া তাহাদের ফললাভে বঞ্চিত করিও না।

জ্ঞানই কর্ম্মের আত্মা, শক্তি ও মূলীভূত উপাদান। জ্ঞান হারা কর্ম্ম জগতের শক্তিকে অদৃষ্ট পথে লুকাইয়া রাখে। জ্ঞান আর কর্ম্ম আত্মশক্তির দুই দিক। জ্ঞান ছাড়া কর্ম্ম ক্ষীণ শক্তিতে কাজ করে। জ্ঞান ছাড়া কর্ম্ম কামিনী-কাঞ্চনের ভোগের পথ সহজ করিয়া দেয়। কর্ম্ম সেইখানেই কল্যানীয়, যেখানে জ্ঞান দেবতা উপাস্যও বন্দনীয়।

জ্ঞানের আমরা প্রভু নই, আমরা সবাই জ্ঞানদাস। জ্ঞান আমাদের আত্মার অন্তর্হিত চৈতন্য শক্তি। জ্ঞান আমরা জন্ম দেই না, আবিষ্কার করি না, জ্ঞানের আমরা চরণ ধুলি মাথায় লই মাত্র। জ্ঞানকে আমরা

স্পর্শ করি। জ্ঞান তখনই দেখা দেন, যখন জ্ঞানের আমরা যথার্থই ভক্ত হই। নির্ম্মল বুদ্ধিতে একান্ত অধ্যবসায়েই জ্ঞানের রাজ্যের সীমানায় পৌছানো যায়।

জ্ঞান অচঞ্চল। জ্ঞান গাম্ভীর্য্যে, বিদ্যায়, তপস্যায় সমৃদ্ধ। জ্ঞান শাশ্বত শক্তি, জ্ঞান নির্ম্মল, জ্ঞান ধ্রুব। জ্ঞানের রাজ্যে জাতি বিচার নাই, ধনীনির্দ্ধন জ্ঞানকে যে চায়, সেই পায়। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেম বিতরণে জ্ঞানের ছড়াছড়ি। জ্ঞানে পাপকে ঘৃণা করা যায় না। দর্শনের শেষ ফল জ্ঞান সাফল্য। জ্ঞানে ঈশ্বর ও জীব অভেদ। জ্ঞানে এই বিশ্বের প্রতি অণুতে সকলের সমান অধিকার।

জ্ঞান নিস্কাম। জ্ঞান জীবকে শিব বলিয়া প্রচার করিয়াছে। জীবও শিবের অভেদত্বই মায়ার ও বাসনার মুক্তির কথা। জ্ঞানই শুধু সমান সৃষ্ট। প্রকৃতি-পুরুষ জ্ঞানের জন্ম দিতে পারে না। ব্রহ্মের মানস পুত্র এই জ্ঞান।

জ্ঞান ও ভক্তি মূলতঃ অভেদ। ভক্তির মূলেও বিশ্বাস। বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল। কিন্তু ভক্তির বিচার সাঙ্গ হইয়াছে। বিচার শেষ না করিয়া ভক্ত হওয়া যায় না। জ্ঞান কিন্তু বিচার করে। কিন্তু প্রকৃত ভক্ত ও জ্ঞানী মূলতঃ এক। প্রকৃত জ্ঞানীই যথার্থ ভক্ত।

জ্ঞান মুক্ত সৃষ্টির বাহিরে। সৃষ্টি মুক্তেচ্ছু জ্ঞানীর জন্য নহে। মুক্তি সৃষ্টির পথ রুদ্ধ করিয়া জীবকে সংসার বন্ধন মুক্ত করিতেছে।

বহির্ম্মুখী জ্ঞান সৃষ্টির পথে সহায়তা করে, কিন্তু সৃষ্টি করে না। সৃষ্টি করে কাম ও রতি, জ্ঞান নহে। জ্ঞানযোগের এই বন্ধন মুক্তিই শ্রেষ্ঠ যোগ।

জ্ঞানই নির্ভীক, সজীব আত্মনির্ভরশীলের পুরুষকার। জ্ঞানই মুক্তাত্মার অভয় বাণী। জ্ঞান স্বয়ং ব্রহ্ম স্বরূপ, এক এবং অদ্বিতীয়।

শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈষ্ণব-ব্রত-তালিকা

—:*:—

(১৩২৯ বঙ্গাব্দ মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র)

কলিকাতা "শ্রীভাগবত-ধর্ম্মমণ্ডল" হইতে প্রতি বর্ষেই বৈষ্ণব-ব্রত-তালিকা প্রকাশ হয়। আমরাও যথা সময় উহা ভক্তিতে ছাপাইয়া থাকি। এবার নানা কারণে যথা সময় উহা আমাদের হস্তগত হয় নাই, কাজেই প্রকাশ করিতে পারিনাই। বর্ত্তমানে আমরা উহা পাইয়াছি। যে কয় মাস গত হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিয়া আর লাভ নাই, সেইজন্য বর্ত্তমানে পৌষ ও মাঘ মাসের ভক্তি মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের বৈষ্ণব-ব্রত-তালিকা প্রকাশ হইল।

(মাঘ)

বসন্ত পঞ্চমী — শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্চ্চন	৮ই সোমবার
মাকরী সপ্তমী, শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব উৎসব	১০ই বুধবার
ভৈমী একাদশী	১৪ই রবিবার
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব উৎসব	১৬ই মঙ্গলবার
একাদশী	২৮এ রবিবার

(ফাল্গুন)

শ্রীশ্রীশিবরাত্রি ব্রত	২রা বুধবার
একাদশী	১৫ই মঙ্গলবার
আমর্দ্দকীব্রত শ্রীশ্রীগোবিন্দার্চ্চন	১৬ই বুধবার
শ্রীশ্রীগৌর পূর্ণিমা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব — শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা ও ৪৩৮ চৈতন্যাব্দ আরম্ভ	১৯এ শনিবার
একাদশী	২৯এ মঙ্গলবার

(চৈত্র)

শ্রীশ্রীরামনবমী	১২ই সোমবার
একাদশী	১৫ই বৃহস্পতিবার
শ্রীশ্রীবলদেবের রাসযাত্রা	১৮ই রবিবার
একাদশী	২৮এ বুধবার।

আত্মা

(অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ লিখিত।)

জীবসাধারণের মধ্যে মানুষ এক স্বতন্ত্র জাতীয় জীব, একথা বলা যাইতে পারে। চিন্তাশীল মনীষীরা জগতের চরম তত্ত্ব এক, ইহা স্বীকার করিয়াছেন। মানুষ স্বতন্ত্র জাতীয় হইলেও মানুষের চরম তত্ত্ব যে জীবত্ব, এ কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। আমরা যদি একেবারেই মানুষের আবির্ভাব-তত্ত্ব বুঝিতে যাই, তাহা হইলে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না, সুতরাং প্রথমে জীবের আবির্ভাব-তত্ত্ব বুঝিতে হইবে।

সাধারণতঃ বলা হয়, পৃথিবীতে চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ, এই তিন প্রকার পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতে বুঝিতে হয়, উদ্ভিদ চেতন নহে, অচেতনও নহে। কিন্তু চেতন না হইলেও অচেতন ও অচেতন না হইলে চেতন হইতে হয়; সুতরাং উদ্ভিদ হয় চেতন, না হয় অচেতন। তাহা হইলে পৃথিবীতে দুই প্রকার পদার্থ আছে বলিতে হয়। আপাততঃ দেখা যায়, কি চেতন, কি অচেতন, সকল পদার্থই পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অচেতনদিগকে ভৌতিক পদার্থ বলিব, চেতনদিগকে জীব বলিব। ভৌতিক পদার্থসকল পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা স্বীকার করা সহজ ও স্বাভাবিক। কিন্তু জীব পৃথিবী হইতে কেমন করিয়া উৎপন্ন হইল? পৃথিবী হইতে জীবের উদ্ভব হইয়াছে স্বীকার করিলে বুঝিতে হইবে, জীব পূর্ব্ব হইতে বীজরূপে পৃথিবীর মধ্যেই নিহিত ছিল। কিন্তু আমরা সাধারণতঃ পৃথিবীকে ভৌতিক বলিয়া জানি, ভৌতিক পদার্থমধ্যে জীববীজ কেমন করিয়া থাকিতে পারে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক নহে। কিন্তু আমরা জীবকে অন্য কোথাও হইতে আসিতে দেখি না, সুতরাং এই বিরাট প্রশ্নের দুইটি উত্তর হইতে পারে। ১ম।—জীবের চৈতন্যাংশ (পৃথিবীস্থ জীবে ভৌতিকাংশও আছে) ভৌতিক পদার্থনিচয়ের বিকার-সম্ভূত। ২য়।—পৃথিবী শুধু ভৌতিক নহে, সাধারণতঃ পৃথিবীর স্বরূপ সম্বন্ধে যে ধারণা আছে, বস্তুতঃ পৃথিবীর স্বরূপ তাহা হইতে স্বতন্ত্র। জীব যদি পৃথিবী হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে পৃথিবীরও চৈতন্য আছে, স্বীকার করিতে হইবে।

১ম।—যদি পৃথিবীর চৈতন্য থাকা স্বীকার করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে চৈতন্যের ভৌতিক কারণ স্বীকার করিতে হয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা যে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া তত্ত্বের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। জীবতত্ত্ব বা প্রাণবিদ্যা (Biology), প্রকৃতিবিজ্ঞান বা পদার্থবিজ্ঞানের (Psysical sience) ভিত্তির উপর গঠিত।

প্রকৃতিবিজ্ঞান ও জীবতত্ত্ব, যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে, মনস্তত্ত্ব সেই সকল সিদ্ধান্তের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে ভৌতিক পদার্থ ও চৈতন্যের একই কারণ। বিজ্ঞান তাহাকে শক্তি বলে। ভৌতিক পরমাণু সেই শক্তির পরিণাম। ভৌতিক পরমাণু সকলের পরস্পর আকর্ষণ বিকর্ষণের কার্য্য হইতে কোন অজানিত ভাবে জীবন উৎপন্ন হয়। জীবনী শক্তি ভৌতিক পদার্থসকলের উপর কার্য্য করে, ভৌতিক পদার্থের মধ্যে পরিণাম ঘটায় ও তাহাদিগকে নূতন আকারে পরিণত করে এবং নিজের কার্য্যে পরিচালিত করে। শেষে মনের উৎপত্তি হয়। মন ভৌতিক জগৎ ও জীবনী শক্তিকে আপন কার্য্যে পরিচালিত করে, ফলে জ্ঞানের উদ্ভব হইয়া থাকে। কথাগুলি আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলা যাক। ভৌতিক জগৎ ভৌতিক পরমাণুর সমষ্টি। পরমাণু-সকল শক্তিজাত। যে শক্তিতে ভৌতিক শক্তি (Physical force) বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ পরমাণুসকলের মূলে শক্তি বুঝিতে হয়। বিশ্বব্যাপী শক্তির কতকটা পরমাণুতে পরিণত হইলে, তাহা পরস্পর আকর্ষণ বিকর্ষণের ধর্ম্মাবলম্বী হয়। আকর্ষণ বিকর্ষণের ক্রিয়া হইতে পরস্পরের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ হইতে থাকে। পরস্পরের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে পরমাণুসকল ক্রমাগত পরিণাম প্রাপ্ত হইতে থাকে। এইরূপে ক্রমশঃ ভৌতিক জগতের সৃষ্টি হয়। ক্রমশঃ জীবনী শক্তির আবির্ভাব হয়। জীবনী শক্তি ভৌতিক শক্তিরই রূপান্তর মাত্র। জীবনী শক্তি ভৌতিক পরমাণুসকলকে আপন কার্য্যে নিযোজিত করিয়া, তাহাদের উপর আর এক প্রকার পরিণাম ঘটায়। তাহাতে সজীবতার কেন্দ্রস্বরূপ জৈবনিকের (Proto Plasmic Cells) সৃষ্টি হয়। ইহারা ভৌতিক জগৎ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া পরিপুষ্ট হয় ও বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে। এই জৈবনিক বা Cell হইতে জীবনের প্রথম আরম্ভ হইয়া থাকে। বিভিন্নাংশাত্মক জটিল জীবদেহ, জৈবনিক সকল হইতে বিনির্গত পদার্থ দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ দেহের কাষ্ঠাংশ ও শিরাসমূহ, ইতর জীব ও মনুষ্যের শরীরস্থ অস্থি, শিরা ও মাংশপেশী, জৈবনিক ও তাহাদের নির্য্যাস-সম্ভূত। The most complex (of living things) are built up of cells and materials sereted from, or produced by modification of cells (as wood and vessels in plants, and bone, vessels, and muscle in animals and man) Analytical Psychology. সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নতম শ্রেণীর জীব-সকল এক একটি স্বতন্ত্র জৈবনিক। ইহারা ক্ষুদ্রতম হইলেও এক একটী সম্পূর্ণ উদ্ভিদ বা প্রাণী। এক বিন্দু ঘোলা জলে সহস্র সহস্র সংখ্যায় ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্রমশঃ

ভক্তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

(২১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩২৯ সাল)

শ্রীবৃন্দাবন।

এই কি সেই গোলকের প্রতিচ্ছবি মধু-বৃন্দাবন? যেখানে চিন্ময় আনন্দধামের লীলাময় বিকসিত! যেখানে ভগবান গোলক বিহারী গোলকের ভক্তবৃন্দ ল'য়ে প্রেমানন্দ-লীলা প্রকটিত করিতে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। প্রেম ব্যতীত আনন্দ নাই, আনন্দ ব্যতীত প্রেম নাই, এই মহাসত্যের প্রচার-কল্পে স্বয়ং প্রেমময় মলিন মর্ত্তে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। যেখানে নরনারী প্রত্যেকেই গোপগোষ্ঠী! তরুলতা, কুঞ্জকানন, এমন কি প্রত্যেক ধূলিকণা পর্য্যন্ত প্রেমানন্দের পবিত্র নিদর্শন।

এই কি সেই মধু-বৃন্দাবন? যেখানে মদন-সহচর বসন্ত সদাই বিরাজমান! শ্যামল শস্যভূমি, স্নিগ্ধ রবিকরোজ্জ্বল; কুমুদ, কহ্লার, নীলোৎপল, নদী সরোবরে শোভমান। অগাধ সলিল হৃদবক্ষে বিলোল বিক্ষিপ্ত বীচি মালা, ঝরনার জল প্রবাহে মনোহারী। যেখানে কাননভূমি বিচিত্র মনোরম লতাগুল্মে সুশোভিত, মনোমদ গন্ধে আমোদিত; কোকিল কুজনে, ভ্রমর গুঞ্জনে, [illegible] নিঃস্বনে মুখরিত; ময়ূর ময়ূরীর নৃত্যভঙ্গে চমকিত; আনন্দ উৎসবের [illegible] কোলাহলে পরিপূরিত; পুণ্যপ্রেমের প্রীতি প্রস্রবন, শান্ত-শীতল সমীরণ প্রবাহিত।

এই কি সেই স্বর্গের সুষমা-বিমণ্ডিত নন্দন-কানন-সদৃশ পদ্ম পলাশলোচন [illegible] লীলাক্ষেত্র মধুবৃন্দাবন? এইখানেই কি সেই মহৈশ্বর্য্যময় যোগাধীশ

নন্দদুলাল জ্বালামালাময় তীব্র দাবানল নির্ব্বাপণে দাবাগ্নি দুঃখ হ'তে গোপগণকে মুক্ত ক'রেছিলেন ? এইখানেই কি ভগবান বাসুদেব গোপবেশী প্রবল পরাক্রান্ত প্রলম্বাসুরের দর্পচূর্ণ ; সাধু পালন ও পাতকীদলন উদ্দেশে কালনা-কালিয় নাগ দমন, ইন্দ্রের শাপানল হ'তে মানবগণের উদ্ধার-কল্পে গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ ক'রেছিলেন ?

এই কি সেই মধু-বৃন্দাবন ! যেথানে রাধিকার প্রাণধন, মদনমোহন শ্যামসুন্দর রাধাশ্যাম কুঞ্জে ফাল্গুনীচাঁদের জ্যোছনা-জোয়ারে গোপগোপীগণ সনে হিন্দোলোৎসবে মাতিয়াছিলেন ; যে আবীর কুঙ্কুমে, তমালতল, যমুনাজল সব লালে লাল হইয়া গিয়াছিল। যার মানকুঞ্জে মান-ভঞ্জনচ্ছলে শ্যামসুন্দর নটবর চিৎশক্তিময়ী পরমারাধ্যা বৃষভানুসুতা শ্রীরাধার চরণতলে মাথা লুটাইয়াছিলেন। শারদ পৌর্ণমাসীর শুক্ল রজনীতে যমুনার শ্বেত সৈকতে রসরাজ রাসবিহারী রাসলীলায় কৃষ্ণপ্রেমার্থিনীগণের মনোভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন।

এই কি সেই মধু-বৃন্দাবন ? যেথানে গোপালবেশী রাখালরাজ গোচারণ করিতে আসিয়া ভাণ্ডীর বটের সুশীতল স্নিগ্ধ ছায়ায় গোপবালকগণের সহিত বিশ্রামলাভ করিতেন ; যার কলকলনাদিনী নীলসলিলা যমুনাপুলিনে বংশীবাদনে সেই মদনমোহন বংশীধারী গোপীগণের প্রাণে উজান বহাইতেন ; কেলি-কদম্বমূলে বসিয়া বিবসনা নারীগণের লজ্জা কৃষ্ণার্পিত করেছিলেন ; যার পবিত্র তুলসীতলে মৃদঙ্গ মন্দিরা সনে মধুর হরিনামামৃত গীত হইত। যে নাম মাধুরীতে গুণমণি গোরা প্রেমে মাতোয়ারা হ'য়ে "কোথা কৃষ্ণ" "কোথা কৃষ্ণ" ব'লে গগন পবন ধ্বনিত করেছিলেন।

এই কি সেই প্রকৃতি পুরুষের মিলনক্ষেত্র মধু-বৃন্দাবন। এথানেই কি পীত বসন বনমালী বাঁশীছেড়ে অসিধরে নেচেছিলেন ! এথানেই কি কৃষ্ণবিরহিনী কলঙ্কিনী রাধা সহস্রছিদ্র কলসী যমুনার পূতঃসলিলে পূর্ণ ক'রে জগৎ সমক্ষে আপনার সতীত্বের মহিমা ঘোষণা করেছিলেন।

হে মধুবৃন্দাবন ! তোমায় নমস্কার, তুমি লীলাময়ের লীলাস্থলী বলিয়া আজ গৌরবে গৌরবান্বিত, পুণ্যভূমি বলিয়া খ্যাত। কৃষ্ণের চরণ কমল পরশে তোমার ধূলিকণা পর্য্যন্ত পবিত্র ; তাই তোমায় মনে পড়িলে, রাধাশ্যামকে মনে পড়ে, আর মনে পড়ে সেই ভক্তিমতী শুদ্ধাচারিনী গোপীগণের অনন্য প্রণয়ী প্রেম।

হে মধুবৃন্দাবন ! তোমার অঙ্গে কৃষ্ণের অতীত গৌরব কাহিনী অঙ্কিত।

তুমি সেই পুণ্যময়, মধুময় শ্রীহরির সুখস্মৃতি বক্ষে ক'রে, যুগযুগান্তর ধ'রে সাক্ষী-রূপে দাঁড়াইয়া আছ। তোমার যশোমাল্য চন্দনাঙ্কিত ক'রে দ্বাপরের মহাকবি কৃষ্ণপরায়ণ ব্যাসদেব আজ অজর অমর হ'য়ে গেছেন, গোবিন্দভক্ত জয়দেব "দেহি পদপল্লব মুদারম্" বলতে বলতে আত্মহারা হ'য়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর রায় চৌধুরী।

বিশ্বরূপের সঙ্গীত (৬)

১০।—ঋতু বসন্ত সময়, বিহরে গোরা রায়।
মাতি আনন্দে, নানাফুল গন্ধে, অলিকুল আকুল ধায়।
বহে মৃদু মন্দ সুগন্ধ সমীরণ কোকিল পঞ্চম গায়॥
গোরা-গুণে প্রাণ মাতায়॥
নব নব পত্র, শোভে বিচিত্র, নব তরু নবীন লতায়।
আম্র-মুকুল ডালে বসিয়া মধুর রোলে শুক সুকণ্ঠ ফুলায়॥
গোরা-গুণে প্রাণ মাতায়॥
ফুল বনে যুবতী মঙ্গলগীতি গাহি সারারাতি পোহায়।
সুললিতছন্দে রাগ বসন্তে তাল সুযন্ত্র বাজায়॥
গোরা-গুণে প্রাণ মাতায়॥
তাল তরঙ্গে, সুরধুনীরঙ্গে, কলকলনাদ শুনায়।
বিশ্বরূপ-প্রভু নদীয়া পুরন্দর বিহরে বসন্তলীলায়॥
শোভা কিবা হের নদীয়ায়॥

১১।—(কিবা) শোভে বৃন্দাবন নবীন বসন্তে।
শ্যামকিশোর শুভ বঙ্কিমঠামে, রাই সুধাংশু-বদনি লই বামে,
বিহরে নিকুঞ্জ কুটির নিজধামে, মোহে মদনদুরন্তে॥
অলিকুল গুঞ্জরে কুঞ্জবনে, কোকিল ঝঙ্কারে পঞ্চম তানে,
নৃত্য করে শিখি পুচ্ছপশারি ঘেরি রাধা সহ রাধাকান্তে॥
রাগবসন্তে সুতাল সুযন্ত্রে, মিলায়ে সু-কণ্ঠ সুললিত সুছন্দে,
গীত নর্ত্তনে মুগ্ধ করে যত গুণবতীগণ গুণবন্তে॥
আপনা স্বরূপে বনকুঞ্জ গৃহে, বসন ভূষণে সাজি নিত্য দেহে,
গুরুরূপা সঙ্গিনী সঙ্গ চাহে দাস বিশ্বরূপ একপ্রান্তে॥

সম্পাদক

বস্তু-বিচার।

অষ্ট কুলাচল সপ্ত সমুদ্রা ব্রহ্ম পুরন্দর দিনকর রুদ্রা।
নত্বং নাহং নায়ং লোকঃ তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥

অষ্ট কুলাচল আর সপ্ত রত্নাকর। ব্রহ্মা পুরন্দর কিম্বা রুদ্র দিনকর॥
তুমি আমি এই বিশ্ব সকলই স্বপন। তবে কেন শোকে তুমি হওহে মগন॥

ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।
সত্যমেকং পরব্রহ্মং বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ॥

এই মায়া-কল্পিত নশ্বর জগতে অক্ষয় অব্যয় শ্রীভগবানই কেবল বস্তু। আর সকলই অবস্তু। মানব জীবনের একান্ত কর্ত্তব্য হইতেছে এই যে, বিচার দ্বারা অবস্তুতে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বস্তুকে লাভ করা; কারণ বস্তুকে দর্শন ও লাভ করিবার নিমিত্তই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতা। ব্রহ্মবস্তু লাভ ও সাক্ষাৎকারের অধিকার মানবজীবন ব্যতীত অন্য কোন জীবনেই ভগবান দেন নাই। তাই মানব জীবনকে শাস্ত্র সুদুর্লভ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মানব জন্ম কেবল আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন ও তদানুসঙ্গিক সুখ দুঃখ ভোগ করিবার নিমিত্ত অথবা কাম ক্রোধাদি রিপুগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া মায়া মোহিত চিত্তে কেবল ইন্দ্রিয় বৃত্তি চরিতার্থ করিতে ও অবস্তুকে বস্তুজ্ঞানে আমার আমার বলিয়া সংযোগে হর্ষ ও বিয়োগে বিষাদ প্রকাশ পূর্ব্বক জ্ঞানহীন পশুর ন্যায় এই সুদুর্লভ জীবনের পরিমিত আয়ু বৃথা নষ্ট করিবার নিমিত্ত নহে।

পরন্তু যাহাতে এই মানব জীবনের উদ্দেশ্য সুসাধিত হয় অর্থাৎ এই অনিত্য বা ক্ষণভঙ্গুর দেহে যাহাতে নিত্য বস্তু আত্ম-সাক্ষাৎকার হয়, তজ্জন্য যত শীঘ্র সম্ভব বিশেষ যত্নবান হওয়াই মানবের একান্ত কর্ত্তব্য ও বিশেষ প্রয়োজন। শাস্ত্র তাই উপদেশ করিয়াছেন যে—

"লব্ধা সুদুর্লভমিদং বহু সম্ভবান্তে,
মনুষ্য মদর্থমনিত্য মপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত নপতেদনু মৃত্যু যাবৎ,
নিঃশ্রেয়সায় বিষয় খলুসর্ব্বতঃ স্যাৎ॥" তাঃ—

বহুজন্মের পর এই সংসারে দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ হয়। এই মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া (ইহা অনিত্য হইলেও যদপি ইহাকে ভগবানের নাম ও লীলা,

গুণাদি শ্রবণ কীর্ত্তনরূপ উপাসনাতে যাপন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ইহাই পরমার্থপ্রদ হইয়া উঠে) কালের করাল কবলে পতিত না হওয়া পর্য্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র প্রকৃত শ্রেয়ঃ লাভ করিতে যত্নবান হওয়াই এই জীবনের চতুরতা ও শ্রেষ্ঠতা। বিষয়ভোগ সকল জন্মেই হইয়া থাকে কিন্তু মনুষ্য জীবনেই আমরা পরমার্থ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হই।

দারাপত্য, ক্ষেত্র বিত্তাদি জাগতিক সকল পদার্থই স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় অলীক এবং ভোগ সুখাদি বিদ্যুল্লেখার ন্যায় চঞ্চল ও অনিত্য। এই অলীক বস্তু সমূহ ও এই অনিত্য ভোগ সুখাদির জন্য অধর্ম্মাচরণ দ্বারা কাহাকেও ঠকাইয়া কিছু লাভ করা বা কায়মনোবাক্যে কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া অথবা এই অলীক বস্তু সমূহকে প্রকৃত বস্তু জ্ঞানে উহাদের উপর আস্থা প্রদর্শন করা ও উহাদের প্রতি অত্যাসক্তি প্রকাশ করতঃ নিত্য ও সৎবস্তু ভগবানকে বিস্মৃত হওয়া কদাচই মনুষ্য পদাধিরূঢ় মানবের পক্ষে চতুরতা বা শ্রেষ্ঠতা বলিয়া পরিগণিত নহে। স্বপ্ন দর্শনের পর নিদ্রা ভঙ্গ হইলে স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়কে স্বপ্ন দর্শন কারীর যেরূপ অলীক বলিয়া বোধ হয়, ইহ সংসারে ধনজন সমাগম ও সুখ দুঃখ ভোগাদিকেও তদ্রূপ অলীক জ্ঞানে উহাতে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক নিত্য ও সৎবস্তু ভগবৎ তত্ত্ব লাভের জন্য এই সুদুর্লভ অথচ সুলভ মনুষ্যজীবন যাপন করাই মানবের সারকর্ম্ম ও একমাত্র ধর্ম্ম। কারণ দয়াময় ভগবান ভগবৎ প্রাপ্তির নিমিত্তই এই মানব জীবনকে সকল প্রকার উপযুক্ত উপাদানে গঠিত করিয়া এই সংসারে পাঠাইয়াছেন। পরন্তু ভগবদ্দত্ত এই সকল উপযুক্ত বা প্রয়োজনীয় উপাদান সত্ত্বেও যে মানব অজ্ঞানান্ধতা বশতঃ বিপথগামী হয় তাহাকে শাস্ত্র আত্মঘাতী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; যথাঃ—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং,
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং,
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহাঃ"। ভা—

সমস্ত বাঞ্ছিত ফলের মূল স্বরূপ কোটি কোটি চেষ্টা দ্বারাও লাভের অযোগ্য, কিন্তু কোন অপূর্ব্ব ভাগ্য বশতঃ অনায়াস লব্ধ ; স্থাবর হইতে ভগবৎ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়েই পটুতর ; গুরুরূপে কর্ণধার সমন্বিত ; মৎকর্ত্তৃক অনুকূল বায়ু দ্বারা চালিত ; সংসার সমুদ্র উত্তরণের উপায় স্বরূপ অর্থাৎ নৌকা স্বরূপ এই মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হইয়াও যে মানব ভবসমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করে,

সে আপনাকে দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত করে। অতএব তাহাকে আত্মঘাতী বলিয়া জানিবে।

বস্তুতঃ অনিত্য বিষয়ে মজিয়া এই অপবর্গ সাধক মনুষ্য জীবনকে ব্যর্থ অর্থাৎ বৃথা নষ্ট করিলে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইতে হয় ও আত্মঘাতীরূপে পরিগণিত হইয়া পুনঃ পুনঃ অতি কঠোর সংসার যাতনা ভোগ করিতে হয়; তাই শাস্ত্র আবার বলিয়াছেন :—

"স বঞ্চিতো বতাত্মধ্রুক্ কৃচ্ছেন মহতাভুবি।
লব্ধাপবর্গ্যং মানুষ্যং বিষয়েষু বিষজ্জতে॥" ভা—

অর্থাৎ অতি কষ্টে বহু ভাগ্যের বলে পৃথিবীতে মোক্ষ সাধক মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি বিষয়েতে আসক্ত থাকে, হায়! সেই ব্যক্তি আপনার অনিষ্ট আপনিই করে, এবং তাহার জন্মলাভ নিরর্থক।

শাস্ত্র-আরও বলিয়াছেন :—

"মহতা পুণ্য পণ্যেন ক্রীতেয়ং কায়নৌস্ত্বয়া।
পারং দুঃখোদধের্গন্তুং তর যাবন্নভিদ্যতে॥" (শান্তিশতকম্।)

অর্থাৎ বহু বহু জন্মের সঞ্চিত মহৎপুণ্যরূপ বহু পণ্য দ্বারা ক্রয় করিয়াছ যে মানব দেহরূপ এই তরণী, ইহা জীর্ণ, শীর্ণ ও ভগ্ন না হইতে হইতেই এই শোক দুঃখাদি সঙ্কুল ও ভীষণ নক্রাদি জলজন্তুতে পরিপূর্ণ অপার ভব পারাবার পার হইয়া, সর্ব্বভয়হারী হরির অভয় পাদ পদ্মে আশ্রয় গ্রহণ কর।

অসার মায়িক পদার্থ সমূহে আস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক, তাহাদের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া প্রকৃত মানব জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে বিরত থাকা কেবল দুঃখ ভোগের নিমিত্ত বই আর কিছুই নহে। অতএব ইহা স্থির নিশ্চয় যে, যে যে বস্তু সদ্রূপে বিদ্যমান আছে, তাহাতে যে আস্থা পরিত্যাগ তাহাই মনোনাশ, এই অনাস্থারূপ যে মনোনাশ তাহাই নির্ব্বাণ, আর আস্থা দ্বারা দৃশ্য বস্তুর যে গ্রহণ তাহাই সমস্ত দুঃখের কারণ।

প্রমাণ যথাঃ—

এষ এব মনোনাশস্ত্ববিদ্যা নাশ এ বচ।
যদ্যৎসম্বিদ্যতে কিঞ্চিৎ তত্রাস্থা পরিবর্জ্জনম্॥
অনাস্থৈব হি নির্ব্বাণং দুঃখমাস্থা পরিগ্রহঃ।

যোঃ বাঃ উৎপত্তি প্রকরণ।

শ্রীভূপতি চরণ বসু

ব্রজরস মাধুরী

(হোরিলীলা)

বাসন্তী পঞ্চমী হইতে ব্রজে ঋতুরাজ নবীন বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রজভুবন হোরিরসে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। নবীন মলয়ানীলের মৃদুমন্দ ফুরফুরে হাওয়ায় মধুর বৃন্দাবনের তরুলতারাজি নববিকাসিত পত্রপুষ্পে বিচিত্র সাজে সাজিয়া উঠিল, মন প্রাণ মাতানো মধুর সৌগন্ধে সমগ্র ব্রজভুবন আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে—'মাতল' ভ্রমরের মধুর গুঞ্জনে, পিক পাপিয়ার রসাল কূজনে, মধুর কুঞ্জকানন দিবারাতি অতি মধুর প্রেমসঙ্গীতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, নব পুষ্পিত কেলীকদম্ব শাখে বসিয়া মধুর লীলারসে রসিয়া শুক শারিকা ব্রজকিশোর কিশোরীর, রসরাজ রসবতীর রসলীলারহস্যের আলাপচারী আরম্ভ করিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র শোভাসম্পৎ বিস্তার করিয়া ময়ূর ময়ূরী প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছে, অদূরে কুমুদ কহ্লার কমলোৎপলে সুশোভিত ও সৌরভিত কৃষ্ণলীলা সহচরী কালিন্দী ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের মধুর প্রেমরসময়ী লীলামাধুরী বিস্তার করিতে করিতে চলিয়াছেন। বৃন্দাবন যখন এরূপ নবীনসাজে সাজিয়া চারিদিকে নব-রসের উৎস উৎসারিত করিয়া রসরাজ রসবতীর বিচিত্র লীলাভিনয়ের রঙ্গভূমি সাজিয়া আছেন তখন রসের প্রকাশমূর্ত্তি, অনাবিল আনন্দ "চিন্ময়বিগ্রহ" "পরিপূর্ণমনিত্যমানন্দম্" কেবল নিজজনকে কৃপা করিবার জন্যই এই রসময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রপঞ্চে প্রকট হইলেও মায়িক জগতের আবিলতা যাহাদের চিন্ময় প্রেমরাজ্যের ত্রিসীমানায় পৌঁছিতে পারে নাই, জাগতিক পাপ তাপ, দুঃখ ক্লেশ, কপটতা কুটিলতা, বিধিনিষেধ; যাহাদের নিত্যানন্দধামের বায়ুকে দূষিত করিতে পারে নাই, মায়াব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়াও জলনিহিত পদ্মপত্রের ন্যায় যাঁহারা সর্ব্বদা অসম্পৃক্ত, সেই সরলতা ও আনন্দপ্রতিমা ব্রজ যুবক যুবতী-দের সারসিকা আনন্দোচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি কিরূপ মধুর ভাবে উৎসারিত হইয়া-ছিল এই লীলারস-মাধুর্য্যাস্বাদনকারী ব্রজরসাবিষ্ট শ্রীসনাতন, বিশাপতি, বৃন্দাবন দাস প্রমুখ মহাজনগণ আমাদিগকে সেই মধুরাদপি মধুর পরমস্বাদু লীলামৃতের যে আভাস দিতেছেন, আসুন পাঠক আমরা তাহাই আস্বাদন করিয়া ধন্য হই। তবে প্রথমে স্বর্গের সিঁড়ি কিছু ভাঙ্গিতে হইবে। সেজন্য অধীর হইবেন না।

বহু বিচার বিতর্কের পর উপনিষৎ সেই পরতত্ত্বের স্বরূপ কীর্ত্তনে বলিতে-ছেন—"রসোবৈসঃ রসংহ্যেবায় লব্ধানন্দী ভবতি" তিনি সাক্ষাৎ রসস্বরূপ, কেবলমাত্র রসতত্ত্বের আলোচনায় ও আস্বাদনে জীব তাঁহাকে পাইয়া আনন্দলাভ করিতে পারে। বেদের শিরোভূষণ উপনিষদের উক্ত মহাবাক্যের ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত আবার স্ফুটতর করিয়া সংবাদ দিলেন—

"অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপ ব্রজৌকসাং।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণংব্রহ্ম সনাতনম্ ॥" ভাঃ ১০।১৪।৩২

আমরা সেই অবাঙ্মনসগোচর কূটস্থ ব্রহ্মতত্ত্বকে লীলারসকদম্ব শ্রীনন্দদুলাল রূপে এই ভৌমবৃন্দাবনে পাইলাম, যাঁহাকে প্রকট দেখিয়া ত্রিকালজ্ঞ ঋষি গর্গাচার্য্য ভিতরের কথা গোপনে শ্রীনন্দ মহারাজকে বলিয়া গেলেন—

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥" ভাঃ ১০।৮।১৩

ওহে নন্দ মহারাজ! তোমার এই পুত্রটীকে সামান্য প্রাকৃত বালক মনে করিও না। স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম যুগে যুগে পৃথক বর্ণ ধারণ করেন; বর্ত্তমান দ্বাপরে ইনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন।

"শুক্লরক্ত পীতবর্ণ—এই তিন দ্যুতি।
সত্য ত্রেতা কলিকালে ধরেন শ্রীপতি ॥
ইদানীং দ্বাপরে তিঁহো হৈলা কৃষ্ণবর্ণ।
এই সব শাস্ত্রাগম পুরাণের মর্ম্ম ॥" চৈঃ চঃ।

তৎপরে শ্রীচরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামী শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা সমর্থন করিয়া সেই শ্রুতি ও পুরাণ বাক্যের বিবৃতি করিয়া আরো খোলসা করিয়া লইয়া বলিলেন—

"রসময় বপু কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥"
"শৃঙ্গার রসরাজময় মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর ॥" চৈঃ চঃ

রস চতুঃষষ্টি প্রকার, তন্মধ্যে "আদ্যএব পরোরসঃ" সেই আদিরসের অপর নাম "শৃঙ্গার রস" বা "উজ্জল রস"। নিখিল আনন্দের আকর হইল রস। সেই রসশ্রেষ্ঠ শৃঙ্গাররসের প্রকট মূর্ত্তি আমাদের ব্রজবিহারী শ্রীনন্দ দুলাল সচ্চিদানন্দ তনু ব্রজের নন্দন।

"সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরসপূর্ণ ॥" চৈঃ চঃ

আমাদের রসিকশেখর নায়ক শিরোমণির কতকটুকু পরিচয় পাইলাম কিন্তু নায়িকাগণের একটুকু সংবাদ না পাইলে আমরা মধুর ব্রজরসলীলার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিব না। বিষয় ও আশ্রয় দুইটী বস্তু না হইলে রসের ক্রিয়া হয় না। পুত্র না হইলে মাতার বাৎসল্য রসের বিকাশ হইতেই পারে না। রসতত্ত্ববিচারে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটী শ্রেষ্ঠ রস। তন্মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই তিন রসেরই বিশেষ অভিব্যক্তি। আবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইল মধুর রস। সেই মধুররসনির্য্যাস আস্বাদনই রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ কার্য্য। সেই রসবিলাসের জন্যই "একমেবাদ্বিতীয়ং" শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্ত্তিতে প্রকটিত।

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥" চৈঃ চঃ

শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত হ্লাদিনীশক্তি অর্থাৎ অচিন্ত্যশক্তিবলে সচ্চিদানন্দঘনের অন্তর্ভুক্ত আনন্দ পৃথক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শ্রীমতী রাধিকা-রূপে প্রকটিত, তিনিই আবার ভক্ত কোটির মূল আকর। তাই শ্রীমতীর পরিচয়ে দেখিতে পাই—

"প্রেমের স্বরূপ দেহপ্রেমবিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠজগতে বিদিত॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥
গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দ মোহিনী।
গোবিন্দ সর্ব্বস্ব—সর্ব্বকান্তা শিরোমণি॥" চৈঃ চঃ

ইহাই হইল ভক্ত ও ভগবানের,সেব্য ও সেবকের মিলনে অপূর্ব্ব রসাস্বাদন।

শ্রীমতীর একটুকু দিগ্‌দর্শন পাইলাম কিন্তু তবুও হইল না। কৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজগোপীগণেরও সংবাদ কিছু জানা চাই। রসাচার্য্যগণ বলিয়াছেন রসপুষ্টির জন্য একই নায়কের বহু নায়িকার প্রয়োজন।

"বহুকান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥" চৈঃ চঃ

যেমন শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীরাধিকা তেমনই শ্রীরাধিকা হইতেই এই কৃষ্ণকান্তা-গণের প্রাকট্য।

"আকার স্বভাব ভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ॥
রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা।
সখীগণ হয়েন তাঁর পত্র পুষ্পপাতা॥" চৈঃ চঃ

এই সখীগণ নিতান্ত বাজে জিনিষ নহেন, মধুর রসলীলাস্বাদনের ইহারাই অতি আবশ্যক মুখ্য উপকরণ।

"সখীবিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়।
সখীলীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥"

তারপরে সাধ্যসাধন তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে এই সখীই হইল সাধকের পরম আশ্রয়, অন্ধের নড়ি। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় তাই রাগানুগীয় ভক্তকে উপদেশ করিয়াছেন।

"রূপে গুণে ডগমগি সদা হব অনুরাগী
বসতি করিব সখীমাঝে।"

অন্যত্র বলিতেছেন—

"সখীর অনুগা হইয়া ব্রজে সিদ্ধ দেহ পাইয়া
সেইভাবে করিব ভজন॥"

ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত আনুগত্যভজন। সাধু মহাজনগণ বলেন ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের "অনর্পিতচরী" কৃপাবিতরণ।

পরমহিতৈষী লোকগুরু উক্ত ঠাকুর মহাশয় পুনরপি বলিতেছেন—শ্রীপাদ রূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস প্রভৃতি গৌরপরিকরগণই হইতেছেন ব্রজলীলার কথিত:সেবাপরাসখী। নবদ্বীপ লীলার শ্রীরূপগোস্বামী ব্রজলীলার শ্রীরূপমঞ্জরী ঐরূপ পুরুষ বেশে প্রকটিত শ্রীচৈতন্যদেবের পরিকর সকলেই "ব্রজতরুণীগণ লোচন মঙ্গল।" শ্রীরূপ হইতেছেন তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাই শ্রীনরোত্তম ঠাকুর কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা করিতেছেন—

"শ্রীরূপ মঞ্জরীপদ সেই মোর সম্পদ
সেই মোর ভজন পূজন।
সেই মোর আভরণ সেই মোর প্রাণধন
সেই মোর জীবনের জীবন॥"

সুতরাং এখানে সখীতত্ত্বই হইতেছে সাধকের সর্ব্বস্ব। অতএব সখী অর্থাৎ গোপীতত্ত্বের কিছু দিগ্‌দর্শন আমাদের প্রয়োজন হইতেছে।

বাহিরে পুরুষের বেশ ঘুচাইয়া মেয়ে সাজিলেই গোপী হওয়া যায় না, উহা কঠোর সাধন সাপেক্ষ। গোপী হইতে হইলে সম্পূর্ণ আত্মসুখভোগ ত্যাগ করিতে হইবে, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি—"সখীবিনা এই লীলায় নহে অন্যের গতি।" সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে তোমাকে কোটি জন্মার্জ্জিত স্বভাব, নিজসুখ তাৎপর্য্য ছাড়িতে হইবে। ভোগসুখলিপ্সু পুরুষকে সেবাকার্য্যে আত্মসুখসম্বন্ধ বর্জ্জিতা পতিপরায়ণা নায়িকা হইতে হইবে। অতি দুরুহ হইলেও শ্রীগুরুকৃপায় নিজ সিদ্ধ স্ফুরিত হইয়া থাকে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল হইলেও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় একেবারে অমিল নহে। ঠাকুর মহাশয়ের মহাবাক্যই সেই প্রমাণ।

"সাধনে ভাবিবে যাহা　　সিদ্ধদেহে পাবে তাহা
রাগ পথের এই সে উপায়।"

সিদ্ধ দেহের স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে সাধককে উল্লিখিত ভজনগুরু শ্রীরূপ মঞ্জরী শ্রীগুণমঞ্জরী (শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী) প্রভৃতি সখীগণের অনুগত হইয়া তাঁহাদেরকৃত গ্রন্থমধ্যে ইহার উপদেশ মত গন্তব্যপথে অনুসরণ করিলে আজ হউক বা কোটি জন্ম পরেই হউক নিশ্চয়ই সেই অভিষ্ট সিদ্ধদেহ পাইয়া কুঞ্জ-সেবানন্দ লাভে কৃতার্থ হইতে পারিবেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু নিগূঢ় ব্রজলীলাকুঞ্জের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের বাল্যসহচর কবি বাসুঘোষ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গাহিয়াছেন—

"যদি গৌরাঙ্গ না হত,　　কি মেনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা　　প্রেমরস সীমা
জগতে জানাত কে?
মধুর বৃন্দা　　বিপিন মাধুরী
প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী　　ভাবের ভকতি
(জানাতে) শকতি হইত কার॥

এখানে আর একটী কথা বলিয়া আমরা রসলিপ্সু পাঠকগণকে যৎকিঞ্চিৎ রসলীলা মাধুরী পরিবেশনের চেষ্টা করিব। বৈষ্ণব মহাজনেরা বলেন এই মধুর কৃষ্ণলীলায় একটী অচিন্ত্য শক্তি আছে। এই লীলারসে যাঁহার মন ডুবিবে তাঁহাকে দেহ গেহ সংসার ধর্ম্ম সব ভুলাইয়া অননুসন্ধানে সেই প্রেম-রাজ্যে লইয়া লীলারসতরঙ্গে ডুবাইবে। ঐ রূপে তাঁহার মন ক্রমে আবিলতা-

মুক্ত হইয়া সম্যক প্রকারে ব্রজ-ভাবাবিষ্ট হইয়া প্রেমরসে পূর্ণ হইয়া থাকিবে, ইহাই হইল সাধকের একমাত্র অভিলাষ। বৈষ্ণবাকাশের ধ্রুবতারা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সেইজন্ত কাতরে প্রার্থনা করিয়াছেন—

"কেবল ভকত সঙ্গ প্রেমকথা রসরঙ্গ
লীলা কথা ব্রজরস হরে।"

আনন্দধাম শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে পাঠক বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিবেন যে, সে রাজ্য আমাদের এ রাজ্যের মত নহে। সেখানে ভোগস্পৃহা নাই কাজেই কুটিলতা, কপটতা, বিধি নিষেধ, শাস্ত্র শাসন, ধর্ম্মনীতির প্রতাপ নাই। সেখানে কেবল আনন্দ, কেবল আনন্দ-ঘনমূর্ত্তি ব্রজরাজকুমারের সেবা, সর্ব্ব-প্রকারে সেই রসময় কৃষ্ণকে রসাস্বাদন করান ইহাই সেই রাজ্যের স্থাবর জঙ্গম সকলেরই ব্রত। তাহা ষোল আনা ঠিক রাখিয়া শাস্ত্রধর্ম্ম যতটুকু টিকে টিকুক নচেৎ কৃষ্ণসেবার জন্য ব্রজবাসিরা আনন্দে বেদ বিধি, ইহকাল পরকাল দিতেও প্রস্তুত। সুতরাং কৃষ্ণলীলা প্রপঞ্চাগত মানবী লীলা হইলেও ষোল আনা এই মায়ারাজ্যের তুলাদণ্ডদিয়া ওজন করিলে চলিবেনা। ব্রজগোপীর চিত্র রচনা করিতে গিয়া পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

"লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম।
দুস্ত্যজ্য মায়া পথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥" চৈঃ চঃ

রসরাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই ব্রজ গোপীগণের প্রাণবল্লভ। তাঁহাদের জীবনের ব্রত হইল সেই প্রাণবঁধুয়ার সুখ সম্পাদন, তজ্জন্য যে কোন বাধা আসিবে তাহা ব্রজগোপীর সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রসিকশেখর শ্রীনন্দ দুলালের নিরন্তর রসাস্বাদন হইল কার্য্য তন্মধ্যে মধুর রস পাইলে আর কাণ্ডা-কাণ্ড জ্ঞান থাকে না।

নববসন্তের মলয়ানিলের সঙ্গে সঙ্গে রসিকশেখরের এই মধুর রসের একটী অনির্ব্বচনীয় প্রকারের রসাস্বাদনের বাসনা জন্মিয়াছে ইহা গভীর নিশীথে নির্জ্জন নিকুঞ্জবনে প্রাণেশ্বরীকে গোপনে বেণুরবাকৃষ্ট করিয়া টানিয়া লইয়া নিভৃতে রসকৌতুক করা নহে, ইহা দিন দুপুরে ঢাকে ঢোলে ডঙ্কা বাজাইয়া অন্তরঙ্গ

সহচর সঙ্গে লইয়া প্রিয়তমা গোপাঙ্গনাগণের সহিত বিচিত্র প্রেমরসময়ী লীলা। এই চরম আনন্দ-লীলা দুই এক দিন ব্যাপি নহে, ইহা সর্ব্বসার হোরিলীলা। এই অবাধ আনন্দ প্রবাহ অবিরাম অবিশ্রাম চল্লিশদিন ব্যাপিয়া চলিবে এ সময়ে বেদবিধি লাজধর্ম্ম সমস্তই ব্রজধাম হইতে বিতাড়িত। ঐ শুনুন বিবিধবর্ণের ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডে অভিনব পরিচ্ছদে ও মস্তকে নবমুকুলের কিরীটধারণে সুশোভিত হইয়া কৃষ্ণবিদূষক সখা মধুমঙ্গল বাসন্তীপঞ্চমির দিনে ঢক্কানিনাদে ঘোষণা দিতেছেন—

ধরম, নিজঘরে যাও আজ্ঞাদিল নাথ (কৃষ্ণচন্দ্র)।
হোরি মধ্যে দিনচল্লিশ হিন্দোল মধ্যে দিন সাত ॥

নিখিল আনন্দাম্বুধি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীনন্দদুলাল ব্রজের প্রাণ। তাঁহার আবদার কেনা পূরাইবে ? বিশেষতঃ নববসন্তের আগমনে সরল প্রাণ আনন্দমূর্ত্তি ব্রজবাসী আবাল বৃদ্ধ নরনারী সকলেরই প্রাণ আনন্দ হিল্লোলে নাচিয়া উঠিয়াছে, তাই আলাদের ঘরের দুলাল শ্রীনন্দদুলালের এই পৃথিবীছাড়া আনন্দ হিল্লোলে সকলেই অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছেন, ব্রজবালকগণের গোচারণ নাই তাঁহাদের ছুটী ; আর ব্রজ-গোপীগণেরও গৃহকার্য্য নাই তাঁদেরও ছুটী ; সকলেই স্বামীগৃহ হইতে পিত্রালয়ে আসিয়াছেন বিশেষতঃ রাজহুকুমে ও দেবী পৌর্ণমাসির আদেশে শাশুরী ননদিনীর তাড়না নাই বরং উৎসাহই আছে বিশেষতঃ দিন্ দুপুরে দশ হাজার লোক মিলিয়া প্রকাশ্যে যখন এই নির্দ্দোষ নৃত্যগীত আনন্দ তখন নয় বছরের বালক কানাইয়া লালের কিছু চপলতা দুর্নাম থাকিলেও ইহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। ব্রজের বড় ছোট সকল ঘরের বউঝিই যখন এই লীলার যোগ দিতেছে তখন কাহারও মনে কোন আপত্তির কথাও উঠে না। জটিলার ত কথাই নাই তাঁহার বধূ প্রত্যহই এই হোরিরণে জয়লাভ করিতেছেন আর থালে থালে লাড্ডু বুড়ীর বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিতেছে, বুড়ীর আনন্দ আর ধরিতেছেনা শতমুখে বধুর গুণকীর্ত্তন।

কি করিয়া এই পরম মধুর ব্রজরস আস্বাদন করিতে হইবে তাহা নিজে আচরণ করিয়া প্রেমগুরু শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, পাঠকগণ তাহার একটা নমুনা দেখুন। নবদ্বীপ সুধাকর ব্রজের শ্রীরাধা গোবিন্দের এই হোরি লীলা অনুধ্যান করিতে করিতে তদ্ভাবেভাবিত হইয়া ভক্ত সঙ্গে সেই লীলা আস্বাদন করিতে লাগিলেন সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনবদ্বীপে সুরধুনীতীরে সেই লীলা যেন প্রকট হইল। তাই ভক্ত বৃন্দাবন দাস গাহিতেছেন—

"নাচে নিতাই গৌর দ্বিজমণিয়া।
বামে প্রিয় গদাধর সম্মুখে অদ্বৈতবর
পারিষদ তারাগণ জিনিয়া॥
বাজে খোল করতাল মধুর কীর্ত্তন ভাল
হরি হরি ধ্বনি গগন ভেদিয়া॥"

যুগ যুগান্তরের পরেও ব্রজবাসির সরলতা মাখা আনন্দ রসাপ্লুত প্রাণে, পরপুরুষের সহিত নবযুগলের এই আনন্দ লীলার অবাধ বিশ্রাম দেখিয়া তৎসময়কার চিত্র যে কি ছিল পাঠক অনুভব করিবেন।

"চন্দনে চর্চ্চিত কায় ফাগুবিন্দু শোভে তায়
বনমালা গলে দোলে বনিয়া।
স্কন্ধে শুভ্র উপবিত রূপ কোটি কামজিৎ
চরণে নূপুর রণ রণিয়া।
দুই ভাই নাচিয়ে যায় পারিষদ গণ গায়
গদাধর আনন্দে পড়ে ঢলিয়া॥
পূরব রাস লীলা এবে প্রভু প্রকাশিলা
সেই বৃন্দাবন এই নদীয়া।
বিহরে গঙ্গার তীরে সেই ধীর সমীরে
বৃন্দাবন দাস গায় জানিয়া॥"

শ্রীগৌরাঙ্গাবির্ভাবের পূর্ব্বে ভক্তকবি বিদ্যাপতি এই হোরি লীলার আরম্ভে ব্রজের চিত্র কিরূপ বর্ণনা করিতেছেন দেখুন—

"নব বৃন্দাবন নবীন তরুগণ
নব নব বিকসিত ফুল।
নবীন বসন্ত নবীন মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল॥
বিহরই নওল কিশোর।
কালিন্দী পুলিন কুঞ্জ নব শোভন
নব প্রেম বিভোর॥
নবীন রসাল মুকুল মধু মাতিয়া
নব কোকিল কুল গায়।

নব যুবতীগণ　　　চিত উনমাতই
নবরসে কাননে ধায় ॥
নব যুবতীগণ　　　নবীন নব নাগরী
মিলয়ে নব নব ভাতি।
নিতি নিতি ঐছন　　　নব নব খেলন
বিদ্যাপতি মতি মাতি ॥"

হোরির ডঙ্ক বাজিয়া উঠিলে সরলতা পূর্ণ আনন্দপ্রাণ ব্রজবাসির জ্ঞান বাস্তবিকই থাকেনা। আনন্দের অভিব্যক্তি প্রধান নৃত্যগীত বাদ্যে। তাহাতে ব্রজ যুবক যুবতীগণ সিদ্ধ; তারউপরে বোধ হয় একটু মাত্রা চড়িয়াছে, মধুমতি বোধ হয় উৎকৃষ্ট কুসুমমধু বেদম পরিবেশন করিয়াছেন। একেত রাজ হুকুমে লজ্জা ভয় তিরোহিত তার উপরে রং চড়িয়াছে তার পরে সহজ আনন্দঘন মূর্ত্তির উদ্দীপ্ত আনন্দোচ্ছ্বাস। তাই কবি উদ্ধবদাস ঐ মধুর লীলার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছেন।

"(একে) ঋতুরাজ, (তাহে) ব্রজসমাজ, ফাগুরঙ্গে রঙ্গিয়া।"

আজ ত ব্রজে আনন্দের আর সীমা নাই। যাহা সাধ্যসাধনা করিয়াও হইত না তাহাই আজ স্বেচ্ছায় হইতেছে ঐ দেখ—

"নাগরী বর হো রঙ্গে,　　　উনমতচিত শ্যামসঙ্গে
নাচত কত ভঙ্গিয়া।"

সে অপূর্ব্ব ভঙ্গিমাময়ী নৃত্যকলায় আজ রসরাজের মন আনন্দে ভরপুর তাহার পরে বিনা অনুরোধে শ্রীমতী কত প্রেমবর্দ্ধন গান গাইতেছেন ও বীণ বাজাইতেছেন

"গাওত কত রস প্রসঙ্গ　　　বাওত কত বীণ মোচঙ্গ
(সঙ্গে সঙ্গে) থৈয়া থৈয়া মৃদঙ্গিয়া ॥
চঞ্চল গতি অতি সুরঙ্গ　　　নিরখি ভুলে কত অনঙ্গ
সঙ্গীত স্বর সুরপ্রিয়া।
স্বর মণ্ডল স্বর অভঙ্গ　　　বিবিধ যন্ত্র জলতরঙ্গ
মধুর স্বর উপাঙ্গিয়া ॥"

এখন নাগররাজের কীর্ত্তি শুনুন—

"খেলি গোপাল ব্রজলাল　　　সুন্দর ছাতি অতি রসাল
রঙ্গিণীগণ সঙ্গিয়া।

ব্রজবধূগণ ধরত তাল গাওত পদ নন্দলাল
রাই সঙ্গে অঙ্গিয়া।
হো হো করি করত ভাষ করতালি ঘন ঘন উল্লাস
জয় জয় রব চঙ্গিয়া।
গোবিন্দগুণ করি প্রকাশ রচিত পদ উদ্ধব দাস
হোরি রস তরঙ্গিয়া ॥"

শ্রীবামাচরণ বসু।

সম্পাদকের বৈঠক।

(ভারতবর্ষাদি পত্রিকায় যেরূপ প্রশ্ন ও উত্তর প্রকাশিত হয়, উহা সাহিত্য ক্ষেত্রের বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে হয়। ঐ ভাবে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তত্ত্ব আলোচনা করিলে সম্প্রদায় এবং সমাজ উভয়েরই মঙ্গল হইবে। বিবেচনা করিয়া অত্র ভক্তিতে সেই নিয়মের প্রবর্ত্তন করিয়া কয়েকটি প্রশ্ন পাঠাই। ভাগবতগণ ইহার যথাযথ মীমাংসা করিয়া দিলে কৃতার্থ হইব।)

১। নবদ্বীপে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী সেবিত শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহের সেবাইত গণ শাক্ত, তাঁহাদিগের দ্বারা শ্রীবিগ্রহ সেবিত হওয়া উচিত কি না? নতুবা তাহার প্রতীকারের উপায় কি?

২। হুগলী জেলার বৈদ্যবাটী ষ্টেশনের নিকট "নিমাই তীর্থ ঘাটের" উৎপত্তি বিবরণ কি?

৩। সাড়ে তিন জনা মর্ম্মী গৌর ভক্তের মধ্যে শিখি মাহাতি ও তাঁহার ভগিনীর বিশেষ বিবরণ বৈষ্ণব সাহিত্যে দেখিতে পাই না। বিশেষতঃ রাম রায় ও স্বরূপ দামোদরকেই প্রভুর গম্ভীরালীলার প্রধান সহায়তাকারী রূপে দেখিতেছি। শিখি মাহাতিকে যেদিন প্রভু কৃপা করেন সেই দিনের ঘটনাই ক্ষণিক বিদ্যুৎ চমকের মত আমাদের চক্ষের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

তাঁহার পুণ্যময় জীবনের পরবর্ত্তী অংশ কোন গ্রন্থে বর্ণিত আছে কি না? মাধবী দাসীর পদ আছে দেখিতে পাই কিন্তু শিখি মাহাতি কোন পদ রচনা করিয়াছিলেন কি না?

৪। কুলীন গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু বসুবংশ যখন হরিদাসের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। ইহা প্রাচীন গ্রন্থের কোথায় কোথায় বর্ণিত আছে?

বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা।

সুখের দিন

(মানবজন্ম সুখের)

যে সীমাবদ্ধ পরমায়ু নিয়া সংসারে আসিয়াছি, তাহা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, দণ্ডে দণ্ডে, দিনে দিনে, বৎসরে বৎসরে ক্ষয় করিতেছি। পৃথিবীর যাবতীয় ধন রত্নের বিনিময়েও সেই ক্ষয় পরমায়ুর এক তিল অংশ পাওয়া যাইবে না। এই প্রকারে ক্ষয় পাইতে পাইতে একদিন আর কিছুই থাকিবে না। সেই দিনের নাম শেষ দিন। যে দিন এই জড় জগতে আসিয়াছি সেই দিন প্রথম দিন, আর যে দিন চৈতন্য (সংজ্ঞা) বিহীন হইয়া সম্পূর্ণ জড়তা প্রাপ্ত হইব সেই দিন শেষদিন। সেই শেষদিনের যে কয় দিন বাকী, আজ কি কাল কি আরও ১০।২০ বৎসর পরে তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই।

সংসারে পরিবার পরিজন লইয়া বেশ স্বচ্ছন্দ অবস্থায় আছি। আহারে, বিহারে, নিদ্রায় কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটিবার কারণ বর্ত্তমান নাই। মান সম্মান ও যথোচিৎ পাওয়া যায়। আত্মম্ভরিতায় খুব বড় জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা করিতেছি; ইহাই যেন প্রকৃত সুখের দিন, চলিয়া যাইতেছে আরও হাজার বৎসর বাঁচিয়া থাকিবার উপায় অন্বেষণ করিতেছি। মৃত্যুর কথা মনে হইলে প্রাণে বড় আতঙ্ক উপস্থিত হয়। আবার ঠিক পরক্ষণেই ক্ষণস্থায়ী সুখে স্বার্থান্বেষী নানা প্রকার ঘাত প্রতিঘাতে মানসিক অবস্থা একেবারে বিপরীত

দিকে নিয়া গেল। তখন মনে হয় এই মুহূর্ত্তেই মরণ ভাল। আর যেন মরণটা কিছুই নয়, এক বিন্দুও ভীতির কারণ নাই। অসুয়া পরবশ হইয়া আত্ম বৈরীতা নিবন্ধন মৃত্যুকে কোল দিতে প্রস্তুত। অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য একেবারে ভুলিয়া গেলাম। এই খানে ইহা মনে রাখিলেই হয় যে, জড়জগতের পার্থিব সুখদুঃখ মানব জীবনের কালচক্রে বিদ্যমান থাকিয়া ঘুরিতেছে, সুতরাং সুখের ভাগ যেমন হাসিমুখে গ্রহণ করিয়া থাক, দুঃখ ভাগও তেমন গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা যাহার ভাগ তাহাকেই নিতে হয়, অন্যের নেওয়ার শক্তি নাই। মৃত্যু অনিবার্য্য ও উহার অবধারিত কাল নাই। এই বেলায় মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিয়া সুখের দিন কয়টা সুখেই কাটাই।

পার্থিব সুখ-পরতন্ত্র পাপীর প্রাণ সতত মৃত্যু ভয়ে কম্পিত। একমাত্র আত্ম-চৈতন্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বাঁচা মরা সমান জ্ঞানে সংসারে আপন আপন কর্ত্তব্য পালনে তৎপর থাকেন। তাঁহারা মায়াময় জড় জগতের জড় সুখ, মায়িক সম্বন্ধ, জন্ম মৃত্যু, উত্থান পতন কোনটীতেই হর্ষ, বিষাদ অনুভব করেন না। তাঁহারা যে কোন্ রাজ্যের কোন আনন্দ নিয়া জীবন অতিবাহিত করেন, সেই রাজ্যের মানুষ ব্যতিরেকে ইহার উত্তর কে দিবে?

এখন দেখা যাইতেছে আত্মসুখ পরবশ হইয়া কু-অভ্যাসে অভ্যস্ত থাকিয়া যে দিনগুলি সুখের দিন মনে করিতেছি তাহাতেই জীবন কলুষিত হইয়া ধ্বংসের পথে যাইতেছে। এখন উপায় কি? অভ্যাসের দাস হইয়া ন্যাক্কার জনক আত্মেন্দ্রিয় তর্পণে ভগবদ্ভজন বিহীন কারাগার সদৃশ সংসারে থাকিয়া পরম সুখে আছি মনে করিতেছি।

হায়! এতই অন্ধ হইলাম যে, সত্য, মিথ্যা, সাধু, অসাধু, সর্প, রজ্জু, পাপ পুণ্য, অপরাধ, প্রসাদ, প্রত্যেকটীতেই বিপরীত বুদ্ধি। কি আশ্চর্য্য। মায়ার এমনই অসাধারণ শক্তি যে, দুঃখ জিনিষটি সুখ এবং সুখ জিনিষটি দুঃখ মনে করিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া আছি।

কেবল দিন রাত্রি ধর্ম্ম বিহীন জ্বালাময় কর্ম্ম নিয়া ব্যতিব্যস্ত। যেন কত বড় কর্ম্ম বীর। কত জ্বালা যন্ত্রণায় ঝালা পালা হইয়াও প্রতি নিবৃত্ত হইতে ইচ্ছা হয় না। সাধে কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন :—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তিতে॥" গীতা……

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, শ্রীভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত মায়ামুক্ত হওয়ার উপায় নাই। তিনি না জানাইলে জানিবারও পন্থা নাই। তাহার উপায় ও বলিয়াছেন :—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত যাবন্নির্ব্বেদজায়তে।"

যে পর্য্যন্ত কর্ম্ম বিষয়ে নির্ব্বেদ না আসে সেই পর্য্যন্ত শ্রীভগচ্চরণ শরণ নিয়া একাগ্রতা সহ কার্য্য করিতে হইবে। কর্ম্ম শব্দে এখানে ধর্ম্ম সংযুক্ত কর্ম্মই বুঝিতে হইবে। ধর্ম্মযুক্ত কর্ম্মই প্রকৃত স্বাভাবিক কর্ম্ম। ইহাই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বেদ বিহিত স্বধর্ম্মাচরণই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। বেদ বিহিত কর্ম্ম মানুষের স্বাভাবিক জন্ম ও মজ্জাগত ধর্ম্ম। কারণ বেদ বিহিত কর্ম্মদ্বারা উৎপত্তি, বেদ বিহিত কর্ম্ম করিয়াই স্থিতি, অবশেষে বেদ বিহিত কর্ম্ম দ্বারাই আত্মার সদ্গতি বিধান করা হয়। সুতরাং মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও স্বেচ্ছাচারিতার কিছুই নাই। কেবল "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

শ্রীভগবান যাহাকে যে কালে, যে দেশে, যে আশ্রমে জন্মগ্রহণ করাইয়াছেন, তাহার ঠিক সেই কামনানুযায়ী ধর্ম্ম উপাসনা এবং সেই দেশের সেই আশ্রমের আচার ব্যবহার বেশভূষা ইত্যাদিও অভ্যস্ত থাকিয়া শ্রীভগবানের আদিষ্ট স্বধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। শাস্ত্র আজ্ঞাই শ্রীভগবানের আদেশ মনে মানিয়া লইতে হইবে। কারণ শ্রীবিগ্রহ শাস্ত্রগুরু, ইহারা তত্ত্বের হিসাবে একই বস্তু; এই জ্ঞান না থাকিলে একটী মানিয়া অপরটী পৃথক জ্ঞানে হেয় মনে করিলে কাহাকেই মানিয়া চলা হয় না। সবই গোলমাল হইয়া যায়।

যদ স্বধর্ম্মাচারী কোন একজন মহাপুরুষকে আদর্শ রাখিয়া, সংসারে প্রত্যেক মানুষ স্বধর্ম্মাচরণে তৎপর ও কর্ত্তব্য পরায়ণ হইয়া শ্রীভগবানের আদেশ (বেদ বিহিত কর্ম্ম) পালন করিতে এবং আদর্শানুযায়ী নিজ নিজ চরিত্র গঠন করিতে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করে, তবে আর সাংসারিক ঘাত প্রতিঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইতে হয় না। সংসারই সুখের ধাম হইয়া যায়। স্বেচ্ছাচারিতার মতও পন্থা বিভিন্ন, অনেক সময় একটী আর একটীর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। সুতরাং স্বেচ্ছাচারিতাই সংসারকে নরক করিয়া তুলে। আর শ্রীভগবানের আদেশ ও পন্থা একটী মাত্র "সদ্‌-ধর্ম্মাশ্রয়"। শাস্ত্রবাণী সুক্ষ্মভাবে না বুঝিলে ইহাতেও স্বেচ্ছাচারিতার গোলযোগ ঘটে।

আমরা মানুষ। সমস্ত প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমানে পূর্ণ হইয়া আছি। যেগুণে মানুষ অন্য প্রাণী অপেক্ষা বড়, সেই বড় গুণটী এই, মানুষ

শ্রীভগবানের আদেশ পালনে সক্ষম ও অধিকারী। তৎপালনেই মানুষের মনুষ্যত্ব প্রকাশিত হইয়া মানব জীবন সুখের দিনে পরিণত হইয়া পরমানন্দে কাটিয়া যায়।

"জীব নিত্য কৃষ্ণ দাস ইহা ভুলি গেল।
সেকারণে মায়াফাঁস গলায় বান্ধিল ॥"

যত দুঃখ ক্লেশ কেবল শ্রীভগবানকে ভুলিয়া। যদি বলা যায় এই ভুল আমাদের কৃত নয় তাঁহারই কৃত মায়া। তাহার উত্তর তাঁহার কৃপা দ্বারাই এই মায়াফাঁস কাটা যায়। তাঁহাকে নিয়া পরিবার পরিজন সহ গৃহস্থালী করিলেও পাঁকাল মাছের মত থাকা যায়। নিত্যচিন্ময় বস্তুর প্রভাবে বিমল আনন্দলাভ করিয়া সুখে দিন কাটান যায়।

এই সুযোগের সময় (মানব জনমে) দেরী না করাই শ্রেয়ঃ। পরস্পার পরস্পরের সহায়তা দ্বারা মোহ—নিদ্রিতাবস্থা জাগাইয়া ভ্রম সংশোধন করতঃ তাঁহাকে স্মরণ করিয়া দেওয়া শ্রীহরিকথার নাম, গুণ, লীলাগানে ইষ্ট গোষ্ঠি করা সৎসঙ্গের অনুসন্ধান জানান প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে। প্রত্যেকেরই আনন্দ চাই। বিমল আনন্দ পাইলেই মনুষ্য জন্ম ধন্য হয়। হায় ভাগ্য! সেই যথার্থ সুখের দিন কবে আসিবে!

শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রসঙ্গ

(৬)

[কলিকাতা নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীটে, বাবাজী মহাশয় ও নবদ্বীপ দাদার গমন।]

(কলিকাতা বিডন গার্ডেনে ইং ১৯০১ খৃঃ নভেম্বর মাসে কংগ্রেস ও একজিবিসন হয়, এবং মিঃওয়াচা যেবারে প্রেসিডেন্ট হ'য়েছিলেন। এ সেই সময়ের কথা।) পুলীন দাদার মুখে সংবাদ পেলাম বাবাজী মহাশয় স্বদলে বরাহ নগর হ'তে দর্জ্জিপাড়ায় বাবু যোগেন্দ্র নাথ বসুর বাটীতে গিয়াছেন। যোগীন বাবুর ঠিকানা জেনে একদিন একলা তাঁর বাটীতে গেলাম। সে সময়ে বাবাজী মহাশয়

সেবা করছিলেন, তাই যোগীন বাবু এসে আমাকে বল্লেন—"আপনি ৩২।১ নয়ান চাঁদ দত্তের ষ্ট্রীটে যান, সেখানে সকলেই আছেন এবং উনিও এখুনি যাবেন। যোগীন বাবু বেশ বড় লোক, বাবাজী মহাশয়ের উপর বিশেষ ভক্তি; স্ত্রীপুত্র কন্যা সকলেই বাবাজী মহাশয়ের কৃপার পাত্র ও পাত্রী। বাবাজী মহাশয়কে একলা নিয়ে এসে মনের সাধে প্রসাদ খাওয়াইবেন এই জন্যই তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে বাড়ীতে নিয়ে আসেন। আমি পূর্ব্বোক্ত ঠিকানায় এলাম। বাটীটি প্রসিদ্ধ এটর্ণি এন, সি, বসুর বাটীর ২।৩ খানি বাড়ী পশ্চিমে, হলুদে রং নীচে উপরে অনেক ঘর, রাস্তার ধারে দোতালায় একটী বড় হল, বিস্তর লোক তাতে বসতে পারে। পূর্ব্বদিকের হল ঘরে বাবাজী মহাশয়ের জন্য আসন বা বিছানা, তার পার্শ্বেই চিত্রপটাদি সেবার স্থান। এইখানেই কীর্ত্তনাদি হয়। যাবা মাত্র নবদ্বীপ দাদাকে দেখতে পেয়ে প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল। উপরের একটা ঘরে বসে তাঁর সঙ্গে কথা বার্ত্তা কইতে লাগলাম। পরে বাবাজী মহাশয় এলেন। বেশ মনে আছে নবদ্বীপ দাদার কাছে বসে বসে সিগারেট খাচ্ছিলুম ;—দাদার কাছে কোন ভয় বা সঙ্কোচ আসতো না। হঠাৎ বাবাজী মহাশয় একেবারে সাম্‌নে এসে পড়াতে সিগারেট যে কোথায় লুকাবো তা ঠিক করতে পারছি না। তখন বাবাজী মহাশয় হেঁসে বল্লেন, "কি এ সবও খাও না'কি ?"

আমি খুবই লজ্জিত হলাম। তারপরে কীর্ত্তন হলো, শুনে বাড়ী এলাম।

(কলিকাতায় অবস্থান কালে বাবাজী মহাশয় ও নবদ্বীপ দাদার সঙ্গ-স্মৃতি।)

কলিকাতায় বাবাজী মহাশয়ের আগমনে বৈষ্ণব সমাজ মধ্যে একটা বেশ সাড়া পড়ে গেছে। তখন "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া" বাহির হ'ত, উক্ত পত্রিকায় বাবাজী মহাশয়ের আগমন সংবাদ প্রচার হওয়াতে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী অনেক ভক্ত এঁকে দর্শন কত্তে নিত্য আসেন। কত লোক কত রকমের প্রশ্ন করেন, কেউ ভক্তি কথা শুনতে চান কেউ বা তর্ক করেন, কিন্তু এমনি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখি, শেষে সকলেই আনন্দিত হ'য়ে চলে যান। এখানেও পূর্ব্বের মত কীর্ত্তন ও পাঠাদির বিরাম নেই। আর যজ্ঞি বাড়ীর মত প্রসাদ পাবার সময় নিত্য বহু পাতা পড়ে, কত লোকই প্রসাদ পান, কিন্তু কোথা হ'তে যে ব্যয় নির্ব্বাহ হয় তা ভেবে পাই না।

কলিকাতায় এঁদের আগমন হওয়াতে আঁড়িয়াদহের মত প্রায়ই এখানে আমরা আসতে পারি না ; মধ্যে মধ্যে আসি, এজন্য সব ঘটনা জানতে পারি

না। যে সময়ে যেগুলি দেখেছি ও শুনেছি সেই গুলিই কেবল লিখেরেখেছি।

একদিন সদর দুরজার ভিতর ঢুকেই দেখি নবদ্বীপ দাদা প্রসাদ পেতে বসেচেন। আমি যেতেই বল্লেন "ওরে খাবি ?" আমি বল্লুম "তা দাও খাই।"

দাদা।—"কিন্তু এতে কলা পোড়া ও কচু পোড়া আছে খেতে পারবি ?" সত্য সত্যই দেখি দাদা কলা এবং কচু পুড়িয়ে ব্যঞ্জনের মত খাচ্চেন আমি তো দেখে হেসেই অস্থির।

দাদা।—"দেখ্, লোকে বলে "কলা পোড়া কচু পোড়া খা," তাই আমি দেখচি ভাই, কেমন লাগে। একটু খাবিতো খা।"

আমি—"তবে দাও, আমাকেও কলা পোড়া কচু পোড়া খাইয়ে দাও।" এই বলে দাদার পাতে এক সঙ্গে বসে গেলাম। দেখলাম খেতে মন্দ নয়।

একদিন বাবাজী মহাশয় নিজের আসনে বসে আছেন। আমরা সম্মুখের হল ঘর হতে সমাগত ভক্তদের সঙ্গে যে সব প্রসঙ্গ হচ্চে তা শুনচি। আমার কাছে পূর্ব্বোক্ত বালক অচ্যুত, বাবাজীমহাশয়ের দিকে মুখ করে বসে, কাপড়ের ভিতরে হরিনামের ঝোলা নিয়ে নাম কচ্চে। অচ্যুত কি দুষ্টুমি করেছিল—এজন্য বাবাজী মহাশয় তাকে শাস্তির জন্য তাঁর সম্মুখে বসে "নাম" করতে আজ্ঞা করেচেন। বালক স্বভাব, চুপ করে বসে থাকলেও তার চাউনিতে খেলা করবার জন্যে মনটা যে ছট ফট করছিলো তা বুঝতে পারছিলুম। বাবাজী মহাশয় তা বুঝতে পেরে ঈষৎ হাস্যের সহিত তার দিকে চেয়ে বল্লেন,—"কি বাবা-বাবাজী!—ঝোলার ভিতরে নাম হচ্চে, না হাত গরম করচো ?" তার পরে সে ছুটি পেলে।

ঐ সময়ে আমাদের রামদাস বাবাজী দাদা মহাশয় গুণ গুণ স্বরে একটী গান গাহিতে গাহিতে নিচের কলতলায় স্নান কর্ত্তে গেলেন। নাইতে নাইতে গলা ছেড়ে গাইতে লাগলেন—

"যমুনা পুলীন কেশি ঘাট ও বংশী বটরে।
(যমুনার) তীরে নীরে বিহরই রসময় শ্যাম নটরে॥" ইত্যাদি

দু' এক লাইন গান গাইতে গাইতে তাতে সুন্দর সুন্দর আঁকর দিতে লাগলেন। এবং আমাকে ডেকে বল্লেন "ভাই! উপর থেকে দোত কলমটা নিয়ে আয়।" আমি দোত কলম কাগজ নিয়ে কলের কাছে বসলুম। তিনি ভাবের ভরে গাইতে থাকেন, আমিও লিখতে থাকি। দাদার স্নানকর্ত্তে

দেরী হলো, গানটিও খুববড় হলো। তার পরে দাদা হেসে বল্লেন—"এ গানটী তোরই তৈয়ারী হ'লো, কেমন?" বর্ত্তমান সময়ে রামদাদা অনেক স্থানেই এই গীতটী সুন্দর সুন্দর আঁকর দিয়ে গান করে থাকেন। সব গানটী আমার মনে নাই আর অনেকে জানেনও তাই আর এখানে দিলাম না।

এই সময়ে নায়ান চাঁদ দত্তের ষ্ট্রীটের বাসাটী নানাভক্তে পূর্ণ হ'য়েছিল। প্রসাদ পাবার সময়ে নিত্য অনেক পাতা পড়তো। একজন কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত বাবাজী, বাবাজীমহারাজের চরণ আশ্রয় করেছেন। বাবাজী মহাশয় তাঁকে আলিঙ্গন করেন দেখি। প্রসাদ পাবার সময়ে সেই বাবাজীটিও সকলের সঙ্গে প্রসাদ পেতে বসেন। এখানে আবার সকলের পাতের প্রসাদ সকলেই মহামহাপ্রসাদ জ্ঞানে পরম ভক্তির সহিত ভোজন ক'রে থাকেন। এমন কি একখানি পাতায় একজন প্রসাদ পেলেন তার পর সেই পাতায় আবার একজন; আবার একজন, এইরূপে ২।৩।৪ বার পর্য্যন্ত খেতে দেখি। আমিও কোন কোন দিন প্রসাদ পেতে বসতাম বটে কিন্তু ভয় হতো। বাপরে! কুষ্ঠব্যধি ভয়ানক সংক্রামক ব্যাধি।" কিন্তু এঁদের কারও কিছুমাত্র ভয় বা দ্বিধাভাব কোন দিন দেখি নাই। সহজ লোকের সঙ্গে মেলা মেশার মত করেন। প্রসাদের উপর এরূপ জ্বলন্ত বিশ্বাস দেখে আমি অবাক হতাম। পরে ঐ কুষ্ঠব্যাধি বাবাজীটী সুস্থ হ'য়ে ছিলেন।

"জগদীশবাবু" বলে একজন খুববৃদ্ধ ভদ্রলোক বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন। (এঁর কথা পূর্ব্বে একস্থানে বলেছি।) শরীরের মাংস সব লোল হ'য়েছে, গা হাত কাঁপতে থাকে। অতীব বৃদ্ধ হলেও চেহারাটী বেশ সুন্দর। ইনি এক অদ্ভুত ধরণের ভক্ত। হলঘরের এক পাশে আসন করে নাম করেন। আর মাঝে মাঝে ব'লে উঠেন, "এ কোন পুণ্য অনুভব!" এ কোন পুণ্য অনুভব। কেউ কাছে গেলেই যেন পরমাত্মীয়ের মত তাকে জড়ায়ে ধরেন। ভাবটা যেন তোমাদের সব পাপতাপ আমাকে দিয়ে ঐ মহাপুরুষের আশ্রয় নাও।

ইনি যে খুব উচ্চ অবস্থার ভক্ত তা নবদ্বীপ দাদার মুখে শুনলাম। একদিন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা চিন্তা করতে করতে ইনি এমন হয়ে গিয়েছিলেন ও এমন সব কথা বলেছিলেন যে, সকলেই দেখে ও শুনে আশ্চর্য্য। (ভগবৎ প্রসাদের চিহ্নস্বরূপ) লিচুফলের আটি পাওয়া গিছলো। তখন শীতকাল লিচুর সময় নয়। ঐ লিচুর আটিটি দাদারা যত্ন করে রেখে ছিলেন।

"নিত্য স্বরূপ ব্রহ্মচারী" দাদাও ছলের একধারে থাকেন। বাবাজী মহাশয় একে "বটু" বলে ডাকেন। ভ'রি অমায়িক লোক, রাতদিন আনন্দেই কাটিয়ে দেন। ঠাকুরের ভোগের সময়ে ঘণ্টা বাজলে বলেন; "অচ্ছা ভাই! খাবার সময়ে কি বাদ্যি বাজনা ভাল লাগে। ইনি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান, চিরকুমার। সংস্কৃত জানেন। বাবাজী মহাশয়ের আজ্ঞা ক্রমে ভক্তিশাস্ত্র প্রচার কার্য্যে রত হয়েছিলেন। ঐ সময়ে শ্রীমদ্ভাগবতের উৎকৃষ্ট সংস্করণ করছিলেন। এক্ষণে ইনি সন্ন্যাস ব্রত নিয়েছেন। নাইনিতালের আশ্রমে থাকেন। শ্রীবৃন্দাবনে "দেবকী নন্দন প্রেস" ইঁহারাই স্থাপিত। কিছুদিনপূর্ব্বে কলিকাতায় থাকিয়া ভক্তিশাস্ত্র প্রচার করিতেন।

এখানে যাতায়াত করতে করতে নবদ্বীপ দাদার যারা খুব বেশি সঙ্গ করেচেন তাঁদের মুখে দাদার কত মহিমার কথাই শুনতে পাই। কত অলৌকিক কার্য্যেরও পরিচয় পাই। একজনলোক সর্পাঘাতে মরে-ছিলো দাদার কৃপায় জীবন পায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

দাদার জীবনী কটকবাসী ভক্তগণই বিশেষ ভাবে জানেন। সেখানে তিনি অনেককেই কৃপা করে ছিলেন্। খুব উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দাদার গুণে মোহিত তাঁদের ইনি ধর্ম্ম পথের পথিক করেছেন। কটকের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মধুসূদন দাস মহাশয় ইহাকে খুব ভক্তি করতেন। তাঁর কন্যাগণ সাহেবী ভাবাপন্ন হলেও দাদাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। এই রমণী গণের সাধু ভাবের অনেক কথা দাদার মুখে শুনেছিনু।

একদিন শ্রীললিতা দিদিকে ব'ললাম;—দিদি! শ্রীবাবাজী মহাশয়ের কি ফটো আছে? আমাকে দিতে পারেন। দিদি ব'ললেন, "হা ভাই, একখানি আমার কাছে আছে। এই বলে তিনি মহানন্দে আমাকে সঙ্গে করে নিচের তলায় এসে তাঁর একটী পেটরা খুলে একখানি ফটোচিত্র দিলেন। পেটরাটি একটি দেখবার জিনিস, তাতে সিন্দুর চুপড়ী সিন্দুর আরসি চিরুণী প্রভৃতি স্ত্রীলোকের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভিন্ন আর কিছু নাই ফটোখানির মধ্যে শ্রীবাবাজী মহাশয়ের দাঁড়ান চিত্র আছে, বামধারে একজন বাবাজী আছেন। বাবাজী মহাশয়ের গলায় ও মাথায় গাঁদা ফুলের মালা. কটকে এই চিত্র অনেক করে একজন ফটোগ্রাফার তুলে'ছিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীঅমূল্যধন রায়ভট্ট

ভক্তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

(২১শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, চৈত্র, ১৩২৯ সাল)

প্রার্থনা

"অভিমানং মহাব্যাধিং কৃপয়া সংহর প্রভো।
ত্বমেব শরণং নৄনাং আধি ব্যাধি মতামিহ॥"

হে প্রভো! সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে নামিয়া নিরন্তর দুঃখের চক্রে নিষ্পেষিতই হইতেছি। শান্তির আশায়—আনন্দের আকাঙ্খায় লালায়িত হইয়া কর্ম্ম করিতে যাই কিন্তু শান্তির পরিবর্ত্তে, আনন্দের পরিবর্ত্তে ভয়ানক দুঃখই হয়। এতদিন ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া তোমাকেই দোষ দিয়াছি। তোমার কৃপায় এখন সে ভ্রম ঘুচিয়া সুদৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, ইহার কারণ একমাত্র অভিমান। কখন কুলের, কখন ধনের, কখনওবা বিদ্যার গরবে একেবারে অন্ধ হইয়া আমি নিজের ধ্বংশের পথ নিজেই পরিষ্কার করিতেছি। অভিমানরূপ এই মহাব্যাধির হাত হইতে আমাকে উদ্ধার কর। শুধু উদ্ধার করিয়া রাখিয়া দিলে হইবে না, হে ভগবন। যাহাতে আবার আসিয়া ঐ ব্যাধি আমাকে আক্রমণ না করে তাহারও ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। এই যে "আমি বড়, আমি যোগ্য, আমি যাহা করিব তাহাই ঠিক" ইত্যাদি ভাব, দয়া করিয়া ইহা একেবারে নাশ কর। তবে যদি বল সারা জীবন অভিমান করিয়া আসিয়াছি, সে স্বভাব কোথায় যাইবে? তাই বলি ঐ অভিমানের গতিটা কৃপা করিয়া একটু ফিরাইয়া দাও অর্থাৎ "আমি বড়, আমি বুদ্ধিমান, আমি জ্ঞানবান" ইত্যাদি ভুলাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ পরম ভাগবত

মহাপণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যেন সরল প্রাণে বলিতে পারি—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্যেনবনস্থো যতির্ব্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

বৃথা ধন, জন, কুলশীলের অভিমান দিয়া আমাকে আর ভুলাইয়া রাখিওনা। এই শক্তি দাও যেন তোমার দাসানুদাসের দাস বলিয়া অভিমান করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারি। কৃপাময় কৃপাকর।

বিশ্বরূপের সঙ্গীত (৭)

—:*:—

১২।—তুঁহু পতিত পাবন কলি-কলুষ হারী—নদীয়াবিহারী।
গৌর বর নাগর দেব বিশ্বম্ভর স্মরণ তুঁহারি॥
প্রকটী সুরনদীতটে গুপত ব্রজ মাধুরী
ভালে তুঁহু বিহরহরি ভকত মনোহারী॥
ভুবনভরি জয় জয় গাওয়ে নরনারী
বেকত গোকুলচাঁদ গৌর রূপ ধারী॥
যুগধর্ম্ম নাম নিজ-প্রেম পরচারি
শমনভয় বারতুঁহে তাপদুঃখ হারী॥
বিশ্বরূপ দাস অতি চপলমতি দুরজন
ভবজলধি তারণকো ভার তুঁহারি॥

১৩।—নাচত নটবর শ্যামসুন্দর মদন মনোহর সাজে।
বিনোদ বনফুল হার হিয়াপরে রাতুল চরণে নুপুর রাজে॥
শারদ শশধর গগন নিরমল
জোৎস্না পুলকিত স্নিগ্ধ ধরাতল
মন্দগতি চলে পবন সুশীতল
সুকুসুমিত কুঞ্জ মাঝে॥

বেণু মুখরিত ললিত তানে
যমুনা উছলিত বহে উজানে
বিশ্ববিমোহিত স্তব্ধজগজনে (বাঁশীর গানশুনে)
মুগ্ধ সুরনর মুনিসমাজে ॥
বাজত বীণা তাল রসায়ন
নাচত গাওত ব্রজতরুণী গণ
রাসে হরিসনে বিনোদ বন্ধনে
বিলসে বিনোদিনী মণ্ডলী মাঝে ॥
বিশ্বরূপ ভণিতাভাস
রাধামাধব প্রেম বিলাস
জয় মহারাস প্রেম রসযশ
জয় রসময় রসিক রাজে ॥

সম্পাদক

শ্রীশ্রীদোল-লীলা

(প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিত)

মজা রে ভাই! বেজায় মজা।

প্রথম মজা—তপন ও মদনদেবের। সূর্য্যদেব করিয়াছিলেন কি? শীতের দায়ে, বোধ হয় শীতকে তাড়াইবার উদ্দেশ্যেই—ধনু ধারণ করিয়াছিলেন। এদিকে বসন্ত ঋতুর আগমনের বড় বিলম্ব নাই, কাজে কাজেই কন্দর্প ঠাকুরকে পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইতে হইল। তিনি সূর্য্যদেবের নিকট হইতে ধনুকখানা কাড়িয়া লইলেন। শীতের আতিশয্যে প্রভাকর কিছু কমজোর কিনা, তাই, কামদেবকে বড় বেগ পাইতে হইল না। তখন তপনদেব বড় গোলে পড়িয়া গেলেন। পূর্ব্বে বৃশ্চিক লেলাইয়া দেখিয়াছিলেন, শীতের তাহাতে কিছু করিতে পারেন নাই। বরং শীত মহাশয় রাগিয়া উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়াছিলেন। তাই এবার অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মার্ত্তণ্ড-দেব মকরকে আশ্রয় করিলেন। মকর একে জলচর, শীত হজম করিবার শক্তি তাহার যথেষ্ট; তার উপর আবার গঙ্গাদেবীর বাহন বলিয়া বলও অসাধারণ। এইবার শীত মহাশয় একটু জব্দ হইয়া পড়িলেন;—"মকরে প্রখর রৌদ্র" ফুটিয়া উঠিল।

এদিকে হইল কি ? মদন ঠাকুর ধনু লইয়াই তাহার ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। অমনি চারিদিকে আম্রবৃক্ষগুলি মুকুলিত হইয়া উঠিল। তাহার মনোমদ গন্ধে মাতিয়া মধুকরবৃন্দ মঞ্জু গুঞ্জন জুড়িয়া দিল। পিককুলও অমনি উচ্চকণ্ঠে ঋতুরাজের আবাহনগীতি গাহিতে আরম্ভ করিল। যুবক যুবতীর প্রাণও যেন থাকিয়া থাকিয়া কেমন কেমন করিতে থাকিল। এ ও এক মজা মন্দ নয়।

ঋতুপতির সহিত রতিপতির প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। দুইজনে না জানি চুপ চুপি কি পরামর্শ আঁটিলেন। কামদেব অমনি সূর্য্যদেবের কাছে আবার যাইয়া হাজির হইলেন। সগর্ব্বে বলিলেন,—আমি হইতেছি মকর কেতন, আমার মকর আপনার রাখিবার অধিকার কি ?

মকরের জন্য উভয়ে অনেক কথা কাটাকাটি হইল। শেষে, কামদেবেরই জয় হইল। তিনি দিবাকরের নিকট হইতে মকরটিকে কাড়িয়া লইলেন। তখন তপনদেব মহাবিপদে পড়িয়া গেলেন। ভয়ে ভয়ে কুম্ভমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মনের ভাব বোধ হয়,—কুম্ভযোনি অগস্ত্য যখন সাগর শোষণ করিতে পারিয়াছিলেন, কুম্ভের আশ্রয়-প্রভাবে আমিও নিশ্চয় সমুদ্র-শোষণ-সামর্থ্য লাভ করিব। হইলও তাহাই। কুম্ভস্থ ভাস্করের প্রখরতা প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এইবার শীত বেচারি পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিলেন।

এদিকে হইল কি ? মদনদেব মকরের ধ্বজা ধরিয়া ঋতুরাজ বসন্তের বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অমনি বৃক্ষে বৃক্ষে নবীন কিসলয় গুলি উদগত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কে যেন তুলি দিয়া প্রকৃতির অঙ্গে কি এক কম-কোমল রক্তিম চিত্র অঙ্কিত করিয়া ফেলিল। পাটল পলাসের ফুলগুলি ফুট্ ফুট্ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া সেই লালছবিকে আরও ঘোরালো করিয়া তুলিল। তার পর, একে একে চারিদিকে কত রঙের কত ফুল ফুটিয়া উঠিয়া প্রকৃতি সুন্দরীকে অপূর্ব্ব সাজে সাজাইয়া দিল। ফুটন্ত ফুলের ভরভরে গন্ধে দিগ্‌দিগন্ত ভরিয়া গেল। দোয়েল, পাপিয়া, বুল্‌বুল্, কাকাতুয়া প্রভৃতি পক্ষীগুলির কল কাকলীতে যেন কতই না প্রেমের সঙ্গীত গীত হইতে লাগিল। দক্ষিণে পাগ্‌লা হাওয়া পুষ্পিত লতাগুলিকে উচ্ছ্বাসভাবে নাচাইয়া তুলিল। মাঝে মাঝে দম্‌কা হাওয়ায় "হো হো হোরি" রবের আবৃত্তি হইতে থাকিল।

বেড়ায় মজা ভাই ! বেজায় মজা !

প্রভাকর তো মকরকে লইয়া জাগতিক শীত বা জড়তা গ্রাস করাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, মদন ঠাকুর কিন্তু মকরকে দিয়া কামিজনের তো কথাই

নাই, যোগি মুনি তপস্বীরও ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য লজ্জা সরম ব্রত নিয়ম গ্রাস করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলেই সামাল সামাল! এ ও এক বিষম মজা!

এ রাজ্যের মজা তো এই পর্য্যন্ত, প্রকৃতির অতীত শ্রীবৃন্দাবনেও আজ বেজায় মজা। তাহারও একটু পরিচয় দিই।

এ রাজ্যের মদন—প্রাকৃত মদন; আর সে রাজ্যের যিনি মদন—তিনি হইতেছেন—অপ্রাকৃত মদন। তাই কবিরাজ গোস্বামী বলেন,—

"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামবীজ কাম গায়ত্র্যে যাঁর উপাসন॥"

এই মদন অপ্রাকৃত বলিয়াই চির নবীন, আর প্রাকৃত মদনের মোহন বলিয়া—মদনমোহন। শ্রীবৃন্দাবনে এই মদনের প্রভাব অসাধারণ। তাঁহার আকর্ষণ কাহারও উপেক্ষা করিবার যো নাই।

শ্রীবৃন্দাবনে এমনই তো চিরবসন্ত বিরাজমান। তার উপর আবার এই বসন্তসমাগমে তাহার অপূর্ব্ব সুষমা উছলিয়া উঠিয়াছে। পাখীর গানে, ভ্রমরের গুঞ্জনে, ময়ূরের নর্ত্তনে আবার সেই শোভাকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে। তার উপর যমুনার কল কল প্রেমের গাহনা প্রাণের মাঝে কি এক উন্মাদনা জন্মাইয়া দিতেছে। মধু চল চল ফুল্ল ফুলের গন্ধ ভরা মাতানো বাতাস তো একেবারে পাগল করিয়া তুলিতেছে। কি এক উল্লাসে—কি এক লালসে যেন সকলকে ধৈর্য্যহারা করিয়া ফেলিতেছে।

এমন সময় সেই অপ্রাকৃত নবীন মদন করিলেন কি, তাঁহার নিত্য সহচরী বাঁশরী লইয়া মাধুরী ভরা আলাপচারী আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে ঊর্দ্ধ অধ সকল লোক বংশীধ্বনিতে ভরপূর হইয়া উঠিল। শ্রীবৃন্দাবনে বিশেষতঃ ব্রজগোপীর মনে কিন্তু ইহার প্রভাব কিছু অধিক মাত্রায় প্রকাশ পাইল। কবিরাজ গোস্বামী বলেন,—

"যে বা বেণু কলধ্বনি, একবার তাহা শুনি,
জগন্নারী চিত্ত আউলায়।
নীবিবন্ধ পড়ে খসি, বিনামূলে হয় দাসী,
বাউলী হঞা কৃষ্ণ পাশে ধায়॥"
(শ্রীচরিতামৃত, অন্ত্য ১৭)

হইলও তাহাই, বহু ভাগ্যফলে যাঁহাদের কর্ণে বংশীধ্বনি প্রবেশ করিল, অমনি তাঁহারা আলুথালু ভাবে পাগলের মত বংশীধারীর নিকটে আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। প্রধানতঃ যাঁহার জন্য বাঁশরী বাদন, সেই সর্ব্বগোপীপ্রধানা শ্রীমতী রাধিকাও আসিলেন। প্রেমের ভরা গাঙে বান ডাকিয়া গেল,—প্রীতি-পূত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের পুরা হাট বসিয়া গেল। মোহন মজা ভাই। শোভন মজা!

ছোট বড় যেখানকার যত আনন্দ, সকল আনন্দের মূল কেন্দ্র হইলেন শ্রীবৃন্দাবনের এই কন্দর্প ঠাকুরটি। তাঁহারও আবার আনন্দদায়িনী হইলেন—হ্লাদিনীর পরম সার স্বরূপা শ্রীমতী রাধিকা। এই আনন্দ পরমানন্দের মিলনে আমাদের কল্পনার—আমাদের বর্ণনার অতীত অপ্রাকৃত আনন্দের অফুরন্ত ফোয়ারা ছুটিতে লাগিল।

প্রথম নয়ন কোণে, তারপর ঠোঁটের কোণে হাসি;—শেষে রাশি রাশি হাসি আরম্ভ হইল। তারপর একটী আধটী কথা হইতে হইতে ব্যঙ্গ বিদ্রুপের দুর্দ্দম্য দাপটে হৃদয়ের কপাট খুলিয়া গেল। এইবার কণ্ঠ ভেদ করিয়া প্রাণের গাহনা বাহির হইয়া পড়িল। তালে তালে পদতলও টলিতে আরম্ভ করিল। নাচ গান হাসিতেই আনন্দের অভিব্যক্তি;—আনন্দের সাকার মূর্ত্তি যেন সর্ব্বজন দৃশ্য হইয়া পড়িল।

বেজায় মজা ভাই। বেজায় মজা!

এইবার শ্রীবৃন্দাবনের পশুপক্ষী বৃক্ষ বল্লরী—তারাও সব কি এক আনন্দে মাতিয়া নাচিয়া উঠিল। বৃক্ষে বৃক্ষে কুসুম শোভিত ব্রততীগুলি দুলিতেছে, মধুলুব্ধ মধুকরকুল বসিতে না পাইয়া ব্যাকুলভাবে ভোঁ ভোঁ রবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ফুটন্ত ফুলের পরাগগুলি বায়ুভরে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়াই বোধ হয়, ঐ আনন্দকন্দ নবীন কন্দর্পের দোলনলীলা খেলিবার সাধ হইল। দেখিতে দেখিতে গাছের ডালে দোলন চৌকী খাটানো হইয়া গেল। আবীর, কুঙ্কুম, পিচ্‌কারীও কে কোথা হইতে আনিয়া উপস্থিত করিল। প্রাণখোলা নাচ গান হাসির মাঝে শ্রীশ্রীরাধা মদনমোহনের শ্রীশ্রীদোলন খেলা ও ফাগু খেলা আরম্ভ হইয়া গেল। নিত্য নূতন শ্রীবৃন্দাবন এইবার আর এক নূতন শ্রী ধারণ করিল। কবির ভাষাতেই তাহার বর্ণনা করি,—

"মধুবনে মাধব দোলত রঙ্গে।
ব্রজবনিতা ফাগু দেই শ্যাম-অঙ্গে॥
কানু ফাগু দেয়ল' সুন্দরী অঙ্গে।
মুখ মোড়ল ধনী করি কত ভঙ্গে॥

ফাগুরঙ্গে গোপী সব চৌদিকে বেড়িয়া।
শ্যাম অঙ্গে ফাগু দেই অঞ্জলি ভরিয়া॥
ফাগু খেলাইতে ফাগু উঠিল গগনে।
বৃন্দাবন তরুলতা রাতুল বরণে॥
রাঙ্গা ময়ূর নাচে কাছে রাঙ্গা কোকিল গায়।
রাঙ্গা ফুলে রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায়॥
রাঙ্গা বায় রাঙ্গা হৈল কালিন্দীর পানী।
গগন ভুবন দিগ্-বিদিগ্ না জানি॥"

বেজায় মজা নয় কি ভাই? আয় আয় ভাই! নিরানন্দে নিত্য নিমগ্ন আমরা, আজ এই শুভ দোলযাত্রার দিনে আনন্দময়ের এই আনন্দময় লীলায় আপনাকে ডুবাইয়া আনন্দময় করিয়া ফেলি, আর গলা ছাড়িয়া বলি—জয় কন্দর্পদর্পহারি অভিনব কন্দর্প শ্রীশ্রীমদনমোহনের জয়,—জয় শ্রীশ্রীমদনমোহনের মনোমোহিনী শ্রীশ্রীরাধিকাসুন্দরীর জয়!

জয় জয় নন্দলাল,　　　　আবীর গুলালে লাল,
　　জয় লাল রাধিকাসুন্দরী।
জয় লাল সখীগণ,　　　　ফাগুরঙ্গে নিমগন,
　　জয় লাল পিক শুক শারী॥
জয় লাল বৃন্দাবন,　　　　লালে লাল রজোগণ,
　　জয় লাল ময়ূর ময়ূরী।
জয় লাল ফুল্ল ফুল,　　　　তাহে লাল অলিকুল,
　　জয় লাল পাদপ বল্লরী॥
জয় লাল গাভীগণ,　　　　পশু কীট অগণন,
　　জয় লাল যমুনার বারি।
জয় লাল ব্রজবাসী,　　　　হাসিমাখা মুখশশী,
　　জয় লাল ফাগু পিচ্‌কারি"
অতুল রাতুল লীলা,　　　　ভাবিয়া বাতুল হৈলা
　　বাহু তুলি কহয়ে ফুকারি।
জয় লাল দোললীলা,　　　　আনন্দের মহামেলা,
　　শ্রীলীলায় যাই বলিহারি॥

—০—

হরিনামামৃত

কই কই হরিনামামৃত! যে অমৃত পানে জগৎ সংসার ভুলিয় গুণমণি গোরা, প্রেমে মাতোয়ারা হ'য়েছিলেন, দুর্বৃত্ত জগাই মাধাই দুই ভাই উদ্ধার লাভ ক'রেছিল, প্রহ্লাদ নানা বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। যে নাম স্মরণে কৃষ্ণ-বিরহ জনিত দুঃখ কাতরা শ্রীমতী রাধার কমলনয়ন আনন্দে উৎফুল্ল, নয়নের দীপ্তিতে প্রফুল্ল পুণ্ডরীক প্রভা পরাভূত হ'য়েছিল। যে অমৃত স্বর্গের দেবতারা প্রাণভরে পান করেন, ভক্তচূড়ামণি নারদ মুনি বীণাযন্ত্রে যে নাম-মঙ্গল অহঃরহ কীর্ত্তন করতেন। হরিদাস, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য্য প্রভৃতি কৃষ্ণপরায়ণ পরম পুরুষগণ যে নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া জগতে নিত্যসত্য শুদ্ধ প্রেমের বন্যা বহাইয়াছিলেন, যে নাম-তরঙ্গে তরুলতা গিরিকন্দর, নদী সরোবর, জলদ পটল স্তম্ভিত, প্রজাপতি বিস্মিত, তাপসকুল ধ্যানচ্যুত, সাধক সমাধিস্থচন, কই কই সেই হরিনামামৃত।

কই কই সেই সর্ব্বসন্তাপহারী, বিঘ্নবিনাশিনী, মারীভয়-নিবারিণী হরিনামামৃত! যে নামামৃতে পাষাণ গলে, প্রেম-মন্দাকিনী ছোটে, কুসুমকলি ফুটে শুষ্কতরু মুঞ্জরে। যার প্রাণ মাতান মধুর স্বরে শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হয়, বিষয় বাসনা বিদূরিত হয়, শোণিতে শোণিতে, শিরায় শিরায়, লোমকূপে লোমকূপে ভাবের অলকানন্দা ছোটে, শান্তির উৎস প্রবাহিত হয়। কই সে হরিনামামৃত।

কই কই সেই হরিনামামৃত। কই সেই কলুষকল্মষনাশিনি, ভক্তি প্রেম প্রদায়িনী, সঞ্জীবনী সুধা? যেনাম মাধুরীতে জিহ্বার জড়তা যায়, মুকের মুখ ফোটে, বধিরের বধিরতা যায়, জ্বালা যন্ত্রণা, ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারিত হয়। যে নাম শ্রবণে পাষাণ প্রাণেও অশ্রুধারা নির্গত হয়, পাষণ্ড হৃদয়ে প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠে, স্থিতধীর চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। যেনাম, জীবনে মরণে, আনন্দে বিষাদে, আঁধারে আলোকে, আহারে বিহারে, সুখে দুঃখে পরাবিদ্যাময়ী বধুর প্রাণরূপে বিরাজ করে। যে নাম মহামন্ত্রে ধ্রুব সারা বিশ্বময় পদ্মপলাশ লোচন শ্রীমধুসূদন হরিকে দেখিয়াছিলেন, গয়াসুরের শ্রীপাদপদ্ম, বিল্বমঙ্গলের জ্ঞানচক্ষু লাভ হইয়াছিল, গোপীগণের কৃষ্ণভক্তি জাগিয়াছিল. ভক্তদ্বেষী চাপাল গোপাল মহাব্যাধির করাল কবল হইতে নিস্তার পাইয়াছিলেন। যে

নামামৃত কলি-যুগপাবনাবতার শ্রীচৈতন্যদেব আপামর জনসাধারণকে বিনামূল্যে বিলাইয়াছিলেন। সে হরিনামামৃত কই?

কই কই সেই হরিনামামৃত? ওই যে ভক্তনের খঞ্জনী বাজিতেছে। ওই দেখ, স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে; দেবতারা মৃদঙ্গ করতালের তালে তালে আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। এস ভাই বন্ধু, এস পাপী তাপী, এস সাধুভক্ত! আজ পবিত্র তুলসীতলে মধুর হরিনামামৃত আচণ্ডালে বিতরিত হবে। এস সকলে মিলিয়া আজ হরিনামামৃত পান ক'রে জীবন জনম সার্থক করি। বল হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর রায় চৌধুরী

দিগ্বিজয়ীর মুক্তিলাভ

অষ্টাদশ বর্ষ বয়সেই নিমাই পণ্ডিত নদীয়ার মাঝে একজন বড় পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। নবদ্বীপ পণ্ডিতের স্থান—শতশত মহামহোপাধ্যায়ের শাস্ত্র চর্চ্চায় মুখরিত। এহেন বাণীর প্রিয়-নিকেতনে নিমাইচাঁদ অসংখ্য অত্যুজ্জ্বল তারকা বেষ্টিত পূর্ণকলা শশধরের মতই শোভিত হইয়াছিলেন। তখন প্রাকৃত বিদ্যার জয় জয়কার চলিতেছে, আর অল্প বয়সে মহাপণ্ডিত শচীর দুলাল এই প্রাকৃত বিদ্যা লইয়া ভোজ বাজি আরম্ভ করিয়াছেন,—

"হয় ব্যাখ্যা নয় করে নয় করে হয়।
সকল খণ্ডিয়া শেষে সকল স্থাপয়॥" (চৈঃ ভাঃ)

নিমাই পণ্ডিতের নামডাকও যথেষ্ট হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার শিষ্যের অন্ত নাই।

"কত বা প্রভুর শিষ্য তার অন্ত নাই।
কত বা মণ্ডলী হ'য়ে পড়ে ঠাঁই ঠাঁই॥
প্রতিদিন দশ বিশ ব্রাহ্মণ কুমার।
আসিয়া প্রভুর পায়ে করে নমস্কার॥"

কাল ও স্থান মাহাত্ম্য বজায় রাখিবার জন্য আমাদের শচীর দুলালটীও

যথেষ্ট গর্ব্বিত হইয়াছেন। বড় বড় পণ্ডিতেরাও তর্ক-যুদ্ধে তাঁহাকে আটিয়া উঠিতে পারেন না।

"প্রভু বোলে তারে আমি বলিয়ে পণ্ডিত।
একবার ব্যাখ্যা করে আমার সহিত॥"

এ সময়ে যাঁহারা খুব বড়দরের পণ্ডিত হইতেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহাদের সারাজীবনের কঠোর মস্তিষ্ক সঞ্চালন ও কচ্‌ কচির ফল স্বরূপ দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া এক এক জয়পত্র কপালে বাঁধিতে পারিলেই নিজের জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিতেন, আর গর্ব্বের উচ্চ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ধরাকে সরাজ্ঞান করিতেন।

সেই সময়ে কেশব কাশ্মীরী নামক জনৈক কাশ্মীর দেশীয় মহাপণ্ডিত, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশী, কাঞ্চি, দ্রাবিড় প্রভৃতি মহা মহা পণ্ডিতের স্থান সমূহ জয় করিয়া শেষে নবদ্বীপে আসিয়া পড়িলেন। এই নবদ্বীপ জয় করা হইলেই তাঁহার দেশ জয় করা শেষ হইবে। চাল চলন বড় লোকের মত। সঙ্গে হাতীঘোড়া লোক জন বিস্তর আছে। তিনি নবদ্বীপ আসিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যদি কেহ পণ্ডিত থাকেন আসিয়া আমার সহিত বিচার করুন, নতুবা জয় পত্র লিখিয়া দিন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি নবদ্বীপে তখন শত শত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিরাজিত ছিলেন। যেমন;—রঘুনাথ, রঘুনন্দন প্রভৃতি। কিন্তু কেহই কেশবের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন না। কারণ এই কাশ্মীর দেশীয় পণ্ডিতটীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই একটা কথা রটিয়াছে যে, কেশব স্বয়ং সরস্বতীর বরপুত্র। আর সরস্বতী স্বয়ং তাঁহার জিহ্বায় বসিয়া বিচার করেন। সুতরাং সামান্য মানুষে তাহাকে কিরূপে বিচারে পরাস্ত করিবে? ভয়ে সকলেই মাথা হেট করিলেন, আর ভাবিতে লাগিলেন এখন কিরূপে নবদ্বীপের মান থাকে।

এমন সময়ে কেশবের সহিত নিমাই পণ্ডিতের দেখা হইল। সে কিরূপে বলিতেছি। তখন গ্রীষ্মকাল, জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, নিমাই পণ্ডিত তাঁহার অভ্যাস মত বহু শিষ্য লইয়া সুরধুনী তীরে শাস্ত্র চর্চ্চা করিতেছেন। দৈবক্রমে সেইদিন দিগ্বিজয়ী সেই পথ দিয়া যাইতে ছিলেন। তিনি শুনিলেন নিমাই পণ্ডিত সেখানে আছেন। নিমাই যে বড় পণ্ডিতের মধ্যে একজন তাহা তিনি জানিতেন। সুতরাং নিমাই যে কেমন পণ্ডিত তাহা একবার দিগ্বিজয়ীর জানিয়া যাইবার

ইচ্ছা হইল। তখন নিমাইর নিকট গমন করিয়া তিনি নিজ জনের দ্বারা আপনার পরিচয় দিলেন। নিমাই শুনিয়া শিষ্যগণ সহ দণ্ডায়মান হইয়া মহা সমাদরে পণ্ডিতকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। বালক পণ্ডিতকে দেখিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত গর্ব্বভরে বলিতেছেন, "তুমি নিমাই পণ্ডিত ?" নিমাই বিনীত ভাবে মাথাটী হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন কিছু বলিলেন না। তখন কেশব একটু গম্ভীর ভাবে বলিতেছেন, "তুমি অল্প বয়স্ক বটে কিন্তু ব্যাকরণে তোমার প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়াছে একথা আমি শুনিয়াছি।" তখন নিমাই বলিতেছেন, "হাঁ। আমি পড়াই বটে কিন্তু সে আমার ধৃষ্টতা মাত্র, আমি ব্যাকরণের কি বুঝি; আপনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আপনার সহিত কথা বলিবারও আমি উপযুক্ত নহি।" আবার বলিতেছেন—"সম্মুখে এই গঙ্গা রহিয়াছেন, আপনি কৃপা করিয়া যদি কিছু গঙ্গা স্তব রচনা করিয়া আমাদিগকে শুনান তাহা হইলে আমরা কৃতার্থ হই এবং আমাদের পাপও অন্তর্হিত হইয়া যাইবে।" কেশব ইহাতে সম্মত হইলেন এবং স্তব পড়িতে লাগিলেন।

কেশব ঝড়ের মত স্তব পড়িয়া যাইতেছেন। একটী স্তোত্র আবৃত্ত করিয়াই আবার একটী পাঠ করিতেছেন। মুহূর্ত্ত মাত্রও চিন্তা না করিয়া অনর্গল আওড়াইয়া যাইতেছেন। বহুক্ষণ স্তোত্র আওড়াইয়া দিগ্বিজয়ী থামিলেন। তাঁহার অমানুষী কার্য্য দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছেন। ছাত্রগণ ভাবিতেছেন এমন অদ্ভুত পণ্ডিতের সহিত তাহাদের গুরুদেব পারিবেন কিনা ?

কিন্তু নিমাই পণ্ডিত কিছুমাত্র আশ্চার্য্য হন নাই। তিনি দিগ্বিজয়ীর কবিত্ব শক্তির ভুয়সী প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন, "আপনি এক্ষণে একবার যে সমস্ত শ্লোক পাঠ করিলেন তাহার একটী লইয়া বিচার করিয়া আমাদিগকে তৃপ্ত করুন। কারণ, দোষগুণ বিচার না করিলে উহা ভালরূপ আস্বাদন করা যাইবে না।

দিগ্বিজয়ী জানিতে চাহিলেন কোন শ্লোকটী তাহাকে বিচার করিতে হইবে। তখন নিমাই তাহার পঠিত বহু শ্লোকের মধ্যে এইটি আওড়াইলেন—

"মহত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং।
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণ কমলোৎপত্তি সুভগা ॥

দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্য চরণা।
ভবানী ভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভূতগুণা॥ চৈঃ চঃ আদি ১৬

এবার দিগ্বিজয়ীর বিস্মিত হইবার পালা। কারণ তিনি ঝড়ের মত শ্লোক পড়িয়া গিয়াছেন নিমাই তাহার মধ্য হইতে কিরূপে একটী মুখস্থ করিল? মহাবিস্মিত ভাবে দিগ্বিজয়ী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নিমাই পণ্ডিত রহস্য করিয়া বলিলেন—"দেবী সরস্বতীর বরে কেহ কবি হয় আবার কেহবা শ্রুতিধর হয়।" এই কথায় কেশবের মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে নিমাই একজন শ্রুতিধর পণ্ডিত। ইহাতে তাঁহার নিমাই এর প্রতি একটু ভক্তি জন্মিয়াছে। তখন তিনি একটু কষ্ট করিয়া সেই শ্লোকের গুণ বিচার করিতে লাগিলেন। গুণ বিচার শেষ হইলে, নিমাই বলিতেছেন, "আপনার পাণ্ডিত্যে আমি মুগ্ধ হইলাম এক্ষণে ঐ শ্লোকে কি কি দোষ আছে তাহা বলুন।"

কথাটা শুনিয়া দিগ্বিজয়ী কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তাহার শ্লোকের যে দোষ থাকিতে পারে এমন অদ্ভুত কথা তিনি কখনও শোনেন নাই। বলিলেন "নিমাই পণ্ডিত! তুমি শিশু শাস্ত্র ব্যাকরণে পণ্ডিত। কিন্তু দোষ গুণ বিচার করিতে হইলে অলঙ্কার শাস্ত্রে জ্ঞান থাকা চাই। তুমি দোষ গুণের বিষয় কি বুঝিবে।

নিমাই বিনীত ভাবে বলিলেন "আমি অলঙ্কার শাস্ত্র পড়ি নাই, কিন্তু পণ্ডিত গণের মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাতেই আপনার শ্লোকে যে যে দোষ আছে তাহা বিচার করিতেছি।" নিমাই কেমন সুন্দর ভাবে শ্লোকের দোষ বাহির করিয়া বিচার করিয়াছিলেন তাহা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আদিলীলা ১৬শ পরিচ্ছেদে অতি বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, আমরা বাহুল্য বোধে এ স্থলে আর তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম না। কেশব কাশ্মিরী তখন পাগলের মত হইয়া নিজপক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু ফলে কিছু না হওয়ায় নিমাই পণ্ডিতের শিষ্যগণ হাস্য করিতে লাগিল।

ইহাতে নিমাই পণ্ডিত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া দিগ্‌বিজয়ীকে বলিলেন। "কবিত্বে দোষ থাকা আর বিচিত্র কি? বড় বড় কবিগণের এমন কি কালিদাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিগণের কবিত্বেও দোষ আছে। তবে কবিত্বশক্তি থাকাই ভাগ্যের কথা। সেই কবিত্ব শক্তি আপনাতে প্রচুর পরিমাণে আছে। সুতরাং আপনার কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই। অদ্য

রাত্রি অধিক হইয়াছে, গৃহে গমন করুন কল্য আবার বিচার করা যাইবে।"

দিগ্‌বিজয়ী গৃহে গমন করিয়া দেবী সরস্বতীর স্তব করিতে লাগিলেন। এইরূপে রাত্রি অবসান হইল। তখন তিনি প্রত্যুষে উঠিয়া একেবারে নিমাই পণ্ডিতের বাটী আসিয়া হাজির হইলেন। নিমাই বাহিরে আসিলে তিনি তাঁহার চরণে পড়িলেন। ইহাতে নিমাই অতি ব্যস্ত হইয়া দুই হাত ধরিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন এবং বলিলেন "আমি আপনার নিকট একজন সামান্য ছাত্র মাত্র। আপনি প্রবীন পণ্ডিত, আপনার এইরূপ দৈন্যে আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। আর ইহাতে আমি নিজকে অপরাধী বিবেচনা করিতেছি।" তখন কেশব কাশ্মিরী বলিলেন, "আমার কিছু বলিবার আছে, আপনি কৃপাপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। আমি আপনার নিকট পরাজিত হইয়া সারারাত্রি দেবী সরস্বতীর বন্দনায় কাটাইয়াছি, শেষ রাত্রে একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, সেই অবস্থায় দেখিলাম দেবী আমাকে বলিতেছেন "বৎস! তুমি দুঃখিত হইওনা, তুমি যাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছ তিনি আমার কান্ত সুতরাং তাঁহার অগ্রে আমার প্রতিভা স্ফুর্ত্তি পায় না। তুমি এতদিন ধরিয়া আমার সাধনা করিয়া আসিয়াছ কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এতদিনে তোমার সে সাধনা ফলবতী হইয়াছে। প্রত্যুষে গিয়া তুমি তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ কর।" তাঁহার আজ্ঞায় আজ হইতে আমি আপনার ঐ অভয়পদ কমলে শরণ লইতেছি। হে দেব! আজ আমার চক্ষু ফুটিয়াছে। এতদিন বৃথা অফল বিদ্যার চর্চ্চায় কালাতিপাত করিলাম। দয়াময় দয়া করিয়া এখন হইতে আমাকে আপনার করিয়া লউন। আমার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিন।" ইহা বলিয়া কান্দিতে কান্দিতে দিগ্বিজয়ী আবার নিমাই পণ্ডিতের চরণে পড়িলেন, ইহাতে নিমাই তাঁহাকে কি বলিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ নাই। কিন্তু দিগ্‌বিজয়ী বাসায় আসিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বিতরণ করিয়া দণ্ড কমণ্ডলু ও কৌপীন ধারী হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া চিরতরে চলিয়া গেলেন। তাই দিগ্বিজয়ীর প্রতি প্রভুর কৃপা প্রদর্শন ভক্তি পূর্ব্বক পাঠ করিলে জীবের ভব-বন্ধন নাশ হয়। আর আপনারা দেখিতেছেন আমাদের প্রভুতে কি জাতীয় ক্ষমতা ছিল। সুতরাং আসুন পাঠক! আমরা সমস্ত ত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণে মস্তক বিক্রয় করি। এমন দয়ার ঠাকুর আমরা আর কোথায় পাইব। সুতরাং আসুন আমরা কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করি।—

অনুপম গোরা অবতার।

নবধা ভকতি রসে, বিস্তারিলা সবদেশে, না করিল জাতির বিচার ॥ ধ্রু ॥
এখন ঠাকুর ভজ, দূর কর সব কাজ, ছাড় সব মিছা অভিলাষ।
চৈতন্য চাঁদের গুণে, আলো করে ত্রিভুবনে, অনায়াসে হৈল পরকাশ ॥
চৈতন্য কল্পতরু, অখিল জীবের গুরু, গোলক বৈভব সব সঙ্গে।
জীবেরে মলিন দেখি, হইয়া করুণ আঁখি, হরিনাম বিলাইল রঙ্গে ॥
যজ্ঞ যপ ধ্যান পূজা, অন্যযুগে যত পূজা, সাধিলেক অতি বড় দুঃখে।
এই যে কলির ঘোরে, নরে যত পাপ করে, নাম লৈঞা তরি যায় সুখে ॥
করুণা বিগ্রহ সার, তুলনা কি দিব আর, পতিতের পুরাইল আশ।
কিছু না বুঝিয়া চিত্তে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া পথে, গুণ গায় নরহরি দাস ॥

শ্রীভোলানাথ ঘোষবর্ম্মা

তত্ত্বসার

"বদন্তি তৎতত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে" ॥ (ভাগবত ১।২।১১)

তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিগণ যাঁহাকে অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব বলিয়া ঘোষণা করেন, তিনিই ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং শ্রীভগবান্—এই ত্রিবিধ আখ্যায় অভিহিত হন। যিনি একমাত্র তত্ত্ববস্তু, যাঁহাকে জানা সকলেরই কর্ত্তব্য, যিনি দ্বৈতবিরহিত অর্থাৎ যাঁহার সমান কেহ নাই বা যাঁহার সত্তা ব্যতিরেকে দ্বিতীয় কাহারও অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, তাঁহাকেই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব বলে।

"অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ ধরে তিন রূপ ॥"

দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্যামসুন্দরই অদ্বয় তত্ত্ববস্তু। তিনি ব্রহ্মজ্ঞানীর

নিকট ব্রহ্মরূপে, যোগীগণের নিকট পরমাত্মা রূপে ও ভক্তগণের নিকট ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবান্ রূপে প্রকাশিত হন।

"জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনার বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে।"
"ব্রহ্ম অঙ্গকান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষ প্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে।"

স্বীয় অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে আপন স্বাভাবিক শক্তি সমূহকে অন্তমিত করিয়া, সাধকের নিকট নির্ব্বিশেষ রূপে যে প্রতীয়মান—তাহার নাম ব্রহ্ম। মোটা কথায় বলিতে গেলে বলা যায় যে, শ্রীভগবানের অঙ্গজ্যোতিই ব্রহ্ম। শাস্ত্রেও তাহার প্রমাণ আছে।

"যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড কোটি-
কোটিষ্বশেষ বসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষ ভূতং
গোবিন্দমাদি পুরষং তমহং ভজামি।" (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৫)

ব্রহ্মা বলিতেছেন, যাঁহার প্রভায় কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড প্রভাবিত, অনন্তকোটী বসুধায় যাঁহার বিভূতি, সেই কলাশূন্য আদি অন্ত বিরহিত ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গপ্রভা, আমি সেই আদিপুরষু গোবিন্দকে ভজনা করি।

"বেদৈর্যৎকীর্ত্ত্যতে তেজো ব্রহ্মেতি প্রবিভজ্য বৈ।
তদেবেদং বিজানেহহং রূপমীশানমীশ্বর।" (হরিবংশ)

বেদ যাঁহাকে তেজোময় ব্রহ্ম বলিয়া উল্লেখ করেন, আমি তাঁহাকে শ্রীভগবানের রূপ বলিয়া জানি। গীতাতেও পাওয়া যায় যে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং" আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। তাই শ্রীচরিতামৃতকার বলিতেছেন—

"কৃষ্ণের অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ মণ্ডল।
উপনিষৎ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল,
(আর) পরমাত্মা যিঁহো তিঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার আত্মা হয় কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস।"

অংশ বলিতে ভগ্ন পাষান খণ্ডের মত পরিচ্ছিন্ন মনে করা ভুল, যেহেতু শ্রীভগবান অব্যয়, অখণ্ড অনন্ত এবং পূর্ণ। "শক্তে র্ব্যক্তি তথাব্যক্তিস্তারতম্যস্য কারণম্" শক্তির অভিব্যক্তি আর অনভিব্যক্তি

দেখিয়াই ভগবত্তত্ত্বের অংশপূর্ণ বিচার। পরমাত্মা তত্ত্ব শ্রীভগবানের অল্প শক্তির প্রকাশ। যেহেতু শ্রুতি বলেন "পাদোঽস্য ভূতানি ত্রিপাদস্য পরংদিবি" শ্রীভগবানের একপাদ বিভূতি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত আর ত্রিপাদ বিভূতি তাঁর পরব্যোমে। গীতাও বলিয়াছেন—

"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।" গীতা ১০।৪১

হে অর্জুন! তোমার অধিক জানিবার প্রয়োজন কি? তুমি একেবারে জানিয়া রাখ যে, আমি একাংশে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছি। শ্রীভগবান পরমাত্ম তত্ত্বেই এই অনন্ত কোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন। "অততি সর্ব্বং বিশ্বমিতি আত্মা" যিনি নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন তিনিই পরমাত্মা। অতএব দেখা যাইতেছে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণেরই এক অংশ।

"আত্মান্তর্য্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেই গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয়।
অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ পরকাশে।"

আকাশস্থ এক সূর্য্য যেমন অনন্ত স্ফটিক স্তম্ভে ভাসিয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীভগবান একাংশে এই অনন্ত কোটী জীব হৃদয়ে বিরাজ করেন। ইহা তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিরই নিদর্শন। আর যিনি ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ শ্রীভগবান, তিনি পরব্যোমাধিপতি লক্ষ্মীকান্ত মূল নারায়ণ। মায়ার অতীত স্থানকে পরব্যোম বলে। সেখানে ভগবান নারায়ণ স্বীয় সুনন্দাদি নিত্য পার্ষদগণ সহিত নিত্যানন্দে বিহার করিতেছেন।

"ভক্তিযোগে ভক্ত পায় তাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যেমন অবিগ্রহ দেখে দেবগণ॥"

দেবতাবৃন্দ যেমন দিব্য চক্ষু প্রভাবে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যমণ্ডলস্থ শ্রীসূর্য্য-দেবকে দর্শন করিয়া থাকেন, ভক্ত তেমনই ভক্তিপূর্ণ প্রাণে সেই আনন্দ-ঘন বিগ্রহের নিত্য সত্য দিব্যরূপ, দিব্যগুণ, ও দিব্যলীলাদির প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ইনি 'অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ববস্তু শ্রীকৃষ্ণের বিলাসাখ্য রূপ। স্বয়ংরূপ বা স্বরূপ সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।"

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ বিষ্ণু পরতত্ত্ব।
পূর্ণানন্দ পূর্ণজ্ঞান পরম মহত্ত্ব।

তত্ত্বত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীশ অভেদ স্বরূপ। কিন্তু রসের উৎকর্ষ, রূপের মাধুর্য্য ও লীলালাবণ্যাদির সৌন্দর্য্যাধিক্যে শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশাস্ত্রে স্বয়ং ভগবানরূপে স্বীকৃত। "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।" "ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ" একঃ কৃষ্ণঃ বশী সর্ব্বা, কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতং। আরও দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গার রসবান মূর্ত্তি দেখিয়া নারায়ণ-বক্ষ বিলাসিনী লক্ষ্মী দেবীও বিহ্বলা হইয়া তাহাকে পাইবার নিমিত্ত উগ্রতপস্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃন্দাবনে চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ দেখিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া গোপীগণের মনে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্যের উদয় হয় নাই। তবেই বুঝা যাইতেছে যে, কৃষ্ণরূপ অসমোর্দ্ধ এবং লাবণ্যসার! এরূপ আত্ম পর্য্যন্ত মুগ্ধকর। এই অসমোর্দ্ধ রূপরাশি দিব্য অনন্ত ঐশ্বর্য্য নিচয়, এবং লীলা-লাবণ্যের বিচিত্র তরঙ্গ বিলাস দেখিয়া সর্ব্বজ্ঞকল্পা মুনিগণ-শিরোমণি, বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে "এতে চাংশ কলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" এই অমোঘ বাণী দিব্যকণ্ঠে নিনাদিত করেন।

"কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত বৈভব অপার।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি আর॥
"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে" ॥ (বিষ্ণুপুরাণ—৬,৭।৬১)

ভগবান বিষ্ণুর স্বাভাবিক তিন শক্তি। পরা, অপরা অবিদ্যা। তাহাদেরই নামান্তর চিৎ, জীব ও মায়া। চিৎশক্তি আবার ত্রিবিধা। হ্লাদিনী, সন্ধিনী আর সম্বিৎ।

"আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥"
হ্লাদিনী যারায় করে ভক্তের পোষণ।

শ্রীভগবান যে শক্তি প্রভাবে আনন্দ স্বরূপ হইয়াও নিজে আনন্দ আস্বাদন করেন ও ভক্তগণকে আনন্দিত করান, তাহাই তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি।

ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ"।
হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেম সার ভাব॥

ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম মহাভাব।
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণমণি সর্ব্ব কান্তা শিরোমণি।"

অন্যান্য গোপীগণ ও কান্তাগণ তাঁর হ্লাদিনী শক্তিরই প্রকাশ। লক্ষ্মী দুর্গাদি শক্তিগণ শ্রীরাধার অংশবিভূতি। "যস্যাংশে লক্ষ্মী দুর্গাদিকা শক্তয়ঃ" শ্রুতি।

"কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার"॥

আর যাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতাদি গুরুবর্গের প্রকাশ, যাহা হইতে বৈকুণ্ঠ গোলোকাদি ধামের প্রকাশ তাহাই তাঁহার সন্ধিনী শক্তি। এই গেল চিচ্ছক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তার পর তার জীব শক্তির ব্যাপার। জীব শক্তি অনন্ত এবং প্রত্যেকটী অনু পরিমাণ। "অনুমাত্রোপ্যয়ং জীবঃ স্বদেহং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। যথা ব্যাপ্য শরীরাণি হরিচন্দন বিপ্রুষা"। (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ) এক বিন্দু হরিচন্দন যেমন সর্ব্ব শরীরকে আহ্লাদিত করে, অনুপরিমাণ জীবও তদ্রূপ, একস্থানে থাকিয়া শরীরে সমস্ত স্থানে চৈতন্য শক্তির সঞ্চালিত করেন।" এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্য" শ্রুতি। এই অনুপরিমাণ আত্মাকে বিশুদ্ধ চিত্তে পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। "কেশাগ্র শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্যচ ভাগো জীবঃ"। কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিলে যে পরিমাণ হয়, তাহাকে আবার শতভাগ করিলে যত সূক্ষ্ম হয়, জীব তত সূক্ষ্ম। শ্রীভগবান নিজমুখেই বলিয়াছেন "সূক্ষ্মানামপ্যহং জীবঃ" (গীতা) সূক্ষ্ম বস্তুর মধ্যে আমি জীব।

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥"

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস, কেননা সে শ্রীভগবানের তটস্থা শক্তি। শক্তির কার্য্য শক্তিমানের সেবা করা। জীব নিত্যসেবক, শ্রীকৃষ্ণ নিত্যপ্রভু। এই নিত্যবোধের বিস্মৃতিই তার বন্ধন, আর এই নিত্যবোধের উদ্বোধনই তার মুক্তি।" মুক্তির্হি স্ব-স্বরূপেন ব্যবস্থিতি" অন্যথা রূপ ত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থানের নাম মুক্তি। স্বরূপ শব্দের অর্থ শ্রীভগবান। জীব অনাদি কাল হইতেই এই শ্রীভগবানকে বিস্মৃত হইয়াছে।

"কৃষ্ণ ভুলি জীব হয় অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় নানা দুঃখ॥

মায়া শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি। শুধু ভ্রম বা অসৎ নহে।

মায়া দ্বিবিধ। মায়া ও প্রধান। প্রথমামদ্বিধা। আবরনাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা। আবরনাত্মিকা শক্তি দ্বারা জীবের নিজ স্বরূপকে আবৃত করিয়া বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি দ্বারা দেহে আত্মবোধ জন্মাইয়া থাকে। প্রধানের অপর নাম প্রকৃতি। "সত্ত্বং রজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতে র্মহান, মহতোঽহংকারঃ, অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রানি, পঞ্চতন্মাত্রাদ্যুভয় মিন্দ্রিয়ম্" সত্ত্বরজস্তম এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। এই জড়রূপা প্রকৃতির প্রতি শ্রীভগবান ঈক্ষণ করিলে তাহার সাম্যাবস্থা ক্ষুব্ধ হইয়া মহত্তত্বের সৃষ্টি হয়। মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র শব্দ স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ পঞ্চতন্মাত্র হইতে উভয় ইন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় বাক্‌পানি, পাদ, পায়ু উপস্থ। জ্ঞানেন্দ্রিয় - চক্ষু কর্ণ জিহ্বা নাসিকা ত্বক্‌ প্রকাশ পাইয়াছে। আবার শব্দ তন্মাত্র স্থূল হইয়া আকাশ, হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ঔষধি, ঔষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেত, রেত হইতে পৃথিবী পুরুষ অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক শরীর। "তস্মাদ্ বা আত্মনঃ আকাশ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিরগ্নেরাপরদ্ভ্যঃ পৃথিবীঃ পৃথিব্যামন্নমন্নাদ্রেতঃ, রেতস পুরুষঃ। বা এষ পুরুষোঽয়মন্নরসময়ঃ।" এই ত তাঁর মায়া শক্তির বিবরণ। এই মায়া শক্তিই শ্রীভগবনের ইচ্ছায় পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া জগদ্রূপে পরিণত হয়। অতএব জগৎ কার্য্যতঃ নশ্বর হইলেও কারণতঃ সত্য। যেহেতু কারণরূপা মূলাপ্রকৃতি নিত্য সত্য শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি। আর বৈকুণ্ঠাদি ব্রহ্মাণ্ডগণ তাঁর স্বরূপ শক্তিরই প্রকাশ। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার অবতারাবলী, ও তাঁহার চিৎশক্তি জীবশক্তি ও মায়াশক্তি এই কয়েকটী বিষয় ভালরূপ পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে জীবের আর কিছুই জানিবার অবশিষ্ট থাকে না। "যৎএকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং ভবতি" শ্রুতির এই বাক্যটী সম্পূর্ণরূপে সার্থক হয়। নিঃশক্তিক ব্রহ্ম জানিলে কিন্তু সর্ব্ববিজ্ঞান সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়।

"কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান।
যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥"

শ্রী কালাচাঁদ দেবশর্ম্মা।

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রসঙ্গ

(৭)

ফটোখানি তুলিবার সময় যাতে খারাপ দেখ্‌তে হয় সেইরূপ ভাবে চোক মুখ ক'রে বাবাজী মহাশয় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাই মুখে যেন ক্রোধের ভাব হ'য়ে গেছে। ফটোর কথা বলবামাত্রই পেয়ে গেলুম, এজন্য আমার খুব আনন্দ হলো। বোধহয় বাংলা দেশের মধ্যে ভাগ্যক্রমে আমিই ঐ চিত্রপটখানি সর্ব্বপ্রথম পাই।

চিত্রপটখানি নিয়ে একধারে বসে বসে দেখছি, এমন সময়ে বাবাজী মহাশয় আমাকে ডেকে বল্লেন, হ্যাঁরে, তোর হাতে ওখানি কি? আমি গোপন করতে গেলেও তিনি বুঝতে পেরে বল্লেন, ওরে! একটা বাঁদরের ছবি নিয়ে কি করবি। আমি অমনি হাসতে হাসতে পালিয়ে গেলাম।

পূর্ব্বে বিডন গার্ডেনে যে কংগ্রেসের কথা বলেছি; আজকাল সেই কংগ্রেস বসেগেছে। কংগ্রেসের প্রদর্শনিতে আমাদের "তেঘরা শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের" ছাত্রদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি দেখাবার জন্য একটী ষ্টল করেছে। ঠিক যেখানে একজন পশ্চিম দেশবাসী "ভানুতপ" বা সূর্য্য কিরণে রন্ধন কার্য্য দেখাচ্ছিলেন তার পশ্চিম গায়েতেই আমাদের স্থান ছিল। এই প্রদর্শনীর জন্য আমাকে কলিকাতায় কয় দিন থাক্‌তে হ'য়েছিলো, দিনেরবেলা ঐ সব কার্য্যে লিপ্ত থাক্‌লেও বাবাজী মহাশয়ের নিকট গিয়ে কীর্ত্তনাদি শুনতাম ও নবদ্বীপ দাদার সঙ্গ পেতাম। একদিন পূর্ব্বোক্ত শশিভূষণ রায় চৌধুরী দাদামহাশয় বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করবেন বলে আগ্রহ করাতে তাঁকে নিয়ে গেলাম। ঐ দিন পূর্ব্ববঙ্গ হতে অনেক ভক্ত বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করতে এসেছিলেন; বাবাজী মহাশয়ের তখন অসুখ ছিল। কিন্তু তিনি অসুখের দিকে লক্ষ্য না করে ভক্তদের নিয়ে খুব কীর্ত্তন করতে লাগলেন। শশীদাদা বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তন এবং তাঁর অমিয় মাখান কথা বার্ত্তা শুনে বিশেষ ভাবে মোহিত হয়ে গেলেন।

গোবিন্দানন্দ দাদা,—সন্ন্যাসী অবধুত সম্প্রদায়। হলুদে রংয়ের বহির্বাস ও চাদর পরে থাকেন। জ্ঞানানন্দ মহারাজের শিষ্য। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের হ'লেও গোবিন্দানন্দ দাদা—বাবাজী মহাশয়ের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত, তাঁর সঙ্গ ছাড়া থাকিতে: পারেন না, এজন্য সঙ্গে সঙ্গেই ফিরেন। পূর্ব্বাশ্রমে;

পাব্‌লিক থিয়েটারে খুব অভিনয় করতেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের চরণাশ্রিত নাট্যাচার্য্য গিরিশ বাবুর সহিত ইঁহার বিশেষ আলাপ। ইনি বাবাজী মহাশয়কে "শ্রীচৈতন্যলীলা" দর্শন করাবার জন্য খুবই আগ্রহ করচেন; বাবাজী মহাশয়ও স্বীকৃত হ'য়েছেন। আজ শুনলাম সকলেই থিয়েটারে যাবেন নবদ্বীপ দাদা আমাকে বল্লেন "তুই যাবি?" আমি কার্য্যগতিকে যেতে পারলাম না। পরে শুনলাম থিয়েটারে গিয়ে বাবাজী মহাশয়ের ও নবদ্বীপ দাদার খুবই ভাবাবেশ হ'য়েছিলো। দর্শকেরা পর্য্যন্ত এঁদের ভাব দেখে প্রচুর আনন্দ পেয়েছিলেন। গিরিশবাবু বাবাজী মহাশয়কে অতীব ভক্তি সহকারে অভ্যর্থনা করেছিলেন।

একদিন বাবাজী মহাশয়ের নিকট বসে আছি, এমন সময়ে একটি লোক এলেন। মাথায় তাঁর ময়ূর পুচ্ছের চূড়া, হাতে বাঁশী, যেন একটু পাগল ধরনের। লোকটী এসে সামান্যক্ষণ পরে হলের মধ্যে বেড়াতে লাগলো, তার পরে একখানি খোল কাঁধে তুলে নিয়ে বাজাতে বাজাতে গান ধরলে। নিজে নিজেই রচনা ক'রে গান গাইতে লাগলো। নিকটে বৃদ্ধ জগদীশবাবু বসে বসে নাম করছিলেন তাকে দেখে বলতে লাগলেন। (গানগুলি আমার মনে নাই) ভাবটা, "ছোকরা গুরু বুড়ো শিষ্য বেশ যেন মিলেছে," ইত্যাদি। এইরূপে সে নানা কথা রচনা করে করে গাইতে লাগলো। আমরা বসে বসে মজা দেখতে লাগলুম। বাবাজী মহাশয় হলের সম্মুখের ঘরেই স্বীয় বিছানায় বসে আছেন, কোন কথা কইচেন না। অনেকক্ষণ পরে তিনি ঘর থেকে উঠে হলের মধ্যে এলেন এবং কীর্ত্তন করতে লাগলেন। চূড়াধারী লোকটী তখন বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তনের সঙ্গে বাজাতে লাগলেন। কিন্তু সে কীর্ত্তনের ভাবটী চূড়াধারী মশায় যা বলেছিলেন বাবাজী মশায় তাঁর সেই সব কথার যেন উত্তর দিতে লাগলেন, এইরূপে খানিক ক্ষণ কীর্ত্তন হবার পরে বাবাজী মহাশয়, "জীবের প্রভু সাজ সাজা ভাল নয়" ইত্যাদি ভাবে গান করিতে করিতে এমনিই কাতর হ'য়ে পড়লেন যে, হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন, সে কান্না যেন কত মহাদুঃখের। তারপর এক বিষম কাণ্ড হলো—নিজের হাতের কব্‌জীর কাছে নিজেই এমন কামড়ালেন যে, দাঁত বসে গেলো ও রক্ত পড়তে লাগ্‌লো। তখন সকলেই কীর্ত্তন থামিয়ে বাবাজী মহাশয়কে ধরে ফেলে মুখ থেকে টেনে হাত ছাড়িয়ে নিলেন। ললিতাদিদি ঘরের মধ্য হ'তে ছুটে এসে ক্ষত স্থান ধুয়ে দিয়ে প্রকৃতিস্থ করবার

চেষ্টা করতে লাগলেন। নবদ্বীপ দাদার মুখে শুনলাম "ভাববিরুদ্ধ কোন কিছু হ'লে ভক্তের যে কি কষ্ট হয় তা বলবার নয়।" আমরা আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর জানিনা। চূড়া ধারীকে দেখে আমোদই করছিলাম। এত খবর জানব কি করিয়া।

(বাবাজীমহাশয়ের ৺কালিঘাটে শ্রীশ্রীকালীমাতা-দর্শনে গমন।)

আজ বিকালে বাবাজী মহাশয় ৺কালীমাতাকে দর্শন কর্ত্তে যাবেন। আমি নবদ্বীপ দাদার কাছে বসে ছিলাম, এমন সময়ে সদর দরজায় ঘোড়ার গাড়ি এলো, বাবাজী মহাশয় আজ অন্যকোন ভক্তকে সঙ্গে না নিয়ে একাই গাড়িতে উঠতে গেলেন। উঠবার আগে ঘোড়া দু'টিকে দণ্ডবৎ করে ও কোচ্ম্যানকে দণ্ডবৎ করে তবে গাড়ীতে উঠলেন। কোচ্ম্যানত দেখেই অবাক! বোধ হয় এরূপ আরোহি সে এই প্রথম পেলে,—তাই বিস্ময়ের সহিত সে অনেক ক্ষণ ধরে বাবাজী মহাশয়ের দিকে চেয়ে রইল। গাড়িতে উঠিবার পরে বাবাজী মহাশয় রামবাবু ও গোপাল মামাকে সঙ্গে নিলেন। আমিও খানিক দূর পর্য্যন্ত গাড়ীতে এসে কার্য্য গতিকে হ্যারিসনরোডের মোড়ে নেমে গেলাম।

ভিতরে স্থানের অকুলান জন্য গাড়ীর ছাদে বসে ছিলাম চিৎপুর রোড দিয়ে যখন গাড়ি ছুটছিলো আমি দু'ধারের বাড়ী দেখ্তে দেখ্তে যাচ্চি। এই সব স্থানে বিস্তর বেশ্যার বাস। বিকাল হ'য়েছে বলে সকলেই সাজ সজ্জা করে বারাণ্ডায় দাঁড়িয়েছে। আশ্চর্য্যের বিষয়,—একদিন যাদের দেখ্বার জন্যে রাস্তায় হোঁচট খেতুম, এবং সৌন্দর্য্য দেখ্চি বলে মনকে আঁখি ঠারতুম বা তা'বর ঘরে চুরি করতুম, আজ গাড়ির ছাদ হ'তে স্পষ্টকরে বা নিকটে তাদের দেখতে পেলেও কি জানি কিছু মাত্র সৌন্দর্য্য পেলুম না। অধিকন্তু বড্ডই ঘৃণা আসতে লাগলো। আমি হ্যারিসনরোডের মোড়ে নেমে গেলুম। পরদিন রাম বাবুর মুখে কালীঘাট ভ্রমণের কথা শুনলাম। সব মনে নেই সেটুকু মনে আছে বলচি। রাম বাবু বল্লেন,—

"আমরা কালীঘাটে গিয়ে প্রথমে "নকুলেশ্বর ভৈরব" তলায় ৺মহাদেব দর্শন করে সেখানে জনৈক সাধু থাকেন তথায় গেলাম; ও বাবাজী মহাশয় সাধুর সঙ্গে দুই একটি কথা কইলেন, পরে সাধুকে দণ্ডবতাদি

ক'রে আমাদের নিয়ে ৺কালী মন্দিরে গেলেন। রাস্তাতে যেতে যেতে বাবাজী মহাশয় বল্লেন,—ঐ যে সাধুকে দেখ্‌লি উনি আমাকে এখন চিন্‌তে পারলেন না, কিন্তু দু'জনে এক সময়ে একত্রে সাধন ভজন করেছিলাম, সে সব কথা আর উত্থাপন করে পরিচয় দিলুম না।"

তারপরে রাম বাবু বল্লেন,—কালী মন্দিরের দরজায় গিয়ে দেখি খুব ভীড়, সহজে কাকেও ঢ়ুকতে দিচ্চে না, আমরা প্রবেশ করবার জন্যে খুব চেষ্টা করচি এদিকে দেখি বাবাজী মহাশয় কখন ফস্‌ করে মন্দিরের মধ্যে ঢ়ুকে গেছেন; আর আমাদের ঠিক বালকের মত হাত মুখ নেড়ে চুপি চুপি ডাক্‌চেন "এই ভট্টচার্য্য আয়না আয়না।" আমরা বল্লুম বাবো কি—ঢ়ুকতে যে দিচ্চে না।" খানিক পরে বহু কষ্টে ভিতরে গিয়ে দেখি বাবাজী মহাশয় কালীমাকে দণ্ডবৎ করে "কৃষ্ণ ভক্তি দে মা" বলে প্রার্থনা করতে লাগলেন। আমাদের কোলের কাছে টেনে নিয়ে মাকে দেখিয়ে ব'লতে লাগলেন, "এদের মা কৃষ্ণ ভক্তি দে।"

মন্দির হ'তে বেরিয়ে নিকটে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দিরে সকলে গেলাম, সেখানে বাবাজী মহাশয় ভাবাবেগে গদগদ হ'য়ে রইলেন। এইরূপে অনেক ক্ষণ দেখা শুনার পর আমরা পুনরায় গাড়িতে উঠলাম।

গাড়িতে উঠে বাবাজী মহাশয় বল্লেন;—"সবকার্য্যের ভিতরে লক্ষ করতে শিখ্‌বি। আজকের ব্যাপার বুঝলি?—"রামবাবু বল্লেন "কি রকম বলুন না।" বাবাজী মহাশয় বল্লেন;—"বুঝলিনি?—আগে এখানে এসে তীর্থের মহিমায় সাধু দর্শন হলো,—পরে সাধুর কৃপায় ৺কালী মা দর্শন পেলাম, তারপর তাঁর কৃপায় স্বামীদর্শন বা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ দর্শন হলো। এখন বুঝলি সাধু সঙ্গের কত মহিমা।"

ক্রমে ক্রমে গাড়ি গড়ের মাঠের কাছদিয়ে যেতে লাগলো, সন্ধ্যা হ'য়েছে—মহানগরী কলিকাতা আলোক মালায় সজ্জিত হ'য়ে এক অপরূপ শোভা ধারণ করেছে। বাবাজী মহাশয় গাড়ির মধ্যে তন্ময় হয়ে বিস্ফারিত চক্ষে কি যেন দেখ্‌চেন। রামবাবু সেই সময়ে ভাবছিলেন "তাইতো আমার কি হবে, আমি কি ভক্তি পাবো' ইত্যাদি। ঠিক ঐ সময়ে বাবাজী মহাশয় স্ত্রীলোকের মত হাত মুখ করে রামের চিবুক নাড়া দিয়ে বল্লেন; "হবে গো হবে, তোরও হবে।" রাম বাবুতো অবাক-ভাবতে লাগলো একি, আমি মনেমনে যা চিন্তা করচি তা ইনি কি করে জান্‌

লেন। এইরূপে অনেক কথাবার্ত্তায় ক্রমে গাড়ি এসে নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীটের বাসায় পৌছালো, আমরা গাড়ীথেকে নেমে যখন হল ঘরে গেলাম, তখন রামদাস দাদার কীর্ত্তন আরম্ভ হয়েছে। সকলে কীর্ত্তনে যোগ দিলাম। এবং সে রাত্রি গোপালমামা ও আমি ঐস্থানেই রহিলাম।"

অন্য একদিন একজন লোক একখানি পঞ্চতত্ত্বের ছবি এনে আমাদের দেখাচ্চেন, ছবি খানিতে নিতাই, গৌরাঙ্গ, শ্রীবাস ও গদাধরের চিত্রগুলি বেশ আছে, কিন্তু অদ্বৈত প্রভুর চিত্র বড়ই বিকৃত করেছে। অদ্বৈত প্রভুর চিত্র দেখে আমাদের মোটেই ভাল লাগ্‌চে না, অথচ মুকফুটে-বল্‌তেও পাচ্ছিনা যে খারাপ হ'য়েছে, কেননা ইঁহারা চিত্র পটকে বিশেষ ভক্তি করেন, এমন কি মহাপ্রসাদ, শ্রীনাম ও শ্রী বিগ্রহকে চিন্ময় বলে ধারণা করেন ও অপরকে করতে উপদেশ দেন। বাবাজী মহাশয় চিত্রপট খানি দেখে বল্লেন ;—

"আরে এ কি চিত্র, এতে যে অদ্বৈত প্রভুকে জাম্বুবানের মত করে এঁকেছে।" বাবাজীমহাশয়ের ঐ কথা শুনে আমি মনে মনে বিশেষ আনন্দিত হয়ে বল্লুম,—"দেখুন আমাদেরও ভাল লাগেনি—তবে পাছে আপনারা মনে কিছু করেন তাই ভরসা করে বলতে পারছিলুম না।" বাবাজী মহাশয় বল্লেন,—"দেখ, সত্য যা তা ব'ল্‌তে দোষ নেই।" পুলীনদাদার মুখে, শুনলাম,—একদিন নিত্যস্বরূপ দাদা খুব আনন্দভরে বাবাজী মহাশয়ের কাছে গিয়ে বল্লেন,—"দেখুন এতদিন পরে আমি আপনার পূর্ব্বাশ্রমের সংবাদ সব বের করেচি—আপনি আর গোপন রাখতে পারবেন না। আমি জেনেছি— আপনি ব্রাহ্মণ এবং উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারী ছিলেন।" বাবাজী মহাশয় এ কথা শ্রবণ করে বল্লেন—"সত্যিনাকি ? তবেতো তোরা সব কথা আমার জেনে গেছিস্‌।" বলে হাস্য করতে লাগলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅমূল্য ধন রায়ভট্ট।

ভক্তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

(২১শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩০ সাল)

প্রার্থনা

দয়াময়! যাঁহারা তোমার ভক্ত, কায়মনোবাক্যে যাঁহারা সকল তোমাকে দিয়া তোমার একান্ত শরণাগত হইয়াছেন তাঁহারাই ধন্য। অভাবের বিকটমূর্ত্তি তাঁহাদের হৃদয়ে প্রকাশ পায় না। তাঁহাদের হৃদয়াকাশ সর্ব্বদাই তোমার প্রেমসিন্ধুর সুশীতল বাতাসে ভরপুর। হতাশের বাতাস তাঁহাদের হৃদয় স্পর্শও করিতে পারে না। মোটকথা তাঁহারা সর্ব্বদাই পরমানন্দে থাকে। তোমার নিকট কেবল "দেহি দেহি" রবে তাঁহাদিগকে আর চিৎকার করিতে হয় না। তাঁহারা পরমানন্দে তোমার ভুবন মঙ্গল লীলা-গুণ-গানেই সর্ব্বদা বিভোর থাকে।

তাঁহাদের ভাব দেখিয়া কখন কখন মনে হয় আমিও আর তোমার নিকট কিছু চাহিব না। কিন্তু মনে করিলে কি হয়, কার্য্যকালে সে কথা ভুলিয়া যাই। তোমার দয়া যে কিভাবে কখন কার উপর পতিত হয় তাহা বুঝিতে পারি না। কাহাকেও ধন, জন, বিষয়, বৈভব দিয়া দয়া করিতেছ, আবার কাহাকেও বা তাহার সাধের সাজান সংসার ভাঙ্গিয়া দিয়া দয়া করিতেছ। শ্রীগুরুদেবের নিকট শুনিয়াছি তোমার এই দুই প্রকার দয়াকে অনুকূল দয়া ও প্রতিকূল দয়া বলে। যাহাই হউক না কেন, সবই তোমার দয়া। তবে কথা এই যে, তোমার এই লীলাখেলা বুঝিবার শক্তি কয়জনার আছে? যাঁর আছে তিনিতো ধন্যই, কিন্তু আমার মত অধমকে কি সে ভাবলাভে ধন্য হইতে দিবে না? তুমি যে দয়াময়, এ কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিবার শক্তিটুকুও কি দিবে না? যদি তাহাই না দিবে, তবে এমনভাবে সংসারে পাঠাইলে কেন? "যাহাই

হউক আমি এবার আর কিছু না বলিয়া ভাবুকের সুরে সুর মিলাইয়া এই প্রার্থনা করি—

"(আমায়) দাও অচল অটল, বিশ্বাস ভকতি
রতি মতি রাঙ্গাচরণে।
(আমার) চঞ্চলচিত, কর প্রশমিত
করুণাবারি সিঞ্চনে॥
(আমার) খুলে দাও আঁখি অন্ধ,
(এবার) ঘুচে যাক মনের দ্বন্দ্ব,
(আমি) তোমায় হেরি হরি, আছ বিশ্বভরি'
অপ্রাকৃত প্রেম-নয়নে॥
(নাশ) অভাব কুভাব কামনা,
(আর) নূতন বাসনা (প্রাণে) দিওনা,
(একবার) দিয়ে দরশন, হে প্রাণরমণ,
জুড়াও তাপিত জীবনে॥
(আমার) দুর্ব্বল চিতে শকতি,
(তুমি) দাও নাথ দিবা রাতি,
(যেন) সুখেতে দুঃখেতে, পারিহে ডাকিতে
ভাবিতে জীবনে মরণে॥
(আমায়) দেখায়ে প্রেমের আলো,
(তুমি) করে ধ'রে নিয়ে চলো,
(আমি) চলি তব পথে, না পড়ি ভ্রমেতে
গহন সংসার কাননে॥
(প্রাণে) জাগাও আকুল পিপাসা,
(তোমার) দেখিবারে হৃদে লালসা,
(যেন) ভাবে ভুলে যাই, আপনা হারাই
(নাম) শ্রবণ মনন কীর্ত্তনে॥
(এই) নিবেদন তোমার কাছে,
(আর) যে কটাদিন বাকি আছে,
(যেন) মনপ্রাণ খুলে, হরি হরি ব'লে
কাটাই আনন্দ জীবনে॥"

দীন—সম্পাদক

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রসঙ্গ (৮)

নিত্যস্বরূপ দাদা ঐ কথা গিয়ে ক্রমে আশ্রমের সকলকে ব'লে আনন্দ ক'রে বেড়াতে লাগলেন। খানিক পরে বাবাজী মহাশয় নিত্যস্বরূপ দাদাকে ডেকে বল্লেন,—"দেখ বটু! যে কথা ব'লে আমোদ ক'রে বেড়াচ্ছ, ওকথা বলবার উদ্দেশ্য কি তাহা নিজের মনের দিকে চেয়ে একবারও ভেবে দেখেছো কি? বোধহয় দেখনি। শোন তবে,—তুমি ব্রাহ্মণ, তাতে বিশেষ সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান, তুমি আমার নিকট দীক্ষা নিয়েছো আমি তোমার গুরু। কিন্তু আমি যদি ব্রাহ্মণ ও খুব একটা মান্যগণ্য লোকরই হবেই তোমার পরিচয় দেবার পথ থাকে, নতুবা আমি একটা যা'তা হ'লে তোমার অপমান হবে। নিজের মনকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ দেখি, তোমার প্রাণের ভাব এই কি না? এখন শোন, আজ থেকে জান্‌বে চরণদাস বাবাজী ব্রাহ্মণ নয় সে, হাড়ি—মুচি।

আদোষদরশি শিক্ষাশূন্য বাবাজী মহাশয়ের মুখে একটি কথা প্রায়ই শুনতাম "অনুকূল গুরু আর প্রতিকূল গুরু" অর্থাৎ সকলকেই গুরু জ্ঞানে ভক্তি করতে আমরা বাধ্য, কারণ যখন সকলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ তখন কাকেওতো ঘৃণা করবার উপায় নাই। জগতে যা কিছু আছে সবই ভাল, মন্দ কেহই নাই। যাঁহার দ্বারা সৎ শিক্ষা পাওয়া যায় তিনি অনুকূল গুরু এবং যাঁহাদ্বারা অসৎশিক্ষা পাওয়া যায় তিনি প্রতিকূল গুরু। সাধুকও সম্মান ক'রতে হবে, চোরকেও সম্মান ক'রতে হবে। চোররূপে তোমাকে শিক্ষা দিচ্ছেন "ও কাজ বড়ই খারাপ, তুমি ক'রনা, দেখ এই তার ফল।" তোমারি শিক্ষার জন্য, মঙ্গলের জন্য চোর তার ফলাফল তোমাকে জানাচ্ছে। তুমি সাবধান হবে ব'লেই সে নিজে মারখাচ্ছে, জেলখাটচে। তাই বলি সকলকেই সম্মান করবে, কখন কাকেও ঘৃণা ক'র না।" আর বল্‌তেন,—

"ব্রাহ্মণ চণ্ডাল কুকুরান্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি॥
এই সে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সবারে প্রণতি।
যার ইথে মতি নাই সেই ধর্ম্ম ধ্বজী॥" ইত্যাদি

আর শুনেছিলাম তিনটি উপদেশ।

১। ব্যক্তি গত লক্ষ্য ক'রনা।

২। জগৎ কৃষ্ণের প্রকাশ।

৩। শ্রীনিতাই কোন অভাব রাখ্‌বেন না।

আজ কাল বাবাজী মহাশয়ের শরীর অসুস্থ। অসুখের উপরেই কীর্ত্তন কর্ত্তে যান। কিন্তু ভক্তেরা তা ক'রতে দেন না। বড় বড় কবিরাজ মহাশয়েরা বাবাজী মহাশয়কে বিনামূল্যে ও অতীব ভক্তিভরে চিকিৎসা করবার জন্যে ব্যস্ত। বাবাজী মহাশয়ও পরমাদরে সকলের ব্যবস্থা মান্য ক'রে গ্রহণ করেন। একজন ভদ্রলোক তিনি মিস্‌মেরাইজ বা উইলফোর্স দ্বারা রোগ সারাতে জানেন, তিনি মহা আগ্রহে বাবাজী মহাশয়কে সারিয়ে দিবেন ব'লে এসেছেন। কিন্তু ভক্তগণ তাঁকে তা করতে দেবে না। বাবাজী মহাশয় একথা শুন্‌তে পেয়ে সকলকে রাগত ভাবে বল্‌লেন;—"দেখ! তোমরা ওকি করচো, আমার কত ভাগ্যে কত লোক আমার আরোগ্যের জন্যে চেষ্টা ক'রচেন আর তোমরা তাতে বাধা দিচ্চো, তাদের প্রাণ বোঝনা" ইত্যাদি। কাজে কাজেই সেই বাবুটী চিকিৎসা ক'রতে লাগলেন। তাঁর চিকিৎসা প্রণালী একদিন দেখেছিলুম। বাবাজী মহাশয়ের বুকে হাত দিয়ে ব'সে থাকেন—বাবাজী মহাশয়ও বালকের মত চুপ্‌ করে থেকে তাঁর উপদেশ মান্য করেন। বাবুটী নিজের কাজকর্ম্ম ও উপায় নষ্ট ক'রে এইরূপ ভাবে কয়দিন ধ'রে প্রক্রিয়া ক'রেছিলেন।

নবদ্বীপ দাদার সঙ্গে দেখা হ'লে তিনি বল্লেন;—"বাবাজী মহাশয়ের অসুখ বিসুক যা, তা কিছুই নয়, দুদিন বাদে ওসব কিছুই থাক্‌বে না। ওসব কেন হয় জানিস্‌, যত লোকের পাপ তাপ গ্রহণ করেন তাই মধ্যে মধ্যে ওরূপ হয়।"

আজ কাল নিতাই কত নূতন নূতন লোকের আগমন হ'তে দেখি। কত লোক আবার দীক্ষাও নিয়েছেন। কীর্ত্তনের সময়ে ঘরে আর জায়গা হয় না।

অসুখের সময়ে ভক্তি ভাজন ৺শিশির কুমার ঘোষ প্রমুখ কত গন্য মান্য লোক বাবাজী মহাশয়কে দেখ্‌তে আসেন। একদিন সকালে ব'সে আছি এমন সময়ে পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের আগমন হ'লো। তিনি ৺গঙ্গাস্নান করে সাদা পাটের কাপড়

প'রে ও উত্তরীয় গায়ে দিয়ে সৌম্যমূর্ত্তিতে দর্শন দিবামাত্রই বাবাজী মহাশয় ব্যস্ত ভাবে বিছনা হ'তে উঠে তাঁকে আসন দিয়ে বসালেন ও দণ্ডবৎ ক'রে প্রত্যেককে দণ্ডবৎ ক'রতে বল্লেন। প্রভুপাদ মহাশয় বাবাজী মহাশয়ের শারিরীক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। অন্যান্য কথা বার্ত্তাও হ'তে লাগলো। কিছু পরে বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে স্ত্রীলোকের বেশে যাঁরা থাকেন অর্থাৎ ললিতা দিদিদের সম্বন্ধে কোথায় কি কথা হ'য়েছিলো, সেই সব কথা প্রভুপাদ মহাশয় বাবাজী মহাশয়কে বল্‌তে লাগলেন। আমি ঘরের এক ধারে ব'সে ব'সে সবকথা শুন্‌তে লাগলুম—কিছু গোময় পরিপূর্ণ মস্তিকের জন্য সেসব কথার একটী বর্ণও মনে রাখ্‌তে পারিনি।

শেষে প্রভুপাদ গৃহে যাবার জন্য যখন প্রস্তুত হ'লেন, তখন যে আনন্দ স্রোত ব'য়ে গেল তা বলবার নয়, যেই তিনি দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেন অমনি বাবাজী মহাশয় তাঁকে দণ্ডবৎ ক'রে ললিতা দিদিদের দেখিয়ে (ঐ সময়ে ৩।৪ জন স্ত্রীবেশে থাক্‌তেন) বল্লেন "আপনি এদের কৃপা করুন, যাতে এরা এ বেশ চিরদিন রাখ্‌তে পারে," এই ব'লে ললিতা দিদিদের প্রভুপাদকে দণ্ডবৎ করতে বল্লেন। যখন সখী দিদিরা প্রভুপাদকে দণ্ডবৎ ক'রবেন তখন প্রভুপাদের মুখের দিকে চেয়ে দেখি তাঁর নয়ন দর দর ধারে জল পড়্‌চে, খানিক পরে তিনি যেন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হ'য়ে উপরদিকে হাততুলে কি বল্লেন, বাবাজী মহাশয়ও সেই সময়ে হুঙ্কার ক'রে "হাঁ নিতাই হা নিতাই" বলে কেঁদে উঠ্‌লেন। ঠিক সেই সময়টীতে ঘরের ভিতরে কি যেন হ'য়ে গেলো। যে যেখানে বসেছিল, সকলেই হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগলো। প্রভুপাদও অচল হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর চোখে জল পড়্‌চে। কিছুক্ষণ বাদে তাঁর সংজ্ঞা হলো। তখন তিনি ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে গমন ক'রলেন।

এই ঘটনাটী বিশেষ ভাবে মনে থাকবার কারণ, যার পণ্ডিত মহাশয়ের বেত ছাড়া কখন চোকের জল আসে না সেই আমার মত লোকেরও চোকে সেদিন জল প'ড়েছিল, তাই ঐ ঘটনাটীকে ভারি আশ্চর্য্য ভেবেছিনু ও উজ্জল ভাবে মনে রেখেছিনু।

কথায় কথায় নবদ্বীপ দাদার কথা বল্‌তে ভুলেগেছি। তিনি আজ কাল পুলীনদাদাদের বাড়ীতে (২৬নং শোভারাম বসাক লেনে) প্রায়ই

যাতায়াত করেন। পুলীনদাদা নবদ্বীপ দাদাকে ছেড়ে একদণ্ডও থাকতে পারেন না। এই সময়ে একটী ঘটনা হলো। নবদ্বীপ দাদার সঙ্গে বাবাজী মহাশয়ের ছাড়া ছাড়ি হ'য়ে গেল। সে সব গুঢ় রহস্য। নবদ্বীপ দাদা বাবাজী মহাশয়কে যেরূপ ভাবে প্রচার কর্ত্তে চান, বাবাজী মহাশয় তাতে বিশেষ ভাবে বাধা দেন, তাই নবদ্বীপ দাদা রাগ ক'রে পুলীনদাদাদের বাড়ীতে চলে গেলেন। সাধারণ চক্ষে যেন খুবই ছাড়াছাড়ি ভাব হ'য়ে গেল। আমরা আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে কি আবশ্যক? তাই এবিষয়ের কোন কথা কোনদিন ভুলেও জিজ্ঞাসা করিনাই।

(পুলীন দাদার বাড়ীতে নবদ্বীপ দাদা।)

নবদ্বীপ দাদা পুলীনদাদাদের বাড়ীতেই আজ কাল থাকেন। নিত্য রাত্রে দাদার যাঁরা অনুগত তাঁরা সকলেই এইখানে আগমন করেন। সকলকে চিনিনা। গোপালদাদা, গোবর্দ্ধনদাদা, জহর লাল বসু, মানিক লাল মল্লিক, মেঘনাথদাদা প্রভৃতি কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হ'য়ে ছিলো। নিত্য এইস্থানে খুব কীর্ত্তন হয়। পুলীনদাদার বাড়ীর আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা বিশেষ পুলীনদাদার মাতাঠাকুরাণী নবদ্বীপ দাদাকে যে কি চক্ষে দেখেন তা ব'লবার নয়। নবদ্বীপদাদা পুলীনদাদার মাকে 'মা' ব'লে ডাকেন। পুলীন দাদার দাদা কুঞ্জবাবু নবদ্বীপ দাদার আদর যত্নের জন্য সদাই ব্যস্ত। এমন কি বাড়ীর বৌ ঝিরা দাদাকে এমন প্রীতি—এমন ভক্তি করেন বা শুনলে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। একদিন মেয়েরা তাদের গায়ের সব গহনা খুলে দাদাকে পরিয়ে আমোদও ক'রেছিলো।

আজ কাল আমি কলিকাতায় যেতে পারি না, তাই সব সংবাদ জানতেও পারি না। তবে মাঝে মাঝে পুলীনদাদার সঙ্গে দেখা হ'লে অনেক খবর পেয়ে থাকি। শুনলাম পুলীনদাদার বাড়ীতে নবদ্বীপ দাদার আগমনে কতকগুলি যুবকের যে কি আধ্যাত্মিক উন্নতি হ'য়েছে তা বলবার নয়। উশৃঙ্খল কুপথগামী যুবকেরা এখন হরিনামে কাঁদতে শিখেছে। দাদার প্রাণে ঘৃণা ব'লে কোন জিনিষ ছিল না, আশ্চর্য্যের কথা এই, যে যত পাপী দাদা তাকে তত বেশী ভালবাসতেন। পাপ কর্ম্ম ছাড়বার জন্য দাদা কাকেও কিছু উপদেশ দিতেন না, কিন্তু দাদার ভালবাসার গুণে আপনিই সে সকল স'রে পড়তো। একটী যুবক,

একটী বেশ্যার কুহকে এমন পড়েছিলো যে, ক্ষণকালমাত্রও উভয়ে উভয়কে না দেখ্‌লে থাক্‌তে পারতো না। এই যুবকটী দাদার কাছে ২।১ দিন যাতায়াতের পর কিঞ্চিৎ ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে তার সেই বেশ্যাটী অস্থির হয়, এবং পরিশেষে প্রকৃত ঘটনা বুঝ্‌তে পেরে সত্য সত্যই সে যুবকের জন্য আত্মহত্যা ক'র্‌তে গিয়েছিলো। এরূপ ভাবে অনেককেই দাদা সৎপথে এনেছিলেন। দাদা কাকেও বাদ দিতেন না। একজন বার-নারীকে এমন পবিত্র ক'রেছিলেন যে, সে মৃত্যু পর্য্যন্ত শ্রীহরির নাম নিয়ে কেঁদে গেছে। অনেকেরই সে ভক্তির পাত্রী হ'য়েছিলো। বাবাজী মহাশয় বা নবদ্বীপ দাদার কার্য্য প্রণালী লোকের অন্তরে অন্তরেই গাঁথা আছে। সবই গোপনে গোপনে ক'রতেন। তাঁদের মধ্যে আজ কালকার মত সংবাদ পত্রে হৈচৈ করে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কিছুই ছিল না, তাই সাধারণে এঁদের বিষয় খুবই কম জানেন। নবদ্বীপ দাদার দ্বারা কুপথগামী যুবকগণের যে কি উপাকার হ'য়েছে তা তারাই বুঝেছে। এই সব যুবকগণের দ্বারা আবার কত লোকের উপকার হ'য়েছে ও হচ্চে তা দেখ্‌লে ও ভাবলে মহাপুরুষের মহিমা বিশেষ উপলব্ধি করা যায়।

নবদ্বীপ দাদা এমন সরল ছিলেন যে, তাঁর অন্তরের কোন কথা বা ভাব গোপন থাক্‌তো না। একদিন প্রাতে পুলীনদাদাদের বাড়ীতে যাওয়া মাত্রই দাদা আমাকে দেখে বল্লেন, "দেখ্‌ ভাই! কাল রাত্রিতে স্বপ্নবিকার হ'য়েছে, কি করি বল্‌তো ?" শুধু আমাকে নয়, যে আস্‌চে তাঁকেই ঐ কথা বল্‌চেন। ঠিক বালকের মত, কিছুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচভাব নেই।

২৬নং শোভারাম বসাক লেনের ৩।৪ খানি বাড়ীর পরে একটী বড়-লোকের বাড়ীতে কোন বিখ্যাত প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ক'রছিলেন, ঐ সভাতে দাদার আগমনের জন্য গৃহস্বামী বিশেষ আগ্রহ ক'রে ব'লে গিয়েছিলেন। আমি, পুলীনদাদা ও নবদ্বীপ দাদা তিনজনে ঐস্থানে গেলাম। দাদা প্রথমে শ্রীমদ্-ভাগবতকে, তারপর প্রভুপাদকে এবং পরে সমুদায় শ্রোতৃবৃন্দকে দণ্ডবৎ ক'রে সভার একধারে অতি দীনভাবে আমাদের নিয়ে বস্‌লেন। প্রভুপাদের মুখে পাঠ ও ব্যাখ্যাশুনে আমাদের খুবই আনন্দ হচ্চিলো। হঠাৎ দাদা বল্লেন, "চল বাড়ী যাই" এই বলেই উঠে পড়্লেন। আমরাও উঠলাম, কিন্তু এমন পাঠ ছেড়ে উঠ্‌তে খুবই কষ্ট হ'লো। তাই বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, "দাদা! উঠলে কেন ?" দাদা বল্লেন, "দেখ্‌! শ্লোকও ঠিক আর সবও

ঠিক হচ্ছিলো কিন্তু উনি যা ব্যাখ্যা করচেন তা ভাষ্যের বাইরে।" আমি বল্লুম, "কেন বেশতো ভাল লাগছিলো।" দাদা বল্লেন, "ওসব পরে বুঝবি পাগ্‌লা।" বাড়ীতে এসে এবিষয় পুলীনদাদার সঙ্গে আলোচনা হ'তে লাগ্‌লো।

একদিন রাত্রে পুলীনদাদাদের বৈঠকখানায়, (যে ঘরে ৺রথযাত্রার চিত্রের কথা পূর্ব্বে ব'লেছি, সেই পবিত্র ঘরে) আমি ও পুলীনদাদা নবদ্বীপ দাদার নিকটে শয়ন ক'রে আছি। রাত প্রায় ১॥ কি টা হবে এমন সময়ে দাদা ঘুম থেকে ধড়পড়িয়ে উঠে আমাদের জাগিয়ে বল্লেন, "দেখ! শ্রীগৌরাঙ্গ-ধর্ম্মের যারা বিরোধী আছে. তাদের সব নাম বল্‌তো, শীগ্‌গীর বল।" আমরা দাদার চোক মুখ দেখে অবাক হলুম ও স্ব স্ব বন্ধুদের নাম বলতে লাগ্‌লুম। অনুমানে বুঝলুম—দাদা বিরোধীদের জন্য বোধহয় মঙ্গল কামনা করলেন। তারপর আবার শয়নকরে নিদ্রাগেলেন। কোন কোন দিন দেখি দাদা সারা রাত জেগে আছেন এবং পুলীনদাদার সঙ্গে কথা কইচেন। আমি সাধ্যমত জেগে থাক্‌তুম তার পর ঘুমিয়ে পরতুম।

এই বৈঠকখানা ঘরটিতে ঢুকলেই একটী পবিত্রভাব আসে। তা ছাড়া রাত্রে শয়নকালীন এমন সব সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন এই ঘরেতে দেখেছি যা অতীব দুর্ল্লভ। দক্ষিণ দিকের দেয়ালে পূর্ব্বোক্ত রথযাত্রার বৃহৎ চিত্র, পূর্ব্বদিকের দেয়ালে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা'র ৬৪ মহান্তের চিত্র, পশ্চিমে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মহা-রাসের চিত্র এবং উত্তরে কৃষ্ণনগরের কারিগরের হাতের, মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের প্রতিমূর্ত্তি, কাঁচের কেসের ভিতর রক্ষিত। এবং একধারে প্রভুপাদ শ্রীল নীলকান্ত গোস্বামীর ও একধারে পূজ্যপাদ রোহিণী নন্দন বাবাজী মহাশয়ের ফটো। সপ্তাহে এক দিন প্রভুপাদের দ্বারা ভাগবত পাঠ ও বাবাজী মহাশয়ের দ্বারা শ্রীচরিতামৃত পাঠ হয়। যে সব ভক্ত আসেন তাঁরা এই ঘরেই থাকেন। অর্থাৎ এই বৈঠক খানাটী কেবল ভগবৎবিষয়ের আলো-চনার জন্যই নির্দ্দিষ্ট। সাংসারিক কোন কিছুর আলোচনা এখানে হয় না, তার জন্য অন্য সব সজ্জিত ঘর আছে।

ভগবদ্বিষয়ের আলোচনার জন্যই যে এই ঘরের একটী প্রস্তাব হ'য়েছিল তাহা অনেকেই অনুভব ক'রেছিলেন।. ক্রমে ক্রমে পুলীনদাদার বাড়াতেই বহু ভক্তের আগমন হ'তে লাগলো। কারণ বাবাজী মহাশয়ের ওখান থেকে (নয়ান-চাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট হ'তে) দাদার আসার পর ওখানের শ্রীরামদাস দাদা প্রভৃতি সকলেই দাদাকে নিত্য দেখ্‌তে আসেন। নবদ্বীপ দাদার বাবাজী মহাশয়ের

ওখানে না যাওয়ার জন্য কত কথাই হ'তো, কতক বুঝতুম কতক বুঝতেই পারতুম্ না।

(আমাদের দীক্ষা)

(১৩০৮ সাল ৬ইফাল্গুন মঙ্গলবার শুক্লা একাদশী (ইং ১৯০২ । ১৮ই ফেব্রুয়ারী)

পুনরায় বাবাজী মহাশয়ের রায় বাহাদুরের (আড়িয়াদহের) বাগানে সংপরিষদে আগমন হ'য়েছে। শীত গিয়ে বসন্তকাল প'ড়েছে। শীতের সময়ে বাগান বাড়ীর শোভা এক রকম ছিল, এখন নব বসন্তে আর এক প্রকার হ'য়েছে, বিশেষতঃ অশোক কুঞ্জের নূতন পাতাতে বাগানটিকে যেন আলো ক'রে রেখেছে। গত কল্য (সোমবার ৫ই ফাল্গুন) বিকাল ৪॥০টার সময়ে আমি ও রাম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দু'জনে পানিহাটী হ'তে পদব্রজে এখানে বাবাজী মহাশয়কে দর্শন কর্ত্তে এসেছিলাম, ইচ্ছা ছিল দর্শন ক'রে রাত্রেই, বাড়ী চলে যাবো। রাত্রে প্রসাদাদি পাবার পরে 'বাড়ী যাবো' বলাতে বাবাজী মহাশয় হাস্য ক'রতে কর'তে বল্লেন—"না, না, বাড়ী গিয়ে কাজ নেই, বৌ ঠৌ সব ভাল আছে গো ভাল আছে। এই খানেই শুয়ে থাক।" রামবাবু বল্লে "কি ক'রতে আমরা থাক্‌বো আমাদের তো শোধ্‌রাতে পারলেন না, যেমন ছিলাম তেমনিই রইলুম।" বাবাজী মহাশয় বল্লেন—"হবেরে হবে।" তার পরে শয়ন করলুম।

ক্রমশঃ

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট।

শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার

শ্রীভগবান্ বহুবার বহুরূপে আসিয়া জীবকে ধর্ম্মে স্থির থাকিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এবার তিনি পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান নবদ্বীপে জীবের পরমোৎকর্ষ যে প্রেম তাহা প্রচার করিবার জন্য আপন ঐশ্বর্য্য ভাব লুকাইয়া আমাদের মত মানুষ হইয়া আসিলেন। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে

উপলক্ষ্য করিয়া জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি মানব সমাজে প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু প্রেম প্রচার করেন নাই, প্রেমের সাধনা উচ্চাঙ্গের জিনিস, তখন সে সময় হয় নাই। তাই ব্রজেন্দ্র নন্দন হরি সেই প্রেম, মাত্র গোপীগণকে লইয়া উপভোগ করিয়া প্রেম ভাণ্ডারে চাবিবদ্ধ করিয়া অপ্রকট হইলেন। এই যে প্রেমলীলা, ইহা পুরাণাদিতে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু প্রেমের অভাবে এই লীলার তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য মুনিগণের এমন কি ব্রহ্মা ও শিবেরও অগোচর রহিয়া গেল।

শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃতে শ্রীল প্রকাশানন্দ সরস্বতী বলিয়াছেন,—"এই যে ব্রজপ্রেম, পুরাণাদিতে ইহার বর্ণনা নাই, ব্যাস্ শুক এমন কি স্বয়ং ব্রহ্মারও ইহা অগোচর ছিল—এমন অননুভূত প্রেম সাগরে আজ গৌর-ভক্তগণ সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছেন।"

এই শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদিত ব্রজপ্রেম ইহা জীবগণকে আস্বাদন করাইয়া সেই পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম লাভ করাইবার জন্য—সেই অপার আনন্দ বিতরণ করিতে —প্রেমের ভাণ্ডার লুটাইয়া দিতে সেই রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময়ী রাধার শ্রীঅঙ্গে আপন কৃষ্ণাঙ্গ আবৃত করিয়া এমন হতভাগ্য কলিযুগে যুগপৎ যুগ ও জীবকে ধন্য করিতে অবতীর্ণ হইলেন। আজ শ্রীল ঠাকুর মহাশয় তাই আনন্দের সহিত গাহিয়াছেন যে, কলিকাল ধন্য, যেহেতু এই যুগে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা জীবের নয়ন গোচর হইয়াছিল।

সাধারণ লোকে এই বিশুদ্ধ ব্রজপ্রেমের মাধুরী অনুভব করিতে না পারিয়া ইহা প্রাকৃত কাম দোষে দুষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিত। মহাপ্রভুই ইহার প্রকৃত ভাব জীবকে বুঝাইলেন। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ-কৃপা ব্যতীত ব্রজে গমন বা ব্রজলীলা আস্বাদন অসম্ভব।

আমরা আবার বলি যে, শ্রীগৌরাঙ্গের আগমনে কলিযুগ ধন্য হইয়াছে। যে অমিতাভ বুদ্ধের বিমল প্রভায় সমগ্র জগৎ মুগ্ধ সেরূপ কত বড় বড় বুদ্ধদেব শ্রীগৌরাঙ্গের শীতল ছায়ায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। একবার রঘুনাথ দাসের কথা ভাবুন। গৃহে অপ্সরার তুল্য সুন্দরী ষোড়শী যুবতী ও ১২ লক্ষ টাকার জমিদারীর মায়া জন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়া শ্রীগৌরের রাতুল চরণে আত্ম সমর্পন করিলেন। তাঁহার মধু হইতে মধুর চরিত্র প্রভাবে বৈষ্ণব জগৎ ধন্য হইয়াছে। তাহার পর মহারাজ প্রতাপরুদ্র ও নরোত্তম দাস—এইরূপ কত শত গৌর পরিকরের কথা আপনারা জ্ঞাত

আছেন। ভাগ্যবান শিবানন্দ সেনের পঞ্চম বর্ষীয় পুত্র তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চুষিয়া, অদ্ভুত কবিত্ব শক্তিলাভ করিয়া, সেই মুহূর্ত্তেই শ্রীকৃষ্ণের কর্ণের শোভা, কবিত্ব পূর্ণ রসময় শ্লোকে বর্ণনা করিল। তাই তাহার নাম কবি কর্ণপুর। তাহার পর জগাই মাধাই, বাসুদেব বিপ্র, নারোজী দস্যু, বেশ্যা সত্যবাই ও লক্ষ্মীবাই প্রভৃতির প্রতি প্রভুর কৃপা একবার স্মরণ করুন। বিশেষতঃ এই নারোজী দস্যুর প্রতি প্রভুর অহৈতুকী কৃপা আমাদের সাতিশয় মুগ্ধ করে। হায়, এহেন প্রেম রসার্ণব পুরোভাগে অক্ষুন্ন থাকা সত্ত্বেও আমরা বুক ফাটা তৃষা লইয়া হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছি ?

বেদ বলিয়াছেন শ্রীভগবান্ মন ও বাক্যের অগোচর অর্থাৎ মন ও বাক্য দ্বারা তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারা যায় না। শ্রীগৌর বেদাতীত, শাস্ত্রাতীত, তর্কাতীত। প্রকৃত ভাবে ধর্ম্ম পিপাসু হইয়া যে যে পুস্তকে শ্রীগৌরলীলা বর্ণিত ও গৌর-ধর্ম্ম লিখিত আছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখুন নিশ্চিত ভাবে শ্রীগৌরের ফাঁদে পড়িয়া যাইবেন। এমন মধু হইতে মধু ও "কোটিচন্দ্র সুশীতল" নিতাই গৌর চরণ কমল আপনারা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। এই চরণ কমলে একবার রতি জন্মিলে এমন অনেক বিষয় আপনারা পাইবেন যাহাতে শুধু আপনারা নহেন আপনাদের বংশ পর্য্যন্ত ধন্য হইয়া যাইবে আর তাহা শাস্ত্র প্রমাণ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে! প্রাণ ভরিয়া বলুন জয় গৌর!

দীন—শ্রীভোলা নাথ ঘোষ বর্ম্মা।

শ্রীগীত-গোবিন্দ

সংক্ষিপ্ত শ্রীজয়দেব-চরিত।

জাহ্নবীর উপনদী 'অজয়ে'র তীরে।
'কেন্দুবিল্ব,' 'পুরী'হ'তে নবক্রোশ দূরে॥
ইন্দুতুল্য 'বীরভূম' নভে বিরাজিত।
যথায় শ্রীজয়দেব কবি আবির্ভূত॥

কান্যকুব্জ দ্বিজ ভোজদেব পিতা তাঁর।
মাতা বামাদেবী, 'রাধা'-নামান্তর যাঁর ॥
নৃপ শ্রীলক্ষ্মণ সেন গৌড়েশ সভায়।
খ্যাত 'পঞ্চরত্ন,' জয়দেব মহিমায় ॥
এমন পবিত্রচেতা সাধু দয়াময়।
হয় নাই হবে নাই ভূমণ্ডলময় ॥
ব্রহ্মজ্ঞানলভি,' ত্যজি' সংসার আশ্রম।
পরিব্রাজকতা করি' করেন ভ্রমণ ॥
যার তরে জয়দেব করিলা যতন।
সেই সম্প্রদায় গৌর করেন স্থাপন ॥
একদিন পুরীধামে এক তরু তলে।
আছেন আসীন ধ্যানে মগ্ন, হেনকালে ॥
দ্বিজ এক জগন্নাথ-আদেশ পাইয়া।
নিজ কন্যা জয়দেবে দিল সমর্পিয়া ॥
'কি করিবে এই মাত্র'-বলেন বচন।
কন্যাবলে 'দেব-আজ্ঞা সেবিতে চরণ ॥'
দেবাদেশ শুনি' গৃহ আশ্রম স্থাপিলা।
শ্রীরাধা-মাধব সেবা তথা প্রকাশিলা ॥
সেবার উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের তরে।
যাইলেন বৃন্দাবনে আর জয়পুরে ॥
কেশীঘাটে দস্যুহস্তে হইল পরীক্ষা।
বহুকষ্ট দিল, তবু দিলা ক্ষমাভিক্ষা ॥
একদিন সাধুকবি কুটীর ছাইতে।
মাধব সহায় হন শ্রান্তি নিবারিতে ॥
মিথ্যা প'তি শোক-বর্ত্তা শুনি পদ্মামৃতা।
কৃষ্ণ নাম দিয়া কর্ণে করিলা জীবিতা ॥
গঙ্গাস্নানে দিন দিন বহুক্লেশ হয়।
দেখি' গঙ্গা কেন্দুলিতে হইল উদয় ॥
এইরূপে বহুলীলা করি মর্ত্তভূমে।
স্মরিতে স্মরিতে কৃষ্ণ, গেলা নিত্যধামে।

গোস্বামীর মণি জয়দেব মহাশয়।
যাঁহার প্রভাবে তীর্থ কেন্দুবিল্ব হয়॥
অদ্যাপিও কেন্দুবিল্বে ভক্ত অগণন।
তিরোভাব দিনে যশ করেন কীর্ত্তন॥
এহেন প্রেমিকে প্রেম যেদিন জন্মিবে।
সেই দিনে অধমের সুপ্রভাত হবে॥

শ্রীসত্যচরণ চন্দ্র বি, এল।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম লাভ করা জীবের পরম সৌভাগ্য। বড়ই সুখের বিষয় যে, অধুনা শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা বুঝিবার বাসনা অনেকের মনে জন্মিয়াছে। মধ্যে এমন দিনও গিয়াছে যখন অনেকেই এবিষয়ের কোন খোঁজ খবর লইতেন না এবং বলিতে গেলেও উহা ন্যাড়া নেড়ির ধর্ম্ম বলিয়া ঘৃণায় উড়াইয়া দিতেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা মহাজনগণের গ্রন্থে বর্ণিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম লাভ করা যায় না। এই প্রেম দান করিবার একমাত্র মালিক আমাদের দয়াল নিতাই। এখন শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের দৈন্যোক্তি শ্রবণ করুন,—

ব্রজেন্দ্র নন্দন সেই শচী সুত হৈল সেই
বলরাম হইল নিতাই।
দীন হীন যত ছিল হরিনামে উদ্ধারিল
তার সাক্ষী জগাই মাধাই॥"

* * * *

"নিতাই পদ কমল কোটিচন্দ্র সুশীতল
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই রাধা কৃষ্ণ পাইতে পাই
দৃঢ় করি ধর নিতায়ের পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেহ পশু বড় দুরাচার।

নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার ॥
অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে, নিতাই পদ পাসরিয়ে,
অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতায়ের করুণা হবে ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে,
ভজ নিতায়ের চরণ দু'খানি।
নিতাই চরণ সত্য তাহার সেবক নিত্য
নিতাই পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ ॥"

কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম লাভ করিতে হয় তাহাই জীবকে শিখিইবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দেবতা ও মানুষে প্রীতি হয় না। কারণ একজন বড় ও একজন ছোট, এই ভাব পরস্পরের মধ্যে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। তাই দয়াময় শ্রীভগবান্ আমাদের মত মানুষ হইয়া ভক্ত-ভাবে নিজের লীলারস নিজে আস্বাদন পূর্ব্বক জীবকে আত্মসাৎ করিয়া বৃন্দাবন লীলা বুঝাইবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে আগমন করিলেন। "আমার স্মরণ লও সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি হইবে" শ্রীভগবানের এই অভয় বাণী জগতের সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় এবং সাধুগণের নিকটও শুনিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত ধর্ম্ম-গ্রন্থের বর্ণনা এবং সাধুবাক্য জীবন্ত করিয়া জীবের চক্ষে ধরিবার জন্য সেই জীবের জীবন ভগবান্ স্বয়ং জীবের দ্বারে আসিয়া ধরা দিলেন। আর দেখাইয়া দিলেন যে, তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে কিরূপ উৎকণ্ঠা হৃদয়ে পোষণ করিতে হয়। এজন্য তাঁহাকে কিরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে হইয়াছিল দেখুন,—

"—মহাপ্রভুর বিষণ্ণ অন্তর।
কৃষ্ণের বিয়োগ দশা স্ফুরে নিরন্তর।
'হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
কাহাঁ যাও, কাহাঁ পাও মুরলী বদন ॥'
রাত্রি দিনে এই দশা, স্বাস্থ্য নাহি মনে।
কষ্টে রাত্রি গোঁঙায় স্বরূপ রামানন্দ সনে ॥"

* * * *

"এই মত মহাপ্রভু, রাত্রি দিবসে।
আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি, রহে কৃষ্ণ প্রেমাবেশে ॥
কভু ভাবে মগ্ন, কভু নহে বাহ্য স্ফূর্ত্তি।
কভু বাহ্য স্ফূর্ত্তি—তিন রীতে প্রভুর স্থিতি ॥
স্নান-দর্শন-ভোজন দেহ স্বভাবে হয়।
কুমারের চাক যেন সতত ফিরয় ॥" চৈঃ চঃ

যাতা যাহা লইয়া লোক সংসার বন্ধনে বদ্ধ হয় ব্রজ সুন্দরীগণের তাহা পূর্ণ মাত্রায় ছিল। তাহাদের ধন জন স্বামী পুত্র কন্যা মাতা ভগিনী প্রভৃতি সমস্তই ছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ব্রজেন্দ্র-নন্দনে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিয়াছিলেন। ফল কথা শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে আসক্ত হওয়া চাই। আর যাহার এই আসক্তি জন্মিয়াছে গৃহক্ষেত্র তাহাকে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। আবার দেখুন শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস পুনঃ পুনঃ তাঁহার প্রাণনাথ শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট পলাইয়া যাইতেছেন, ইহাতে তাঁহার মাতা রঘুনাথের পিতাকে বলিয়াছিলেন পুত্রকে বাঁধিয়া রাখা হউক। তখন রঘুনাথের পিতা বলিলেন,—

"ইন্দ্র সম ঐশ্বর্য্য স্ত্রী অপ্সরা সম।
এ সব বাঁধিতে নারিলেক যার মন ॥
দড়ির বাঁধনে তারে বান্ধিবে কেমনে ॥"

বিষয়াসক্তি ত্যাগের জলন্ত আদর্শ এই রঘুনাথ দাস গোস্বামী। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি অনর্পিত ব্রজপ্রেম জীবের হৃদয়ে অর্পন করিবার জন্ম সেই ব্রজের হরিকে গৌরহরি রূপে এই মহা ভয়ঙ্কর কলিযুগে বাঙ্গালার ব্রজ নদীয়াভূমিতে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজ প্রেম দিতে ॥
তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে।
পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানা রঙ্গে ॥

এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হইল কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায় ॥"

সেই প্রেমময়ের অসীম দয়ার কাহিনী ভাষায় ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা জীবের নাই। পাষণ্ড জগাই মাধাই এর প্রতি প্রভু নিত্যানন্দের অপার করুণার কথা একবার স্মরণ করুন। মাধাইর প্রহারে নিতাইর মাথা ফাটিয়া রক্তের ধারা বহিতেছে, কিন্তু নিতাইর সেদিকে দৃষ্টি নাই তিনি ভাই ভাই বলিয়া মাধাইকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিলেন। ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম। এপ্রেমের শক্তি অনন্ত। আর এই প্রেমের বন্যায় পড়িয়া একসময়ে কোটি কোটি নর নারী আনন্দ স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল। যে অনাবিল আনন্দ লাভ করিবার জন্য যোগী ঋষিগণ কত শত শত বৎসর ধরিয়া কঠোর সাধনা করিতেছেন কাঙ্গালের ঠাকুর নিজে দীন হীন কাঙ্গাল সাজিয়া তাহা জীবের দ্বারে দ্বারে অযাচিত ভাবে বিতরণ করিয়াছেন। আর নিতাইর সেই প্রচার কার্য্য, তাহা যে প্রতি নিয়ত আমাদের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিতেছে—

"ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ নাম।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ ॥"
"নিতাই কান্দিয়া বলে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ বল গৌর হরি ॥"

এযে কতদূর দীনতা তাহা ভাবিয়া আজিও আমাদের প্রাণ কি যেন এক অপূর্ব্ব পুলকে পুলকিত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের ন্যায় কলিহত জীবের প্রতি তাঁহার কত করুণা। শ্রীগৌর প্রেমের পরশ যাহার হৃদয়ে লাগিয়াছে তাহার সকল জ্বালা জুড়াইয়া গিয়াছে। সংসার বিষ-জ্বালা যে আর কিছুতেই জুড়ায় না। আমাদের ন্যায় মহাপাপী আর কার ভরসা করিয়া বাঁচিবে। যাহারা অধিক পাতকী—অধিক তাপিত তাহারাই যে তাঁহার কৃপাপাত্র। একদিন না একদিন তাঁহার সুশীতল শ্রীচরণ প্রান্তে স্থান পাইব ইহা নিশ্চিত এবং এই আশায় আমাদিগকে জীবন ধারণ করিয়া থাকিতে হইবে। সেই দিন আমাদের চিরসন্তপ্ত হৃদয় তাঁহার প্রেমের পরশ পাইয়া জুড়াইয়া যাইবে। আমরা ধন্য হইয়া যাইব।

আসুন আমরা আত্মীয় স্বজন ভাই-বন্ধু সকলে মিলিয়া—শতে—সহস্রে

একত্রিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে আত্মসমর্পণ করি। আর শ্রীগৌরাঙ্গ :প্রেমে হৃদয় পূর্ণ করিয়া প্রাণ ভরিয়া বলি—

"গৌরাঙ্গের ছুটি পদ, যার ধন সম্পদ,
সে যানে ভকতি রস সার।
গৌরাঙ্গ মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুই যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্য লীলা তারে স্ফুরে
সে জন ভকতি অধিকারী॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গীগণে, নিত্য সিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত-পাশ।
শ্রীগৌর মণ্ডল ভুমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজ ভূমে বাস॥
গৌর প্রেম রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধা-মাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥"

দীন—শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা

আনন্দ-লীলা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের দেশে যে সংবাদ প্রচার করেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের মর্ম্মস্থলে বিদ্যমান। শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বহুপূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার কথাও আমাদের দেশে অপরিজ্ঞাত ছিল না—কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের যাহা :মর্ম্ম কথা তাহা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু কর্ত্তৃকই সাধারণভাবে প্রচারিত হয়—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে তদীয় ভক্তগণ যেভাবে বুঝিয়াছেন—ঠিক সেইভাবে বুঝিতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবত

গ্রন্থের অভ্যন্তরে যে ভাব-ধারা প্রবাহিত হইতেছে, তাহার গতির সহিত আমাদের হৃদয়ের পরিচয় হওয়া প্রয়োজন।

এই ভাব-ধারার সহিত পরিচয় হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব একটি আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নহে। এই ব্রহ্মাণ্ড-লীলার প্রথম প্রত্যূষ হইতেই গোপনে গোপনে--স্থূলদর্শী সাধারণ মানবের জ্ঞানের অগোচরে, অথচ, ভক্তজনের হৃদয়কে আপ্যায়িত ও আনন্দিত করিয়া যে উদ্যোগ চলিতেছিল, এই আবির্ভাব সেই আয়োজন সমূহের শেষ-ফল। আচার্য্য ও ভক্তগণ এই ভাবেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন এবং লীলার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করার ইহাই একমাত্র উপায়। এই ভাব-ধারার নাম আনন্দলীলা—বৃন্দাবন ও নবদ্বীপে ইহার শেষদৃশ্যের অভিনয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের—প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বজনসম্মানিত টীকাকার শ্রীধরস্বামী—শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রায় ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের যে টীকা রচনা করিয়াছেন তাহার সাহায্যে সাধনশীল ও পবিত্রমনা অনেক মহাত্মা শ্রীমদ্ভাগবতের ও শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন কিন্তু অধিকাংশ মানবের পক্ষে তাহা হয় নাই। নীলাচলে অবস্থিতিকালে বল্লভভট্টের সহিত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর যে কথোপকথন হয়, তাহাতে শ্রীধরস্বামীর টীকা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর যাহা মত তাহা সুব্যক্ত হইয়াছে। বল্লভভট্ট একদিন বলিলেন যে আমি শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়াছি—এই কথা শুনিয়া—

"প্রভু হাসি কহে স্বামী না মানে যেইজন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥"

অন্যস্থানে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এই বল্লভভট্টকেই বলিলেন।

"শ্রীধর স্বামীর প্রসাদে ভাগবত জানি।
জগৎগুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি॥"

* * * *

"শ্রীধরানুগত্যে কর ভাগবত-ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান॥

অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত এই কয়টী পয়ার হইতে শ্রীধরস্বামী সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের যাহা মত তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। এই শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার প্রারম্ভে বলিয়াছেন যে, এই শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র ব্রহ্মসূত্রের অর্থ—মহাভারতের অর্থ-বিনির্ণয়, গায়ত্রীর-ভাষ্য এবং বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য। শ্রীমদ্ভাগবতের এইরূপ মহিমা শ্রীধরস্বামীর পূর্ব্বেও আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। শ্রীধরস্বামী এই সমস্ত গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এই সমস্ত মত প্রতিষ্ঠা করিবারি জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচনা করিয়াছেন।

অনধিকারীর হাতে পড়িয়া কেবল শাস্ত্রের বলিয়া নহে সকল বস্তুরই অনাদর হইয়া থাকে। এই জন্য আমাদের দেশে অধিকারী-নির্ণয়ের জন্য এত চেষ্টা। এই শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রও একসময়ে অনধিকারীর হাতে পড়িয়াছিল এবং তাহার ফলে অনেক ভ্রান্তমতও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামীর টীকা আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে এই প্রকারের ভ্রান্তমত দূর করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক চেষ্টা করিতে হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার প্রারম্ভেই শ্রীধরস্বামীকে সপ্রমাণ করিতে হইয়াছে যে, এই গ্রন্থখানিই শ্রীমদ্ভাগবত। ব্যাপারখানা বুঝুন—এ একেবারে যেন গোটা মানুষটাই চুরি। প্রাচীন অন্যান্য শাস্ত্রে শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে। যাঁহারা শাস্ত্রবাক্যে আস্থাবান তাঁহারা এই সমস্ত উক্তি উড়াইয়া দিতে পারেন না সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের অশেষ মাহাত্ম্য স্বীকার করিতে তাঁহারা প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহারা এই আপত্তি তুলিলেন যে, এই গ্রন্থখানিই সেই প্রকৃত ভাগবত কি না? অর্থাৎ এই গ্রন্থখানি যে জাল নহে তাহা কি প্রকারে জানা যাইবে?

প্রাচীনকালের এই আপত্তির কথা ভাবিলে একালের ইহা অপেক্ষাও একটা বড় আপত্তির কথা মনে হয়। আপনারা বোধ হয় অনেকেই জানেন যে বিলাতী দার্শনিক পণ্ডিত ডুগাল্ড্ ষ্টুয়ার্ট এক বৃহৎ প্রবন্ধ লিখিয়া পাশ্চাত্য জগতে সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন যে, কেবল সংস্কৃত সাহিত্য নহে, সমুদয় সংস্কৃত ভাষাটাই একটা মিথ্যা জুয়াচুরি। সংস্কৃত

ভাষা বা সংস্কৃত সাহিত্য বলিয়া সত্য সত্য একটা কিছু নাই এবং কখনও ছিল না। আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ জয় করার পর ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণেরা গ্রীক্ ভাষা ও সাহিত্যের সহিত পরিচিত হয়। তখন তাহারা এই গ্রীক্ ভাষা ও সাহিত্যের অনুকরণে একটা কৃত্রিম ভাষা ও সাহিত্য প্রস্তুত করে। পূর্ব্বে অর্থাৎ ইউরোপে যখন প্রথম প্রচারিত হইতেছিল সে সময়ে ডূগাল্ড ষ্টুয়ার্টের এইমত অনেকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধিক কি ইংরাজী ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দেও ডাব্লিনের একজন অধ্যাপক এই মতের সমর্থন করিয়া এক বৃহৎ প্রবন্ধ রচনা করেন। বিলাতে এই মতটা প্রচারিত হওয়ার অবশ্য একটা হেতু আছে। সে হেতুটা এই। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর খ্রীষ্টান জেসুইট্ সম্প্রদায়ের একজন পাদ্‌রী একখানি পুস্তক লইয়া ফরাসী দেশে প্রচার করেন এবং বলেন যে, ইহা ভারতবর্ষের সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত ভল্‌টেয়ার এই গ্রন্থের খুব সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে প্রমাণিত হইল যে এই গ্রন্থখানি জাল। এই কারণেই প্রকৃত সংস্কৃত গ্রন্থের আলোচনা ও আদর আরম্ভ হইল তখনই এই সমগ্র জিনিসটাই যে জাল এই প্রকারের কথাও স্থানে স্থানে প্রচার হইতে লাগিল।

একটা গোটা ভাষা ও সাহিত্যই যদি 'জাল' বলিয়া প্রচারিত হইতে পারে তাহা হইলে একখানি গ্রন্থকে জাল বলিয়া অপবাদ দেওয়া একটা অসম্ভব ব্যাপার নহে। শ্রীধরস্বামীর টীকা আলোচনা করিলে এ প্রকার কথা প্রচার হইবার দুইটি কারণ অনুমিত হয়। প্রথম কারণ সাম্প্রদায়িক বিরোধ। মানুষ যতই 'এক ভগবান্' বলুক না কেন, সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ক্ষুদ্র-গণ্ডী ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। দ্বিতীয় কারণটি শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলার টীকার প্রথমেই শ্রীধরস্বামী যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের কুব্যাখ্যা করিয়া মূর্খ লোককে ঠকাইয়া অনেক স্বার্থপর ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব্যক্তি সমাজের অমঙ্গল করিতেছিল। তাহারা নিবৃত্তি ও সংযমের পরিবর্ত্তে যথেচ্ছাচার প্রচার করিতেছিল। এই দুই কারণেই সম্ভবতঃ এই প্রকারের একটা মত কোন কোন স্থানে প্রচারিত হইয়াছিল যে, এই গ্রন্থখানি প্রকৃত শ্রীমদ্ভাগবত নহে। শ্রীধরস্বামীর টীকানুসারে আমরা কথাটা

দেখাইতেছি। শ্রীধরস্বামীকৃত প্রথম শ্লোকের টীকার শেষ কথা 'অতএব ভাগবত নামান্তরদিত্যপি নাশঙ্কনীয়ম্।" অতএব ভাগবত নামে অন্য গ্রন্থ আছে অর্থাৎ এখানি সে গ্রন্থ নহে এরূপ আশঙ্কা করিবেন না।

শ্রীশ্রীরাসলীলার টীকার প্রারম্ভে শ্রীধরস্বামী বলিলেন যে, এই লীলার উদ্দেশ্য মদনের দর্পজয়। অমনি যেন একজন আপত্তিকারী বলিয়া উঠিলেন, পরস্ত্রী-বিনোদের দ্বারা কি কন্দর্পের দর্প জয় হয়? ইহাতে যে কন্দর্পের সেবা করা বুঝায়। এই আপত্তির উত্তরে শ্রীধরস্বামী রাস-পঞ্চাধ্যায়ের মূল হইতে চারিটী বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিলেন যে, এই চারিটী বাক্যের মর্ম্ম অবধারণ করিলেই প্রকৃত তাৎপর্য্য ও রহস্য বুঝিতে পারা যাইবে। তাহার পর তিনি বলিলেন আমাদের যাবতীয় শাস্ত্রেই নিবৃত্তির বা সংযমের উপদেশ করিয়াছেন, আবার এই রাসলীলা বিশেষ করিয়া নিবৃত্তিপরা। কামকথা, যাহা রাসলীলায় দৃষ্ট হয় তাহা একটি আবরণ মাত্র। এই কথা বলিয়া তিনি বলিলেন যে, রাসের ব্যাখ্যা করিয়া আমি তাহা প্রতিপাদন করিব। "শৃঙ্গার-কথাপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তি পরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীতি ব্যক্তি করিষ্যামঃ।"

এই শ্রীমদ্ভাগবতকে শ্রীধরস্বামী ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছেন। ব্রহ্মবিদ্যা সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠাভূমি, ইহা বেদের কথা। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত ও শিক্ষা—যাঁহাদের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে তাঁহারা সকলেই শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠতা বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী রচিত 'ষটসন্দর্ভ নামক সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থের প্রথম সন্দর্ভেই অর্থাৎ তত্ত্বসন্দর্ভেই শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে খ্যাপন করা হইয়াছে। ঐ অংশটুকুর যাহা মর্ম্ম আমি কেবল তাহাই বলিতেছি, এ গ্রন্থ আপনারা আলোচনা করিবেন।

পুরাণ পঞ্চমবেদ, এরূপ কথা প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত আছে। স্কন্দ-পুরাণের প্রভাস খণ্ড হইতে বচন উদ্ধার করিয়া শ্রীজীবগোস্বামী বলিতেছেন যে "বেদের ন্যায় পুরাণের অর্থকেও নিশ্চল মনে করি। বেদসকল পুরাণেই প্রতিষ্ঠিত। শ্রুতি ও স্মৃতিতে যাহা পাওয়া যায় না পুরাণ হইতে সে সমুদয় অবধারিত হইয়া থাকে। কিন্তু পুরাণ নানা দেবতার কথা বলিয়াছেন; সুতরাং পুরাণের অর্থ দুর্বোধ্য। মৎস্যপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, কল্পভেদে—পুরাণের বিভিন্নতা হইয়াছে। সাত্ত্বিক কল্পে শ্রীহরির

মাহাত্ম্য অধিক—রাজসকল্পে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য অধিক এবং তামসকল্পে অগ্নির ও শিবের মাহাত্ম্য অধিক কীর্ত্তিত হইয়াছে। সত্ত্বরজস্তমোময় সংকীর্ণ কল্পসকলে সরস্বতীর ও পিতৃগণের মাহাত্ম্য উক্ত হইয়াছে। মৎস্যপুরাণে পুরাণসমূহের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। সাত্ত্বিক পুরাণসমূহ শ্রেষ্ঠ হইলেও তৎসমুদয়ের মধ্যেও আবার মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলেন ব্রহ্ম সগুণ, কেহ বলেন নির্গুণ, কেহ বলেন জ্ঞানমূলক, কেহ বলেন জড় মূলক, সুতরাং এই সমুদয়ের মধ্যে শেষ কথা কি তাহা নিরূপণ করা কঠিন। ব্রহ্মসূত্র হইতে পরমার্থ নির্ণয় করা যায়, কিন্তু সূত্রগুলি অত্যন্ত অল্পাক্ষর ও গূঢ়, সুতরাং উপায় কি? শ্রীজীব গোস্বামী তত্ত্বসন্দর্ভে এইরূপ প্রসঙ্গ করিয়া উপসংহারে বলিতেছেন 'তদেবং সমাধেয়ং, যদেকতমমেব পুরাণলক্ষণমপৌরুষেয়ং সর্ব্ববেদেতিহাসপুরাণানামর্থসারং ব্রহ্মসূত্রোপজীব্যঞ্চ ভবদ্‌ভুবি সম্পূর্ণং প্রচরদ্রূপম্ স্যাৎ। সত্যমুক্তম্। যত এবচ সর্ব্বপ্রমাণানাং চক্রবর্ত্তিভূতামস্মদভিমতং শ্রীমদ্ভাগবতমেবোদ্ভাবিতমভবতা" ॥ ইহার অর্থ "যদি অপৌরুষেয়, বেদ ইতিহাস ও পুরাণ সকলের সারার্থপ্রকাশক, ব্রহ্মসূত্রের উপজীব্য এবং এই জগতে সম্পূর্ণরূপে প্রচারিত এবং পুরাণের যে সমস্ত লক্ষণ সেই সমস্ত লক্ষণযুক্ত কোন একখানি পুরাণ থাকে, তাহা হইলে সেই পুরাণের সাহায্যে এই সংশয়ের সমাধান হইতে পারে। অতএব সকল প্রমাণের শীর্ষস্থানীয় আমাদিগের অভিপ্রেত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানি উদ্ভাবিত হইল।

ভগবান বেদব্যাস সমন্বয় আবিষ্কার করিলেন—ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিলেন কিন্তু শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যপূর্ণ, বিচিত্র গূঢ় লীলা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকায় তিনি চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলেন না—তখন তিনি সমাধিস্থ হইয়া আপনার রচিত সূত্রসকলের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ এই শ্রীমদ্ভাগবত প্রাপ্ত হইয়া প্রচার করিলেন। "যস্মিন্নেব সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়ো দৃশ্যতে। সর্ব্ববেদার্থসূত্র লক্ষণাং গায়ত্রীমধিকৃত্য প্রবর্ত্তিতত্বাৎ।" অর্থাৎ এই শ্রীমদ্ভাগবতে সকল শাস্ত্রের সমন্বয় দৃষ্ট হইয়া থাকে, কারণ গায়ত্রী, সকল বেদার্থের সূত্রস্বরূপ আর শ্রীমদ্ভাগবত এই গায়ত্রীকে অবলম্বন করিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকেই গায়ত্রীর অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে, এই প্রকারে নানা পুরাণের উক্তি-অবলম্বনে শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীধরস্বামী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা, পূর্ণতা, ব্রহ্মসূত্রের অর্থরূপতা প্রভৃতি প্রতিপাদন করিয়াছেন।

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থের মত বিশেষ আদরের সহিত গ্রহণ করেন নাই, শ্রীজীবগোস্বামী তাহারও হেতু নিরূপণ করিয়াছেন। এই হেতু

অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণের একটী উক্তির উপরেই এই কথাটির প্রতিষ্ঠা। তথায় এইরূপ বলা হইয়াছে যে "শঙ্করাচার্য্য পরমভক্ত হইলেও ভগবানের একটী বিশেষ আদেশ-পালনের জন্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভগবৎতত্ত্ব গোপন করিয়া মায়াবাদ অবলম্বনে, উপনিষদাদির ব্যাখ্যার সাহায্যে অদ্বৈতবাদ স্থাপন করাই সেই আজ্ঞা। এই কারণে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতকে গ্রহণ করেন নাই।" কিন্তু শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য স্বরচিত শ্রীগোবিন্দাষ্টকাদিগ্রন্থে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ব্রজেশ্বরীর বিস্ময়—ব্রজকুমারীগণের বসনচৌর্য্য প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণলীলার এই সমুদয় কথা শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত অন্যত্র নাই। অতএব তিনি শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ আলোচনা করিয়াছেন এবং গ্রহণও করিয়াছিলেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহার আবির্ভাব, তাহার প্রতিকূল্য ঘটিবার সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া জনসমাজে—এই গ্রন্থের প্রকৃত মহিমা প্রচার করেন নাই, ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। সাত্বত (ভক্ত)গণের মধ্যে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, শঙ্করাচার্য্যের অন্যান্য শিষ্য পুণ্যারণ্য প্রভৃতি আচার্য্যের প্রকৃত অভিপ্রায় না বুঝিয়া এমনভাবে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন যে শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের মনে ভয় হইল যে বৈষ্ণবেরা শ্রীমদ্ভাগবতকে নির্গুণ ও চিন্মাত্রপর বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন। এই জন্য তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিবার পথ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলা হইল তাহা শ্রীজীব গোস্বামী কৃত তত্ত্বসন্দর্ভের কথা। এই কথাগুলি আশ্রয় করিয়া আমি আপনাদিগকে প্রাচীন আচার্য্যগণের যাহা মত তাহাই জ্ঞাপন করিতেছি।

আমরা আমাদের দেশে পৌরাণিক সাহিত্য নামে পরিচিত এক অতি বিশাল সাহিত্য দেখিতে পাই। অষ্টাদশপুরাণ আমাদের পরিচিত। ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, বায়ু, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম্ম, মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড এই অষ্টাদশ পুরাণ। ইতিহাস ও পুরাণাত্মক পঞ্চম বেদ শতকোটী শ্লোকে নিবদ্ধ এবং ব্রহ্মার মুখ হইতে ইহা নিঃসৃত হইয়াছে, ইহাই প্রাচীনকালের বিশ্বাস। শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে ঐরূপ উক্তিই দেখিতে পাইবেন। মধ্যে আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ এমন একটা দিন আসিয়াছিল যখন এই সমুদয় পুরাণের নামও আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এখন জাতীয় চিত্তের

গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমাদের অতীতের সহিত যাহাতে একটা প্রকৃত পরিচয় হয়, সেজন্য চারিদিকে একটা চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রায় সমুদয় পুরাণই ইংরাজী ও বাংলাভাষায় অনুবাদিত হইতেছে। সংস্কৃত মূলগ্রন্থও সুলভ, সুতরাং পৌরাণিক সাহিত্যের সহিত পরিচিত হওয়া পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যতটা কঠিন ছিল এখন আর ততটা নাই। আমার বিশেষ অনুরোধ আপনারা সমুদয় পুরাণ ও উপপুরাণগুলি ভাল করিয়া পাঠ করিবেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের সমগ্র সাধনার প্রতিবিম্ব এই পৌরাণিক সাহিত্যেই পাওয়া যায়। পৌরাণিক সাহিত্যের সহিত হৃদয়ের পরিচয় হয় নাই, এ প্রকারের লোককে জাতীয় হিসাবে শিক্ষিত বলা যায় না। অবশ্য পূর্ব্বে পুরাণগুলি যেরূপ উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়াছিল এখন আর সেরূপ উপেক্ষিত নহে—অনেকেই পুরাণশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু পৌরাণিক সাধনারদ্বারা হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন করিবার জন্য পুরাণের আলোচনা অতিশয় বিরল। পুরাণের মধ্য হইতে একালে আমরা যাহাকে ইতিহাস বলি, তাহার কোন তথ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি না এই জন্যই আজ, কাল পুরাণের আলোচনা হইতেছে। ইহাও একটী আবশ্যকীয় কার্য্য। কিন্তু এই প্রকারের কোন উদ্দেশ্য লইয়া সমালোচনার ছুরিকাহস্তে পৌরাণিক সাধনার তপোবনে প্রবেশ না করিয়া তথায় যে হৃদয়োচ্ছ্বাস চারিদিকে বহিয়া যাইতেছে সেই উচ্ছ্বাসের দ্বারা আত্মহৃদয়ের অনুশীলন করিবার জন্য শ্রদ্ধাবান সাধকের মত প্রবেশ করা অধিক প্রয়োজন। ইহার কারণ এই যে, আমরা আমাদের অতীতের সহিত যে পারম্পর্য্যসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলাম আমাদের নবীন শিক্ষা ও দীক্ষা সেই সূত্র ছিন্ন করিয়া দিতেছে। আমাদের অতীতের বুক হইতে ভাব ও রসের ধারা বর্ত্তমানের নৈরাশ্য মরুভূমিকে যতদিন অবিশ্রান্তভাবে সরস না করিবে ততদিন আমাদের যাবতীয় চেষ্টা ও উদ্যম কক্ষভ্রষ্ট গ্রহের উদ্দেশ্য-হীন গতির মত।

ক্রমশঃ

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক বি-এ (ভাগবতরত্ন)

ভক্তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

(২১শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ সাল)

প্রার্থনা

"শ্রীরাধারমণ মদনমোহন
শ্রীরাধাবল্লভ নাথ।
এ দীন অধমে করুণা নয়নে
কর শুভদৃষ্টিপাত॥"

হে রাধারমণ! দীনহীনের প্রতি একবার করুণা নয়নে ফিরিয়া দেখ, কি ভীষণ দুর্দ্দশা হইয়াছে। মনে করিয়াছিলাম আর তোমাকে বিরক্ত করিব না, কিন্তু দয়াময়, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আর না বলিয়া পারিলাম না। আর যে সহ্য হয় না, আঘাতের উপর আঘাত খাইয়া খাইয়া আমি যে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। তুমি হয়ত বলিবে "কর্ম্মফল" ভোগ করিতেই হইবে। কিন্তু দয়াময়, তোমাকে যে অগতির গতিদাতা—অধমতারণ বলিয়া লোকে বলে, সে কথা কি মিথ্যা? এ কথা ভাবিতেও যে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। তোমার দয়া কি জীবের কর্ম্মফলের অপেক্ষা করিবে? ভজনপূজন করিয়া যদি তোমার কৃপা পাইতে হয় তবে আর তোমার অপেক্ষা করিবে কেন? সে তো নিজ সাধনের বলেই উদ্ধার হইবে। যে তোমাকে স্মরণ না করে, তোমার নাম না লয়, তোমাকে ছাড়িয়া দিয়া সংসারের মোহে মুগ্ধ হইয়া আছে তাহাকে যদি উদ্ধার করিতে পার—তাহার সেই শত বিষয়ে ছড়ান প্রাণটিকে যদি কুড়াইয়া তোমার

পাদপদ্মে মগ্ন রাখিতে পার তবেই না তুমি অধমতারণ, তবেই না তোমার দয়াময় নামের সার্থকতা ? প্রভু, আমার মত এমন অভাগা, পতিত জগৎসংসার খুঁজিয়া আর দ্বিতীয় পাইবে কি না সন্দেহ, তাই—বলি আমাকে দয়া করিয়া, তোমার ভক্তদত্ত দয়াময় নাম সার্থক কর। কেন না—

"সাধন ভজন ক'রে পাইলে তোমায়,
সেই কি হে দয়াল নামের পরিচয় ?
তারা তো আপন সাধন গুণে পাইবে চরণ"
এই সাধন হীনে তার দেখি কেমন দয়াল হরি।"

দীন—সম্পাদক

বিশ্বরূপের সঙ্গীত (৮)

১৪।—(তাই) বাঁকা গৌর বাঁকা আঁখি আঁকা বাঁকা ঠাম।
(তাই) বাঁকা হ'য়ে দাঁড়াইয়ে গায় রাধা নাম ॥
বাঁকা পথে চায় যেতে আঁকা বাঁকা চলনে,
বাঁকামনে কি আছে তা কে বুঝিবে কেমনে,
বাঁকা কভু নহে ভাল, কালশশী গোপনে,
ঢাকিয়া সে বাঁকা তনু ছলে গুণধাম ॥
বাঁকা সেজে ব্রজে ছিল পুনঃ এল নদীয়ায়,
রাধাপ্রেমে ঋণি বাঁকা ঘটাবে কি বিষম দায়,
(ও) বাঁকা ভাল জানি আমি, হউক না সে গোরারায়,
(ও)বাঁকার ভিতরে বাঁকা সেই বাঁকা শ্যাম ॥
এ বিশ্বরূপের বাঁকা ছাড়িতে হইল সাধ,
ছাড়িলে না ছাড়ে বাঁকা সাধে মনোসাধে বাদ,
বাঁকার সকলি বাঁকা, তাই হেন পরমাদ,
(আগে) জানিলে কি এ আঁখিতে বাঁকা হেরিতাম ॥

১৫।—হে গৌরাঙ্গ প্রাণরমণ হে নদীয়া বিহারী।
হে নিমাই হে পতিত উদ্ধারণ হিতকারী ॥

খল কপট কুটীল কোন মো সম দুরাচারী।
হা হা দীনতারণ কয়দে গতি হামারি ॥
য্যায়সে তুঁহি পাবন জগতারণ অবতারি
ত্যায়সে অতি পাতকী কোই হামসে নেহি ভারি ॥
এ বিশ্বরূপদাস পতিত আশ ধরে তুঁহারি।
হে শরণাগতপাল ভবসে পারসে উতারি ॥

দীন—সম্পাদক

একটী চিত্র

মহাপ্রভুর মানুষি-লীলার শেষ দ্বাদশ বৎসরের মহাবিরহের প্রতিচ্ছবি স্মরণ করিয়া হৃদয় আজ যেন কি এক ভাবে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গের সেই ম্লান পদ্মের ন্যায় বিরহ পাণ্ডুর মুখখানি প্লাবিত করিয়া মুক্তা বিন্দুর ন্যায় সেই অশ্রুমালার অবিরল প্রবাহ। আর সেই বুক ফাটা দীর্ঘশ্বাস—সেই গদগদ কণ্ঠে "হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ" বলিয়া করুণ আর্ত্তি। এই মহা বিরহের মহান্ চিত্র, সারাটী প্রাণকে আজ যেন কি এক ব্যথায় ভরিয়া দিতেছে।

নীলাচলের সেই ক্ষুদ্র গম্ভীরা গৃহে বসিয়া শ্রীগৌর আমার স্বরূপ রাম রায়ের নিকটে প্রাণ উঘাড়িয়া প্রাণের বেদনা বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ বিরহে সারা অঙ্গ এলাইয়া পড়িয়াছে। এমন প্রেমের মানুষ পৃথিবীতে আর কখন আসে নাই। বৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার নিপুন তুলিকায় এই প্রেমের চিত্র কিরূপ আঁকিয়াছেন তাহা দেখুন—

"রোমকূপে রক্তোদ্গম, দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ॥

আবার— প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
তার উপর রক্তোদ্গম কদম্ব প্রকার ॥

আবার— এক এক হস্তপাদ দীর্ঘ তিন তিন হাত।
অস্থি গ্রন্থি ভিন্ন, চর্ম্ম মাত্র আছে তাত ॥

আবার— পেটের ভিতর হস্তপদ কূর্ম্মের আকার।
মুখে ফেন পুলকাঙ্গ নেত্রে অশ্রুধার ॥"

আমাদের ন্যায় কলুষিত জীবের চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গের এই মহাবিরহের চিত্র দয়াল বৈষ্ণব কবি অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। আসুন ভাই বন্ধু সকলে মিলিয়া আমরা শ্রীহরির নামসংকীর্ত্তন করিয়া আমাদের দয়াল গোরার প্রেমের ঋণ শোধিবার চেষ্টা করি।

"আমার পরশ মণির কি দিব তুলনা।
পরশ মণির গুণে কলুষিত জীবগণে
নাচিয়া গাহিয়া হইল সোণা॥"

প্রায় সার্দ্ধ চারিশত বৎসর পূর্ব্বের সেই পবিত্র দিনের কথা স্মরণ করিলে হৃদয়ে প্রকৃতই এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয়। কিরূপে প্রেম দিয়া সেই প্রেমের হরিকে বাঁধিতে হইবে তাই শিখাইতে গৌর আমার শ্রীকৃষ্ণ বিরহে কখনও হাসিতেছেন, কখনও কাঁদিতেছেন, কখনও কাঁপিতেছেন আবার কখন বা মহাভাবে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। স্বয়ং প্রেম যে আজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মানুষকে ধন্য করিতে আসিয়াছেন। সেই স্বর্ণ-কান্তি মানুষটীর পদধূলি পাইয়া নদীয়ার ভূমি, বাঙ্গালার ব্রজে পরিণত হইয়াছে—কীর্ত্তনের অতুলানন্দে বাঙ্গালার ও উড়িষ্যার নরনারী ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইল, সেই মানবরূপী দেবতার জয় গানে দশদিক মুখরিত করিয়া আজ বলিতে ইচ্ছা হইতেছে—

"নাচিতে না জানি তবু
নাচিহে গৌরাঙ্গ বলি,
গাহিতে না জানি তবু গাই।
সুখে বা দুঃখেতে থাকি
হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকি
নিরন্তর এই মতি চাই॥"

আজ শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু গম্ভীরা গৃহের অদূরে ঐ যে অনন্ত বিহারী নীল জলধির উত্তাল তরঙ্গ-কল্লোল, উহা আমার বিরহ ব্যাকুল শ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয় বেদনার প্রতিধ্বনি করিতেছে। আমাদের ন্যায় মলিন জীবের চিত্ত-দর্পণ নির্ম্মল করিবার জন্য প্রভুর আমাদের যে চেষ্টার অবধি ছিল না। আমরা হেলায় সে অমূল্য রত্নকে হারাইয়াছি। আসুন ভ্রাতৃগণ, গম্ভীরাগৃহের ভাবনিধির সেই অপূর্ব্ব চিত্র মনোমন্দিরে জাগ্রত করিয়া আমারা কাঁদিতে-কাঁদিতে বলি—

"কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া।
পতিত দেখিয়া কেবা উঠিবে কাঁদিয়া॥"

বৈষ্ণব দাসানুদাস—
শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা

আনন্দলীলা (২)

পৌরাণিক সাধনার পূর্ণ পরিণতি শ্রীমদ্ভাগবতে পরিদৃষ্ট হইবে। তত্ত্ব-সন্দর্ভ হইতে শ্রীজীব গোস্বামীর যে মত বর্ণনা করা গেল, তাহার সাহায্যে ইহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে। প্রাচীনকালের সাধক ও ভক্তগণ, যাঁহারা রসিক ও ভাবুক হইয়া পৌরাণিক সাধনার যাহা প্রকৃত রস তাহা পান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতে এই পূর্ণতা দেখিয়াছেন। তাঁহাদের হৃদয়ের সহিত পরিচিত হইতে হইলে তাঁহাদের এই মতের অনুবর্ত্তন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। নতুবা তাঁহাদের হৃদয় ও মনের সহিত আমাদের ঠিক যোগ থাকিবে না। এমন হইতে পারে যে, একালে আমরা নূতন কিছু পাইব যাহা তাঁহারা পান নাই বা পাইলেও প্রচার করেন নাই, আবার তাঁহাদের সমগ্র ভাবটী আমরা চেষ্টা করিয়া না পাইতেও পারি। এ প্রকারের কিছু প্রভেদ হওয়া কেবল সম্ভব নহে, স্বাভাবিক। কিন্তু বাঁচিতে হইলে, সত্যের আশ্রয়ে থাকিতে হইলে যোগসূত্র রক্ষা করার জন্য চেষ্টা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন।

যেমন একজন কবি একটী আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হইয়া একখানির পর আর একখানি, এই প্রকারের অসংখ্য কাব্য রচনা করেন এবং এই প্রকারে বহুকাব্যে তাঁহার ঐ মানস আদর্শ কিছু কিছু পরিব্যক্ত হইতে হইতে পরিণত বয়সের এক শুভক্ষণে বিরচিত একখানি কাব্যে তাঁহার সেই আদর্শ পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়ে—সেইরূপ আমাদের এই আর্য্যজাতি অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া একটী বিশেষ ভাবের ছাঁচে এই দেশ ও কালে বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপার আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই চেষ্টার ফলে যাবতীয় পুরাণ প্রচারিত হইয়াছে এই প্রকারে বহু পুরাণ প্রকাশিত হইতে হইতে ব্যাসদেব এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সমাধিস্থ হইয়া ধ্যানযোগে প্রাপ্ত হইলেন। যে তত্ত্ব অন্যান্য পুরাণে

কম বা বেশী করিয়া ব্যক্ত হইয়াছে শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার পরিপূর্ণ সমাবেশ। পূর্ব্বে কবির যে আদর্শ-কাব্যের কথা বলা হইল, সেই আদর্শ কাব্যখানির সাহায্যে যেমন কবির অন্যান্য কাব্যগুলির সম্বন্ধ, মূল্য ও তাৎপর্য্য নিরূপণ করিতে পারা যায় এবং সমুদয় কাব্যের মধ্যেই এই সুমহান ঐক্যের প্রতিষ্ঠা-ভূমিরূপে অখণ্ড কবিহৃদয়ের সমুদয় অংশটা আমরা দেখিতে পাই, পৌরাণিক সাহিত্যে শ্রীমদ্ভাগবতও ঠিক সেইরূপ। স্কন্ধপুরাণের একটী শ্লোক তত্ত্বসন্দর্ভে উদ্ধৃত হইয়াছে—

"ব্যাসচিত্তস্থিতাকাশাদবচ্ছিন্নানি কানিচিৎ।
অন্যে ব্যবহরন্ত্যেতান্যুরীকৃত্য গৃহাদিব॥"

অর্থাৎ ব্যাসদেবের চিত্তস্থিত আকাশ, মহাকাশ—ঐ মহাকাশ হইতে খণ্ড খণ্ড করিয়া অন্যে গ্রহণ পূর্ব্বক, ভাণ্ডার হইতে বস্তু গ্রহণ করিয়া যেমন ব্যবহার করা হয় সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ব্যাস একজন নহেন—একথাটি প্রাচীন কথা। বিষ্ণুপুরাণে ইহা আছে এবং তত্ত্বসন্দর্ভে বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। সেই উদ্ধৃত বাক্যে পরাশর বলিতেছেন, আমার পুত্র ব্যাস অষ্টাবিংশতি মন্বন্তরে চতুষ্পাদ বেদকে চারিভাগে বিভাগ করিলেন। এই ধীমান্ ব্যাসদেব কর্ত্তৃক বেদসমূহ যেমন "ব্যস্ত" (বিভক্ত) হইলেন, অন্যান্য ব্যাসকর্ত্তৃক ও আমাকর্ত্তৃক বেদসকলও সেইরূপ বিভক্ত হইয়াছেন—হে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠগণ এই-রূপে সকল চতুর্যুগে বেদের বিস্তৃত শাখাভেদ সকল ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। এই সমুদয় ব্যাসের মধ্যে মহাভারত-রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ-ব্যাসই সাক্ষাৎ নারায়ণের অংশ। স্কন্দপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, দ্বাপরযুগে গৌতম ঋষির শাপে জ্ঞান অজ্ঞানে পরিণত হইয়াছিল (এখন ইউরোপে যেমন হইয়াছে)। ব্রাহ্মণেরা ভগবানের নিকট এই বিষয় নিবেদন করিলে ভগবান পুরুষোত্তম ব্যাসরূপে আবির্ভূত হইয়া বেদের উদ্ধার সাধন করিলেন।

এইবার আমার যাহা বক্তব্য তাহা শ্রবণ করুন। পৌরাণিকী সাধনা একটী বিশিষ্ট সাধনা—এই সাধন পথ আশ্রয় করিয়া বহু বহু ভক্ত মানব নিজ নিজ জীবন সফল করিয়াছেন। যেমন আজকাল আমরা বলি যে, কবিদের একটী জগৎ আছে—ঐতিহাসিকদের একটী জগৎ আছে—বৈজ্ঞানিকদের একটী জগৎ আছে। বিশেষ সাধনা ব্যতিরেকে সেই সেই জগতে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। সেইরূপ আমি আপনাদিগকে বলিতেছি যে, পৌরাণিকদিগেরও একটী জগৎ আছে, সাধনাব্যতিরেকে আপনারা সে জগতে প্রবেশ করিতে

পারিবেন না। পৌরাণিকের জগৎ বলিলে আপনারা অনেকেই হয়ত মনে করিবেন, এ এক কল্পনার রাজ্য; কিন্তু তাহা ঠিক নহে; পরমার্থতত্ত্ব (Ultimate Reality) লইয়া যখন বিচার, তখন আমরা যে জগৎকে প্রত্যক্ষ ও সত্য বলি, তাহার কতখানি সত্য আর কতখানি কাল্পনিক তাহাও বেশ সাহসপূর্ব্বক আলোচনা করা দরকার। এই প্রত্যক্ষই একমাত্র সত্য, সাধারণ বৈজ্ঞানিকী বুদ্ধিই একমাত্র বুদ্ধি, ইহাও একালের একটা প্রকাণ্ড কুসংস্কার। অন্যান্য কুসংস্কারের ন্যায় এই কুসংস্কারও মানবচিত্ত হইতে ক্রমশঃ দূরীভূত হইতেছে, ইহা আপনারা অন্য সময়ে আলোচনা করিবেন। একালের একজন সুপ্রসিদ্ধ মনিষী Sir Oliver Lodge এই সিদ্ধান্তটী বিশেষ দক্ষতার সহিত বর্ত্তমান জগতের চিন্তারাজ্যে উপস্থিত করিতেছেন। তিনি দেখাইতেছেন যে, সত্যের প্রকারভেদ আছে। তাঁহার আলোচনা পদ্ধতি সম্বন্ধে উপস্থিত আমার কিছু বলিবার নাই। পৌরাণিকী সাধনার রাজ্যে প্রবেশ করিলে এবং মানবীয় চিন্তার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের মধ্যে যে সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা আলোচনা করিলে আমরা এই তত্ত্ব সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। যেমন রসায়ন শাস্ত্রের আলোচনায় সফলতা লাভ করিতে হইলে অতীতের যাবতীয় রসায়নবিৎ পণ্ডিতগণের গবেষণা ও সাধনার দ্বারা আমার মনোবৃত্তির অনুশীলন একান্ত ভাবে আবশ্যক, অলঙ্কার-শাস্ত্রের বা ন্যায়শাস্ত্রের সূত্রের আলোক হস্তে লইয়া রসায়নবিদের জগতের বস্তুদর্শনের প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র, সেইরূপ পৌরাণিকী সাধনার দ্বারা হৃদয়-বৃত্তির বা অনুভূতির এক বিশিষ্টরূপ অনুশীলন ব্যতিরেকে এরাজ্যে প্রবেশ করিয়া সত্যজ্ঞানের আশা করা নিতান্তই বিড়ম্বনা। প্রতীচ্যদেশের চিন্তার সাহায্যে আমার প্রতিপাদ্য কথাটী যাঁহারা বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা Sir Oliver Lodge প্রণীত "Reason and Belief" গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবেন।

প্রাচীন পুরাণের মত ও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামীর মত উদ্ধার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে আমাদের দেশের এক সম্প্রদায় সাধকের যাহা ধারণা তাহা আপনাদিগকে জ্ঞাপন করা হইল। এখন আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনায় পৌরাণিকী সাধনা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমাদের দেশে এখনও কেহ কেহ মনে করেন যে, পুরাণগুলি বুঝি আধুনিক। এ মতে আজকাল বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে কেহ আর আস্থাবান নহেন, বৃহদারণ্যক উপনিষদেও পুরাণের কথা বিশেষ-

ভাবে বলা হইয়াছে। পুরাণ-সমূহ এখন যে আকারে রহিয়াছে চিরদিন হয়ত সে আকারে ছিল না—কিন্তু পুরাণ যে চিরদিনই রহিয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। পৌরাণিকী সাধনার শেষ সফলতা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর লীলার মধ্যে আচার্য্য সাধুগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু তাঁহার অনুবর্ত্তী ভক্তগণকে যে নবচেতনায় জাগ্রত করিয়াছেন, তাঁর করুণার অঞ্জন প্রাপ্ত হইয়া এই সমুদয় সাধু যে শক্তি লাভ করিলেন, তাঁহার সাহায্যে তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্ম প্রত্যক্ষ অনুভব করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে আমাদিগের আরও অনেক আলোচনা করিতে হইবে। অদ্য শ্রীমদ্ভাগবতের একটী মূলভাব আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি, এই ভাবটী আপনারা গ্রহণ করিলে শ্রীকৃষ্ণলীলার অনেক রহস্য বুঝিতে পারিবেন। এই মূল ভাবটীর নাম 'আনন্দলীলা।' আমি পৌরাণিকের ভাষায় বিষয়টী আপনাদিগের নিকট বর্ণনা করিতেছি। আপনারা বৈজ্ঞানিক সমালোচনার সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাখানি কিছুক্ষণের জন্য তুলিয়া রাখিয়া ভাবুকের মত হৃদয় দিয়া এই রসপান করিবার চেষ্টা করিবেন।

মানুষ যখন সংসারে আসিয়া ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কিছুদিনের জন্য বিষয়ভোগের আনন্দ-লাভের পর আত্মচিন্তায় রত হয় এবং চারিদিকে দুঃখ ও পরাজয় দর্শন করিয়া দুশ্চিন্তাকাতরচিত্তে জ্ঞানীর নিকটে জিজ্ঞাসু হইয়া উপস্থিত হয়, তখন জ্ঞানী তাঁহাকে বলেন; পরমাত্মার কথা শুনিবে, তাঁহাকে মনন করিবে এবং ধ্যানধারণার সাহায্যে তাঁহার সহিত তোমার যে গূঢ় ও গভীর সম্বন্ধ তাহা উপলব্ধি করিবে। মানুষ তখন জিজ্ঞাসা করে, এই যে পরমাত্মা ইনি কেমন? জ্ঞানী উত্তর করেন, বাক্য ইহাকে বর্ণনা করিতে পারে না, মন ইহাঁকে অনুমান করিতে পারে না। ইনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ অব্যয় ইত্যাদি। এই সমুদয় শুনিয়া মানুষের ভয় হয়। ভয় ছাড়া লোভেরও উদয় হইতে পারে—কারণ বেদ যাঁহাকে শব্দ স্পর্শের এবং বাক্যমনের অতীত বলেন কিছুক্ষণ পরেই তাঁহাকে আবার সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বশক্তিমান, প্রভৃতি বলিয়া থাকেন। বেদ ক্রমশঃ বলিলেন যে, এই যে পরম বস্তু—যিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান প্রভৃতি নামে অভিহিত, তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে "প্রিয়মুপাসীত"—তিনি পুত্র হইতেও প্রিয়—বিত্ত হইতেও প্রিয়—অন্য সমুদয় বস্তু হইতেও প্রিয় এবং অন্তরতম। এই প্রকারে বেদের মধ্যেই ভয় ও লোভের ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া প্রেমধর্ম্মের সুস্পষ্ট সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রেমধর্ম্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠাই যদি

উপনিষদের শেষ সিদ্ধান্ত হয়—তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদান্তের ভাষ্য বলা অত্যন্ত সঙ্গত হইয়াছে। উপনিষদের শিরোভাগে ব্রহ্মতত্ত্বের যে সমুদয় পাওয়া যায়, তৎসমুদয়কে এককথায় "আনন্দং ব্রহ্মেতি" তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই উক্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে পারা যায়, এই সূত্রটির মধ্যেই "আনন্দ-লীলা-বিভোর ভগবান" তাঁহার "লীলা-রসমাধুরী" লইয়া লুকাইয়া রহিয়াছেন। সমগ্র পৌরাণিকী সাধনা, বিশেষ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত, এই ভাবটুকু ধরিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক যে প্রেমধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয় তাহার মর্ম্মকথা এই আনন্দ-লীলাময়ের উপলব্ধির মধ্যেই নিহিত। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার আরম্ভে শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন শ্রীমদ্ভাগবত এক সুরতরু; প্রণব ইহার অঙ্কুর (তারাঙ্কুর) সত্য ইহার ভূমি এবং ভক্তি ইহার আলবাল অর্থাৎ একটি অঙ্কুরের চারিদিকে আলবাল দিয়া জলসিঞ্চন করিতে করিতে কালে সেই অঙ্কুর যেমন বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়, সেইপ্রকার ভক্ত ভাবুকগণ বা রসিক উপাসকগণ দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার রসবারি সিঞ্চনে এই প্রণব অঙ্কুরকে শ্রীমদ্ভাগবতে পরিণত করিয়াছেন। প্রণবতত্ত্ব বিস্তৃতভাবে আলোচনার বিষয়, সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইনি সগুণ ব্রহ্ম এবং সগুণ ও নির্গুণবাদের পূর্ণ সমন্বয়ের উপর ভগবদ্গীতায় যে পুরুষোত্তমতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, ইনি সেই পুরুষোত্তম। পাতঞ্জলদর্শনের ভাষায় ইনি সেই পুরুষোত্তমের বাচক, কিন্তু পরমতত্ত্বে উপস্থিত হইয়া যখন নাম ও নামী অভেদ হইয়া যায়, তখন ইনিই সেই পুরুষোত্তম। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বেদের সার গায়ত্রী এবং শ্রীমদ্ভাগবত গায়ত্রীর ভাষ্য। এখন আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, গায়ত্রীর সার প্রণব, এই প্রণবের মধ্যে মোটা ৩টি দেখিতে পাই, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়, লীলার এই তিনটী তরঙ্গ একত্রে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে সুতরাং লীলাবাদের সমগ্র রহস্যই প্রণব। তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলিয়াছেন সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এই তিন এক আনন্দ হইতে হইয়া থাকে সুতরাং প্রণব শ্রীমদ্ভাগবতের অঙ্কুর এবং "আনন্দং ব্রহ্মেতি" ইহাই বীজ। এইবার আনন্দ-ব্রহ্মের আলোচনা করা যাউক।

আমাদের প্রকৃতিতে আনন্দের ক্রীড়া হয়। হইতে পারে ঐ আনন্দ নির্ম্মল নহে, হয়ত উহা অত্যন্ত বিমিশ্র কিন্তু তাহা হইলেও আনন্দ সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই একটা ধারণা আছে। সুস্পষ্ট ও সঠিক ধারণাই যে নাই তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ আনন্দবস্তুর সুস্পষ্ট সঠিক ধারণাই বৃন্দাবনে শ্রীনন্দনন্দনের আরাধনা এবং সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের সাধনা-ধারা সেই আরাধনা-

সাগরে যাইয়া সম্মিলিত ও পরিণতি-প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং আনন্দতত্ত্ব আমাদের বিশেষভাবে ধ্যানধারণার সামগ্রী। অন্ধকারময়ী রাত্রিতে মেঘাবৃত আকাশে বিদ্যুৎ-বিকাশের মত এই আনন্দ আমাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা স্থির হয় না। কারণ আমরা ধরিতে পারি না। যে নবীন মেঘের গায়ে সৌদামিনী অচঞ্চলা হয়, আমাদের ভাগ্যাকাশে এখনও সে নবীন মেঘের উদয় হয় নাই। তাই "ক্ষণপ্রভা প্রভাদম বাড়ায় মাত্র আঁধার, পথিকে ধাঁধিতে।" আনন্দের ক্ষণিক প্রকাশ আমাদিগকে ভ্রান্তির মধ্যে পথহারা করিয়া আরও গভীর অন্ধকারে লইয়া যাইতেছে। কাজেই শান্ত ও নির্ম্মল চিত্তে আনন্দতত্ত্বের ধ্যানধারণা আমাদের যেন নিত্যকর্ম্মের অঙ্গীভূত হয়।

আমাদের দিক দিয়া আনন্দের আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আনন্দের সহিত আপনার বাহিরে ছড়াইয়া পড়িবার এবং পরকে আপন করিবার, নিজের আনন্দরস সকলকে পান করাইয়া নিজের মত তাহাদিগকেও আনন্দযুক্ত করিবার একটা প্রবল ইচ্ছা রহিয়াছে। আনন্দ কেবল একটী নহে, ইচ্ছা ও ক্রিয়ার মধ্যেও ইহার প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। চুপ করিয়া বসিয়া আছি, মনে আনন্দ নাই মুখখানি মলিন, মুখে কথা নাই, হঠাৎ আনন্দ আসিল, এ আনন্দ হয় ত বিষয়ানন্দ। কিন্তু বিষয়ানন্দেরও প্রাণ ব্রহ্মানন্দ। আনন্দ যেমন আসিল, মলিনমুখ উজ্জ্বল হইল, মুখে হাসি আসিল, আনন্দ বাড়িতে বাড়িতে মানুষ উঠিয়া দাঁড়াইল, শেষে ছুটাছুটি করিয়া পথের লোককে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের সহিত হাস্যালাপ ও কোলাকুলি করিতে লাগিল। ইহাই আনন্দের স্বভাব। আনন্দ প্রেম। "আনন্দচিন্ময়রস প্রেমের আখ্যান।"

এইবার চিন্তা করা যাউক যিনি অসীম আনন্দময় তাঁহার প্রকৃতি কিরূপ হইবে। বেশ মোটামুটি ভাবেই আলোচনা করা যাউক। এই আলোচনায় আমাদিগকে একটি এমন কথা ব্যবহার করিতে হইবে যাহা আমাদের নিকট অবোধ্য। কিন্তু সেই কথাটি ব্যবহার করা ব্যতীত উপায় নাই। সে কথাটি "অসীম"। যিনি অনন্ত আনন্দময় তাঁহার প্রকৃতিতে আত্মবিতরণের অসীম ব্যাকুলতা আছে। এই 'অসীম' ব্যাকুলতা কি তাহা ধারণা করা খুবই কঠিন। মোটামুটি গণিত বা গতিবিজ্ঞানের সাহায্যে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, অসীম ব্যাকুলতা একরূপ নির্ব্যাকুলতা। কারণ আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, অসীম-গতি আর ঐকান্তিকী স্থিতি একই কথা। Infinite motion is absolute rest ইহা এই প্রকারে বুঝিতে পারা যায়। মনে

করুন আমার এই দুইটি অঙ্গুলির ব্যবধান একহাত। একটি সর্ষপকে এই ব্যবধানের এক প্রান্ত হইতে লইয়া যাইতেছি। এক মিনিটে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আনিলাম। এইবার সর্ষপের গতি দ্বিগুণ করা যাউক তাহা হইলে আধ মিনিটে এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে আসিবে। গতিকে ৪ গুণ করিলে সিকি মিনিট লাগিবে। ১০০ গুণ করিলে এক মিনিটের একশত ভাগের একভাগ সময় লাগিবে তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইতেছে। যে, গতি যত বাড়িতেছে ঐ বস্তুটির দুই বিন্দুতে অবস্থিতিকালের মধ্যে যে ব্যবধান তাহা ততই কমিয়া যাইতেছে। সুতরাং গতি যদি অসীমে যায় তাহা হইলে ব্যবধান একেবারেই থাকিবে না অর্থাৎ একই সময়ে ঐ সর্ষপ উভয় স্থানে অবস্থান করিবে অর্থাৎ বিন্দু রেখা হইয়া স্থিতি লাভ করিবে। সুতরাং অসীম গতি আর স্থিতি যে এক জিনিস ইহা বুঝা খুব কঠিন নয়। এই চিন্তার প্রণালী আশ্রয় করিলে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবাদের সমন্বয় কিরূপ তাহা বুঝিতে পারা যাইবে এবং এই সমন্বয়ের রহস্যটুকুর উপলব্ধি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অবগত হওয়ার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন।

ক্রমশঃ

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক (ভাগবতরত্ন) বি, এ,

আবাহন-গীতি

("এস পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে," গানের সুর।)

এস প্রেম মূরতি পুনঃ বঙ্গে।
এস, দীপ্ত-পুরট-প্রভা ভাবিত বিগ্রহ
ভাবিনী ভাব-তরঙ্গে॥

২

শ্যাম শোভাময় নব তরু বল্লরী
কুসুম শোভিত নব বৃন্তে,
স্নিগ্ধ সুরভিত মলয় সমীরণে
মোদিত দিগ দিগন্তে ;

এস, ফাল্গুনী পূর্ণিমা পুন্য তিথি যোগে
নব বেশে নবীন বসন্তে,
নব নবদ্বীপ-ভূপ-কুসুম-বাণ
অস্ত্র পারিষদ সঙ্গে ॥

৩

শচীমাতা স্নেহোদধি-বর্দ্ধন কারিন্!
এস বিধু নদীয়া গগনে,
এস বিষ্ণুপ্রিয়া হৃদি সরবস ধন
অভিনব পরমূন ভূষণে ;
অরুণ উত্তরী বাস হেম কলেবরে
শোভিত মুকুতা হেম রত্নে,
চাঁচর চিকুরে চূড়া চুম্বিত অলিকুল
মদন দলিত ভুরু ভঙ্গে ॥

৪

এস অগাধ-পাণ্ডিত্য- প্রতিভা ভূষিত—
নবীন অধ্যাপক সাজিয়া,
এস নাস্তিক তার্কিক দাম্ভিক দলিতে
পর ভাবে পদানত করিয়া,
গয়া, পাদপদ্ম হেরি, প্রেম গলিত হৃদি
অশ্রুনীরে বক্ষ ভাসিয়া,
নব অনুরাগে জর্জ্জর কলেবর
অদভুত প্রেম তরঙ্গে ॥

৫

তব, চরণ কমল জাত মাতা সুরধুনী
তুয়া পরকাশ পুনঃ মাগে
সহচর সঙ্গে নানাখেলা কুতুহলী
হেরইতে নিজ তট ভাগে,

প্রেম ভকতি রস বিবশ তনুমন
সংকীর্ত্তন রস রঙ্গে,
প্রেম চপল মতি অবধুত সাথে
স্নান সাঁতার তরঙ্গে ॥

৬

জিনি জগন্নাথ মাধব * কত শত
পাপী পাষণ্ডী আবার,
তব দাস অভিমানী বেশ ভূষাধারী
দম্ভ কপট অবতার,
প্রীতি নিলয় তব পুন্য ভূমি পরে
- বাজত কত কু আচার,
কোথা জগত গুরু গৌর গুণাকর
এ সময়ে হেরহ অপাঙ্গে ॥

৭

নিরমল প্রেম উচ্ছ্বাস পরিপূরিত—
চিনময় ভাব তরঙ্গে
নিরমিত পূত ধরম তব সুন্দর
আদি পরচারিত বঙ্গে,
অব অপবাদ কুটিলতা বিজড়িত
বিদুষিত জনগণ সঙ্গে,
এস নিরমল প্রেম মধুরিমা বিতরিতে
কালিমা ক্ষালিতে অঙ্গে ॥

৮

অযাচিত প্রেম ভকতি রস বরষী—
করুণ নীরদ তুয়া জানে,
কত শত ভকত পিপাসিত চাতক
যাচত কাতর নয়নে,

---

* জগাই মাধাই।

তুয়া করুণাকণ দেব দয়াময়!
দেহি দীন অধীন অধমে,
বাসনা পুরাইতে এস গোলোক হ'তে
পতিত পাবন পর সঙ্গে॥

৯

দ্বিজ গুরু জননী বাণী প্রতি পালিতে
কলিযুগে করণা করিয়া,
সুরেপ্সিত সম্পদ প্রতিষ্ঠা লছমী
ছোড়ি অটল ব্রত লইয়া
প্রেমদিঠি শস্ত্রে হরিনাম অস্ত্রে
মায়ামৃগ বিতাড়িত করিয়া,
জগ দুঃখ হারিনী প্রিয়া প্রেম ব্যাকুল
দিগ দিগন্তরে ভ্রমিয়া,
এস, আশৈল জলনিধি বিপ্লাবিত করি,
নব প্রেম জলধি তরঙ্গে॥

১০

এস নীলাচল চন্দ্রমা সমীপ বিহারিন্
রথ পুরত তাণ্ডব রচিয়া,
জগমন মোহন ভাব ভূষণ পরি,
শত শত পার্ষদ লইয়া,
এস গম্ভীরা গম্ভীর কক্ষ বিহারিন্
গজপতি (১) জিত ভুরু ভঙ্গে।
জননী জনমভূমি ভকত চূড়ামণি
রাধাশ্যাম নব নব রঙ্গে॥

শ্রীমাখনলাল দত্ত ভিষকতীর্থ

---

১ দাক্ষিণাত্য সম্রাট গজপতি প্রতাপ রুদ্র বা ভূবনয়া গীড় নামক বংস পালিত বাহ্মণরাজ।

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রসঙ্গ (৯)

বেশ মনে আছে, দশমীর চন্দ্রকিরণ, তার উপর নূতন বসন্তের হাওয়া এবং প্রেমকণ্ঠ রামদাদার কীর্ত্তনে সেদিন যেন সমুদয় মধুময় হ'য়ে উঠেছিলো। রাত্রে ঘুমিয়ে ভোরে রামদাস দাদার কীর্ত্তন ধ্বনিতে জেগে উঠ্‌লাম। তার পরে একটু সকাল হ'তেই বাড়ী যাবো ব'লে বাবাজী মহাশয়ের পদধূলি নিতে গেলে তিনি বল্লেন—"আরে! বেলা হউক তবে যাবি, এখন খানিক কীর্ত্তন শুন্‌গে যা।" কাজেই আবার গিয়ে কীর্ত্তনস্থলে বসে কীর্ত্তন শুন্‌তে লাগ্‌লুম। রামদাদা চকের জলে বুক ভাসিয়ে প্রভাতি সুরে—

"নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ গদাধর।" এই পদটী গাইতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখি বাবাজী মহাশয় গঙ্গাজলে-সিক্ত একটী আম্র পল্লব হস্তে আমাদের দিকে আগমন কর্‌চেন। তাঁর চোক মুখ দেখ্‌লে তাঁকে ভাবাবিষ্ট ব'লে মনে হয়; পরিধানে কেবল বহির্ব্বাস, উত্তরীয় নাই। নিকটে এসেই কীর্ত্তন দলের উপরে ও আমাদের উপরে আম্রশাখার গঙ্গাবারী ছিটায়ে দিয়ে তাঁর গৃহে চলে গেলেন। একটু পরে আমাদের অতি নিকটে এসে কীর্ত্তন শ্রবণ করতে লাগলেন। আমরা উত্তরদিকে মুখ করে দুজনে বসেছিনু। আমরা কিন্তু এখনও বুঝতে পারিনি যে, আমাদের আজ শুভ দীক্ষা হবে। বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন শ্রবণ ক'রতে ক'রতে এক একবার হুঙ্কার ক'রে, আমাদের বল্লেন,—"জামা খুলেফ্যাল।" তখন আমাদের মনে হলো যে, আজ আমাদের দীক্ষা দিবেন। কিন্তু এ সময়ে আমার যা প্রাণের ভাব হয়েছিলো সে সব কথা একমাত্র নবদ্বীপদাদা ভিন্ন আর কাকেও বলতে সাহস পাই নি। দীক্ষার সময় অর্থাৎ এমন অমূল্য রত্নলাভ হচ্চে ভেবে কোথায় আমার পরমানন্দ হবে, কিন্তু তা না হ'য়ে প্রাণ বড়ই বিকল হয়ে গেলো। ভাবলাম ছুটে পালিয়ে যাই। দীক্ষা নেবোনা।—আমি ভিতরে ত্রাহি ত্রাহি করতে লাগলাম। এর কারণ আর কিছুই নয় কেবল নিজের অযোগ্যতা। নেবুতলায় দীক্ষা নিয়েছি, কিন্তু সেখানের নিয়মাদি কিছুই ক'রেতে পারিনা, কত গলতি রয়েছে। ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে যা বেড়াই সেটা যে কেবল হুজুক ভিন্ন আর কিছু নয় তা বেশ বুঝতে

পেরেছিনু, তাই মহা ভয় হলো। কিন্তু তাহ'লে কি হবে :—সুবিজ্ঞ ভিষক, রোগীর কোন কথা না শুনে যেমন তার বেদনার উপর অস্ত্রাঘাত ক'রে বেদনা দিয়েই তাকে নিরাময় করেন, বা রোগীর বিস্বাদ লাগবে জেনেও যেমন তাকে তিক্ত ঔষধ সেবন করাতে বিরত হন না, উনিও তেমনি আমার সেই সময়ের অন্তরের কথায় কর্ণপাত না করে আমাকে ভব রোগের ঔষধ জোর করে খাইয়ে দিয়েছিলেন। ভক্তকবি রজনীকান্ত সেনের সেই প্রসিদ্ধ গানটী—

"আমিতো তোমারে চাহিনি জীবনে তুমি অভাগারে চেয়েছো।" এর মর্ম্ম, এর অর্থ পরে বেশ ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছিনু। প্রথমে রামবাবুর দীক্ষা হলো। দীক্ষা প্রণালিটী এইরূপ, রামবাবুর দুই হাতের আঙ্গুলগুলির মধ্যে, বাবাজী মহাশয় নিজের দুই হাতের আঙ্গুল দিয়ে, জোর ক'রে ধ'রে, "হা নিতাই, "হা নিতাই," "হরিবোল" "হরিবোল," বলে খুব জোরে হুঙ্কার ক'রে উঠতে লাগলেন। সেমূর্ত্তি, সে রব, সে ভাব বেশ মনে পড়চে, যেন সিংহবিক্রমের হুঙ্কার। সে হুঙ্কারে সতের আনন্দ, পাষণ্ডের ত্রাহি ত্রাহি ভাব। হলঘরটী যেন কেঁপে উঠলো, কীর্ত্তনকারীরা মহানন্দে উচ্চ হ'তে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনাম করতে লাগলেন। রামবাবুও কেঁপে উঠলেন। তার পরে রাম বাবুর দক্ষিণ কর্ণে—

"চেতোদর্পন মার্জ্জনং ভব মহা দাবাগ্নি নির্ব্বাপনং" সেই নাম দিলেন। আবার বাম কর্ণে যেন কি বলিয়া ফু দিলেন, শেষে পুনরায় দুহাতের অঙ্গুলীর মধ্যে অঙ্গুলী দিয়ে হাত দুটিকে খুব জোর করে ধরে রাম বাবুর বক্ষস্থলে বাবাজী মহাশয় দু'খানি চরণ রেখে খানিক পরেই, আবার রামকে বুকে করে জড়িয়ে ধরে কোলে করলেন। সব যেন চটিতের মত হয়ে গেলো আমারও ঠিক ঐ ভাবেই দীক্ষা হলো। শেষে দু'জনকে দুখানি ভক্তিবিনোদকৃত "কল্যাণ কল্পতরু" নামক গ্রন্থ এবং শ্রীবৃন্দাবনের রজ, এবং দু'খানি কাগজে শ্রীমন্ত্র শ্রীহস্তেলিখে (পাছে ভুলে যাই) আমাদের হাতে দিয়ে বল্লেন ;—

"প্রথমে পানিহাটী দণ্ডমহোৎসব তলায় গিয়ে রজে গড়াগড়ি দিবি, পরে বাড়ী যাবি। তারপরে তোদের স্ত্রীকে এই মন্ত্র দিবি। মাছটা আর খাস্‌নি। "নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা," ও "প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা", এবং "মনোশিক্ষা" পাঠ করবি। যা এইবার বাড়ী যা।"

আমরা সকাল ৭।৪০ মিনিটের সময়ে দণ্ডবৎ ক'রে বাহির হ'লাম। কিন্তু

প্রাণ যেন ভয়ে অস্থির। বিকলভাব, কিছুই ভাল লাগছেনা। কলঘর হতে ফটকের কাছে যেই এসেছি—অমনি অন্তর্য্যামী, আমাদের অন্তর বুঝ্‌তে পেরে পুনরায় হল হতে বাহির হ'য়ে আমাদের ডেকে খুব জোরে ব'লে দিলেন—"যা কোন ভয় নেই।"

আমরা বাড়ীতে প্রথমে না গিয়ে বাবাজী মহাশয়ের আদেশ মত পানিহাটীর দণ্ডমহোৎসব ক্ষেত্রে দু'জনে গড়াগড়ি দিলাম ও খানিকক্ষণ পোস্তার ধারে বসে নাম মন্ত্র জপ করলুম পরে গৃহে গিয়ে সহধর্ম্মিণীকে মন্ত্র দিলাম।*

কিন্তু গৃহে এসে পূর্ব্ব কথিত ভাব ক্রমে ক্রমে প্রবল হ'তে লাগলো। যে মধুর নাম পাবার জন্যে কতলোক বাবাজী মহাশয়কে কত সাধ্য সাধনা ক'রচেন, সেই দুর্ল্ভ রত্ন আমাকে অযাচিত ভাবে প্রদান করলেন কিন্তু আমার কি দুর্দ্দৈব, আমি সেই নাম পেয়েও ভয়ানক নিরানন্দে অশান্তিতে ডুবে গেলাম—সর্ব্বোপরি—নেবুতলায় (যেখানে আমি ও পুলিনদাদা প্রভৃতি গিয়ে দীক্ষা নিয়েছিলুম) যে নাম পেয়েছি সে নাম এত অভ্যস্থ হ'য়ে গেছে যে, বাবাজী মহাশয়ের প্রদত্ত শ্রীনাম ক'রতে বসলেই, যেই নাম উদয় হয়। তখন তাঁকেও ফেলতে পরিনা, আবার একেও ধরতে পারিনা।
দিন দিন আমার বড়ই অস্থির ভাব হতে লাগলো। প্রাণ যেন জ্বলে যেতে লাগলো। কাকেও প্রাণের কথা খুলে বলতে সাহস পেলাম না। প্রকৃত কথা বল্লে হয় আমাকে ঘৃণা করবে, না হয় উপহাস করবে, তা হলেই প্রতিষ্ঠার হানি হবে, এই ভাবে যতই গোপন করি ততই জ্বলতে থাকি। মনের আগুণ মনে রেখে ৫।৭ দিন কেটে গেলো, কিন্তু আর পারি না,—সে সময়ে আমার ভাব অকথ্য।

পরমারাধ্য গোলক গত প্রভুপাদ নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আমরা পানিহাটী বাসী অনেক যুবক যাতায়াত করিতাম। তিনি আমাদের বড়ই ভাল বাসিতেন এবং আমাদের নিয়ে কীর্ত্তন করতেন। এক সময়ে তাঁর কাছে একটি মিথ্যা কথা বলি' তার জন্যে ৭দিন ধরে জ্বালা পাই, শেষে

---

* গৃহিণীতো অবাক! বল্লে—"এ আবার কি ভাব, আমাকে তুমি মন্ত্র দিচ্চো। তুমি ধর্ম্ম করগে, আমার ওসব দরকার নেই। আমার যা ধর্ম্ম তাই থাক্" (নিজের পারিবারিক কথা লিখ্‌তে লজ্জা হচ্চে, এজন্য বেশী কিছু বলবো না। এই সতী সাধ্বী বৈষ্ণব সেবা পরায়ণা রমণী যেদিন হতে পরলোকে গমন করেছেন (সন ১৩২৪।২ আশ্বিন) সেইদিন হইতেই আমার বিশেষ ভাবে দুর্দ্দশার আরম্ভ হয়েছে।)

কোন মতে শান্তি না পেয়ে তাঁর কলিকাতা বেনেটোলার বাড়ীতে গিয়ে, তাঁকে যে মিথ্যা কথা বলেচি, তা জানিয়ে দিয়ে তবে আমি সুস্থির হয়েছিনু কিন্তু এস্থলে বাবাজী মহাশয়ের নিকটে গিয়ে সব কথা খুলে বলতে আদপেও ভরসা হলো না। তাই যখন আর থাকতে পারলুম না তখন একদিন রাত্রে আমার করুণাময় ব্যাথাহারী নবদ্বীপ দাদার নিকট গিয়ে অকাতরে সব কথা খুলে বল্লুম। দাদার নিকট যখন কথা গুলি বল্লুম, দাদা তখন খুব গম্ভীর ভাবে সব শুন্‌লেন। কাছে পুলীন দাদা বসেছিলো, পুনীলদাদাকেও আভাসে অনেক কথা ব'লেছিলাম। কিন্তু পুনীলদাদাও শান্তি দিতে পারেন নি। দাদা আমাকে ও পুলীনদাদাকে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করলেন—শেষে আমাকে যা বলে যা বুঝিয়ে দিলেন তাতেই দেখি আমার সব মেঘ কেটে গেলো। গরম আগুনের উপর ঠাণ্ডা জল ঢালার মত দাদা আমাকে সামান্য ক্ষণে শীতল করে দিলেন। আঃ বাচলুম। এ বিষয়ে অনেক অতিরিক্ত কথা বলেচি—আর বলবো না, তবে এই মাত্র বলি,—নবদ্বীপ দাদা যদি আমাকে সেই সময়ে না বাঁচাতেন তবে আমার যে অন্তরটা কি হ'তো তা বলবার নয়। আমার সে সময়ের জ্বালা বোধ হয় কেউ বুঝতো না, কারণ এমন অধম এমন হতভাগ্য আর কেহ আছে বলে মনে হয় না। দাদার ক্ষমতা, শক্তি প্রাণে প্রাণে অনুভব করে তাঁর পদধূলি নিয়ে বাড়ী এলাম।

এখানে আর একটী প্রাণের ও দুর্ভার্গের কথা বলবো ;—বাবাজী মহাশয়কে তাঁর প্রকট কালের মধ্যে আমি জানতে বা ধরতে পারিনি। একদিন (১৩১২ সাল ১৫ই ফাল্গুন মঙ্গলবার।) আমার কর্ম্মস্থলে বসে আছি, হঠাৎ আমার পরম বন্ধু অগ্রজ সদৃশ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে সজল নয়নে বল্লে—"অমল! অমল! আগড়পাড়ার প্রিয়নাথ মুখোয্যের মুখে (ইঁহারা পিতাপুত্রে বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণাশ্রিত) শুনলাম "আমাদের বাবাজী মহাশয় দেহ রেখেচেন।" এই বলেই রামদাদা ব'সে পড়লো। ১৩১২ সাল ১৩ ফাল্গুন রবিবার দিবা ৯।৪৫ মিনিটে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।)

কি জানি এই কথা শুনবামাত্র আমার যে কি হলো তা বলবার নয়। আর সেই দিন হতে বাবাজী মহাশয় যেন আমার হৃদয় মধ্যে জোর করে চেপে বসলেন ও তার প্রত্যক্ষ করুণা জানাতে লাগলেন।

এখন বৈষ্ণব দাসের সেই গানটি যখনই কেউ কীর্ত্তন করেন, তখনই আমার প্রাণ অনুতাপে ভরে উঠে আমাকে অস্থির করে।

"জয় জয় শ্রীগুরু প্রেম কলপ তরু,
অদভুত যাঁহাক প্রকাশ।
হিয়া অগেয়ান, তিমির বরজ্ঞান,
সুচন্দ্র কিরণে করুনাশ ॥
ইহ লোচন আনন্দ ধাম।
অযাচিত মোহেন, পতিত হেরি যো পহু,
যাচি দেয়ল হরি নাম ॥
দুরমতি অগতি, অসতমতি যোজন
নাহি সুকৃতি লবলেশ,
শ্রীবৃন্দাবন, যুগল ভজন ধন,
মোহে করল উপদেশ ॥
নিরমল গৌর, প্রেম রস সিঞ্চনে
পুরল সব মন আশ।
সো চরণাম্বুজ মতি নাহি হোয়ল
রোয়ত বৈষ্ণব দাস ॥"

এই শেষের দু'লাইন গীত এখন যদি কেউ কাণে ধরে অবিরত আমাকে শুনায় তাতেও আমার বিরক্তি আসে না।

হায়!—এখন মনে হয়, হে শিশুপালক! হে পশুপালক! শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণ দাস দেব! তুমি মহান্ত রূপে, বৈষ্ণব রূপে, চৈত্ত রূপে আমার নিকটে অহরহ থাকলেও, আর একটীবার তোমার প্রকট রূপে দেখা দাও। বেশি নয় আমি কিছুক্ষণ তোমার চরণ ধরে কাঁদবো। তোমায় ভালবাসিনি, আদর করিনি, সেবাকরিনি. যত্নকরিনি, কিন্তু তুমি আমাকে কেবলিই ভাল বেসেছো, কেবলিই বুকে ক'রেছো, ভাবুক কবির সুরে বলি—

"আমিতো তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছো।
আমি না ডাকিতে, হৃদয় মাঝারে নিজে এসে দেখা দিয়েছো ॥
চির আদরের বিনিময়ে নাথ. চির অবহেলা পেয়েছো,
আমি দূরে চ'লে যেতে দু'হাত পশারি টেনে কোলে তুলে নিয়েছো ॥

ও পথে যেওনা, ফিরে এস ব'লে, কাণে কাণে কত বলেছো।
আমি তবু চ'লে গেছি, ফিরায়ে আনিতে, পিছু পিছু ছুটে গিয়েছো॥
চির অপরাধী পাতকীর বোঝা, হাসি মুখে তুমি বয়েছো,
আমার নিজ হাতে গড়া, বিপদের মাঝে বুকে তুলে তুমি নিয়েছো॥

অধমতারণ শ্রীগুরু আমার! আর কিছু চাই না, যে কটাদিন বাচবো যেন তোমার ভালবাসা স্মরণ করে কাঁদতে পারি, এই শক্তি দাও প্রভু। প্রাণের ময়লা ধুয়ে গিয়ে তোমাকে যেন চিনতে পারি এই ক'রো প্রভো! করুণাময়;—

"আমার স্বভাব অপরাধ করা তোমার স্বভাব ক্ষমা।
যুগে যুগে আর জনমে জনমে এ সম্বন্ধ তোমা আমা॥"

আমি হতভাগ্য হ'লেও আমার হৃদয়ে একটী গর্ব্বের বিষয় আছে, এবং যেখানেই যাই গরব করে বলে থাকি শাস্ত্রাদিতে সাধুর যা প্রকৃত লক্ষণ শুনা যায়, আমার এমন সৌভাগ্য যে, সেই সমুদয় লক্ষণাক্রান্ত লোককে আমি স্বচক্ষে দেখিছি, তাঁদের স্পর্শ করেছি, এমন কি চরণ ধুলা পাবার অধিকারিও হ'য়েছি, আমার মত দীন হীনের এর চেয়ে আর কি সৌভাগ্য হ'তে পারে? এই গর্ব্বই অনেক সময়ে আমার অধঃপতিত মনকে উচ্চে নিয়ে যায়; আমাকে আনন্দ স্মৃতিতে আপ্লুত করায়। ক্ষণেকের জন্য আমাকে সকল ভুলিয়ে দেয়। ভক্ত পাঠক! আমার এই সব প্রাণের কথায় বিরক্ত হবেন না, আমার দরিদ্রতা, আমার অযোগ্যতা; আমার অধমত্ব বুঝে আমাকে ক্ষমা করবেন, আমাকে কৃপা করবেন এইটাই বিনীত প্রার্থনা।

(পানিহাটিতে নবদ্বীপ দাদার দ্বিতীয়বার আগমন)

অনেক দিন পরে কলিকাতায় পুলিনদাদাদের বাড়ীতে দাদাকে দেখতে গিয়েছি। গিয়ে দেখি দাদা বাইরের ঘরের বেঞ্চিতে বসে একখানি সেইদিনের "ষ্টেট্সম্যান" কাগজ প'ড়ছেন। আমাকে দেখে বল্লেন, "হ্যাঁরে mation কি হয়রে?" আমি বল্লুম "মেসন" হয়, দাদা বল্লেন "মিশন" হয় না? আমি—"তা বলতে পারি না, আমি ত ইংরাজী জানি না, তোমরা পড়েচো সবই জান, অথচ মুর্খের মত থাক।" তার পরে দাদা বল্লেন, "দেখ ভাই! ক দিন ধরে আমার মাছ খাবার বড়ই ইচ্ছে হচ্চে; এখানে তো সকলের সুমুখে হবে না, তুই আমাকে পেনিটীতে নিয়ে গিয়ে মাছ খাওয়াতে পারবি? তোদের গ্রামে মাছ কেমন পাওয়া যায়?"

আমি—"খুব পাওয়া যায়, গঙ্গার ধারে বাড়ী, মাছের অভাব কি?"

দাদা—"তুই খাওয়াতে পারবি তো ?"

আমি—"তুমি যদি খাও তবে আমি খুবই পারবো।"

দাদা—"আচ্ছা, কি কি মাছ পাওয়া যায় বলতো ?"

"আমি—"তবে শোন, তপ্‌সে, ইলিস, রুই, মাগুর, কই, কাতলা, পুঁটী ইত্যাদি ইত্যাদি।"

দাদা—"বেশ বেশ, তবে চ আজই তোর সঙ্গে পেনিটীতে যাই।" (পুলিন দাদার প্রতি) "এই পুলে ! আমি অমূল্যর সঙ্গে এখনই পেনিটীতে যাব।"

পুলীন দাদা—"বেশ ত,—কোচম্যানকে গাড়ী তৈয়ার করতে বলে দি তোমাদের শিয়ালদহ ষ্টেসনে দিয়ে আসুক।"

গাড়ী তৈয়ার হলে আমরা উঠে পড়লুম ও শিয়ালদহে এসে টিকিট কিনে সোদপুরে তথা হইতে পুনরায় গাড়ী ভাড়া করে পেনিটীতে বেলা নয়টার মধ্যে পৌছুলুম। "দণ্ড মহোৎসব ক্ষেত্রের" নিকট দিয়ে আমাদের বাড়ী যাবার পথ এজন্য দাদা ঐ স্থানেই গিয়ে বৃক্ষতলে দণ্ডবৎ করে ঐই খালের শীতল ছায়ায় বসে গঙ্গার অপূর্ব্ব শোভা দেখতে লাগলেন। খানিকবাদে বল্লেন—"তোদের বাজারে আনাজ কি কি পাওয়া যায় ?"

"আমি—তা সব রকমই পাওয়া যায়, লাউ, কুমড়ো, আলু, বেগুন, শাক ইত্যাদি ইত্যাদি।"

দাদা—"আচ্ছা, মাছ খাওয়াটা আজকে থাক, পরে হবে। আজ ভাল ভাল তরকারী মাকে (আমার মাতাঠাকুরাণীকে) ক'রতে বল্‌গে। আর দেখ আতপ চাল খাবো।"

বৃক্ষতল হতে আমাদের বাড়ী অতীব নিকটে, তাই মাকে এসে দাদার সেবার কথা বল্লুম। মাতো শুনেই আনন্দে গলে গেলেন। (১) তৎক্ষণাৎ কয়লায় আগুন দিয়ে রন্ধনের উদ্যোগ করতে লাগ্‌লেন। আমি দৌড়ে বাজারে গিয়ে নানাবিধ শাক সবজী কিনে আনলুম।

ক্রমশঃ

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট।

---

(১) আমার এই স্নেহময়ী জননী চিরদিনই এইরূপ অতিথিসেবায় জন্য মুক্তহস্ত ছিলেন। আমাদের অবস্থা অতীব খারাপ হলেও তিনি তা ভ্রূক্ষেপ করতেন না। যে কোন অতিথিকে সমাগতকে পরিতোষ রূপে ভোজন করাতেন। এ বিষয়ে কখন তাঁর বিন্দুমাত্র বিরক্তি দেখি নাই। এই পুণ্যময়ী মা আমার গত ১৩২৫ সালে ২১ অগ্রহায়ণ বধামে গমন করেছেন।

বৈষ্ণব ব্রত-তালিকা

(বঙ্গাব্দ ১৩৩০, চৈতন্যাব্দ ৪৩৮।৪৩৯)

বৈশাখ।

অক্ষয়তৃতীয়া	৬ই বৃহস্পতিবার।
জহ্নুসপ্তমী	১০ই সোমবার।
একাদশী	১৪ই শুক্রবার।
শ্রীশ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী ব্রত ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্প দোলযাত্রা	১৭ই সোমবার
একাদশী	২৮এ শুক্রবার।

জ্যৈষ্ঠ।

একাদশী	১২ই শনিবার।
একাদশী	২৭শে রবিবার।

আষাঢ়।

একাদশী	১০ই সোমবার।
শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা	১৩ই বৃহস্পতিবার।
একাদশী	২৪এ সোমবার।
শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা	৩০এ রবিবার।

শ্রাবণ।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের পুনর্যাত্রা	৭ই সোমবার।
শয়নৈকাদশী সায়ং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীহরির শয়ন (চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ)	৮ই মঙ্গলবার।
একাদশী	২৩এ বুধবার।

ভাদ্র।

একাদশী ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রারম্ভ	৫ই বুধবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ	৬ই বৃহস্পতিবার।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা সমাপন শ্রীশ্রীবলদেবের জন্মযাত্রা	৯ই রবিবার।
শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী ব্রত	১৭ই সোমবার।
একাদশী	২১এ শুক্রবার।

আশ্বিন।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ব্রত প্রাতে ৯।৯ মিনিট মধ্যে পূজাদি	১লা মঙ্গলবার।
একাদশী মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীবামন দেবের অর্চ্চনা সায়ংকালে শ্রীশ্রীহরির পার্শ্ব পরিবর্ত্তন	৪ঠা শুক্রবার।
একাদশী	১৯এ শনিবার।

কার্ত্তিক।

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব	২রা শুক্রবার।
একাদশী	৩রা শনিবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের শরৎরাসযাত্রা	৭ই বুধবার।
একাদশী	১৯এ সোমবার।
শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন যাত্রা অন্নকূট	২৩এ শুক্রবার।
গোপাষ্টমী	৩০এ শুক্রবার।

অগ্রহায়ণ।

একাদশী	৩রা সোমবার।
শ্রীশ্রীহরির উত্থান ৯।৩২ মিনিট গতে ১১.৫০ মিনিট মধ্যে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত সমাপন	৪ঠা মঙ্গলবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাস যাত্রা	৬ই বৃহস্পতিবার।
একাদশী	১৮ই মঙ্গলবার।

পৌষ।

একাদশী	৩রা বুধবার।
একাদশী	১৮ই বৃহস্পতিবার।

মাঘ ।

একাদশী	৪ঠা শুক্রবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা	৭ই সোমবার।
একাদশী	১৮ই শুক্রবার।
বসন্ত পঞ্চমী শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্চ্চন	২৭এ রবিবার।
মাকরী সপ্তমী শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব উৎসব	২৯এ মঙ্গলবার।

ফাল্গুন ।

ভৈমী একাদশী	৪ঠা শনিবার। (ক)
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব উৎসব	৬ই সোমবার।
একাদশী	১৮ই শনিবার।
শ্রীশ্রীশিবরাত্রি ব্রত	২১এ মঙ্গলবার।

চৈত্র ।

একাদশী আমর্দ্দকী ব্রত শ্রীশ্রীগোবিন্দার্চ্চন	৪ঠা সোমবার।
শ্রীশ্রীগৌর পূর্ণিমা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোল যাত্রা।	৮ই শুক্রবার

৪৩৯ চৈতন্যাব্দ আরম্ভ।

একাদশী	১৮ই সোমবার।
শ্রীশ্রীরামনবমী ব্রত	৩১এ রবিবার।

(ক) কোন কোন পঞ্জিকাতে পরদিন মহাদ্বাদশী লিখিত হইয়াছে উহা ভ্রম, ঐ দিন উপবাস হইবে না। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিতা যতিধর্ম্মপরায়ণা (বিধবা) দ্বিজপত্নীগণেরও এই নিয়মে উপবাস হইবে। জিজ্ঞাস্য থাকিলে সার্ব্বভৌম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন লালজি গোস্বামী (শ্রীধাম বৃন্দাবন) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন (১৬১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা) বা প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী ভাগবতরত্ন (শ্রীধাম নবদ্বীপ) মহাশয়গণকে পত্র লিখিতে হইবে।

আচার্য্যগণের অভিমতানুসারে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, সম্পাদক।

ভক্তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

(২১শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৩০ সাল)

প্রার্থনা

"হৃদয় নিভৃতরঙ্গে বর্ত্তসে দীনবন্ধো
ত্বমিহ সুখনিবাসঃ সচ্চিদানন্দ সিন্ধুঃ।
নিরবধি বিনিমগ্নো দুঃখ সংসার সিন্ধৌ
অহ মহহ কৃপালো বঞ্চিতঃ প্রেমবিন্দো॥"

দীনবন্ধো ; সকল শাস্ত্র, সকল সাধক এবং সকল সম্প্রদায়ই একবাক্যে বলিয়া থাকেন তুমি নিত্য সত্য, তুমি জ্ঞান স্বরূপ, তুমি প্রেমানন্দ সিন্ধু, তুমি আনন্দময়। তোমাতে দুঃখ নাই, শোক নাই, ভাবনা নাই, হতাশ নাই। তুমি সর্ব্বজীব-জীবন, শুধু আমার বলিয়া নয় সর্ব্বজীব-হৃদয়েই সর্ব্বদা তুমি বিরাজমান। জীবহৃদয়ে তোমার অভাব কখনও হয় না। কিন্তু কি পরিতাপ—কি দুঃখ—কি দুর্ভাগ্য! যাহার হৃদয়ে সেই প্রেমময়—পরিপূর্ণ আনন্দঘনমূর্ত্তি সর্ব্বদা বিরাজিত সেই আমি আনন্দ কাহাকে বলে তাহা জানিতেও পারিলাম না। সামান্যক্ষণ বিষয় মদের নেশায় বিভোর হইয়া মনে করি আনন্দ পাইলাম ; কিন্তু উহা যে আনন্দ নয়, পরক্ষণে অধিকতর অবসাদ আসিয়া তাহা বেশ বুঝাইয়া দেয়।

প্রেমে মাতিয়া কি সুখ, ভাবে ভাবে তোমাকে পাইলে কি যে শান্তি তাহা অনুভব তো হইলই না, সে কথা ভাবিতেও পারি না। নিজে চেষ্টা যে একেবারে করি নাই তাহা বলিতে পারি না ; কিন্তু কিছুই হয় নাই। তাই এখন বেশ

বুঝিয়াছি তোমার কৃপাভিন্ন প্রেম পরিপূরিত আনন্দঘনমূর্ত্তি যে তুমি, তোমাকে জানিতে পারিব না ; আর তোমাকে না জানিলেও আমার এ অশান্তি কিছুতেই দূর হইবে না। আজ তাই কাতর প্রাণে তোমার নিকট প্রার্থনা তুমি তোমার কৃপাবারি সিঞ্চন করিয়া আমার ত্রিতাপ তপ্ত হৃদয় সুশীতল কর। আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না। শান্তিময়! অধমের প্রতি করুণা নয়নে একবার ফিরিয়া চাও; আমি তোমার কৃপায় জনমের মত অশান্তি দূর করিয়া শান্তিময় প্রাণে ভাবে বিভোর থাকিয়া জীবন জনম ধন্য করি।—দীনে দয়া কর।

দীন—সম্পাদক

বিশ্বরূপের সঙ্গীত (৯)

(জয়) গৌরচন্দ্র দয়াল দীনজন শরণ তাপ দুঃখ হরণহে
বিষ্ণুপ্রিয়া বর নাগর নদীয়া নাগরিগণ মন মোহন হে ॥
কেলি কীর্ত্তন নটন রঙ্গ সু-ললিত মধুর ত্রিভঙ্গ হে
রঙ্গ কৌতুক হাস্য রসময় রসিকজন চিত রমণ হে ॥
সর্ব্বমঙ্গল কারণ কলিজন ক্লেশ কলুষ নাশন হে
বৃন্দারণ্য সু-যশ মহিমাগুণ স্বজনগণ কৃত গায়ন হে ॥
মত্ত মানস চপল রূপরস ভোগ বিলাসে নিমগ্ন হে
(যেন) তপ্ত মরু-মাঝে ভ্রান্তি-মরিচিকা তৃষিত জনে রাখ শরণ হে ॥
বিশ্বরূপ বিহিত চাহে শুনি নাম পতিত পাবন হে
জনম মরণ এ যাতনা পুনঃ পুনঃ রক্ষ প্রভু দীনতারণ হে ॥

সম্পাদক

আনন্দ-লীলা। (৩)

যাহা হউক মোটামুটি বুঝা গেল যে, যিনি অনন্ত আনন্দময় তাঁহার প্রকৃতিতে এক নিত্যকালস্থায়ী অসীম ব্যাকুলতা রহিয়াছে। এই ব্যাকুলতা কিসের জন্য ?

উত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন! সকলই রহস্য। তাঁহার বাহিরে যে আর কিছুই নাই, তাহা হইলে নিজে নিজেকে আলিঙ্গন করিবার জন্য, নিজেকে নিজে আস্বাদন করিবার জন্য। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহারই নাম আত্মারামের রমণ। এ কথা শ্রীশ্রীরাসলীলায় পরিব্যক্ত হইবে। কিন্তু প্রথমেই বিষয়টিকে এত কঠিন করিয়া প্রয়োজন নাই।

সহজ কথায় দেখিতেছি ভগবান আত্মদানের জন্য ব্যাকুল। সমুদ্র যেমন আপন আনন্দে অধীর হইয়া সর্ব্বদাই নৃত্য করে, ঢেউ তুলিয়া তুলিয়া তটের চরণে আসিয়া লুটাইয়া লুটাইয়া পড়ে, কিন্তু প্রস্তরময় তট নীরব ও নিস্পন্দ, সে সাড়াও দেয় না। সমুদ্র তরঙ্গ বিফলমনোরথ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া যায়—কিন্তু এজন্য সমুদ্রের রোষ নাই, অভিমান নাই। রোষ থাকিলে সমুদ্র অসীম জলরাশি উচ্ছ্বাসিত করিয়া পৃথিবীকে ভাসাইয়া ও ডুবাইয়া দিতে পারিত, কিন্তু সে তাহা করে না, বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায় আবার ঘুরিয়া আসিয়া সেই অকৃতজ্ঞ তটের অঙ্গে লুটাইয়া পড়ে। অনন্ত আনন্দময় পরমপুরুষও তেমনি। চরমতত্ত্ব যাহাই হউক সে কথা তুলিয়া এখন প্রয়োজন নাই। এই প্রকাশিত বিশ্বলীলায় দেখিতেছি একদিকে শ্রীভগবান আর একদিকে মানুষ। মানুষ ভগবানকে ডাকে না, তাঁহাকে ভুলিয়া আপনার প্রকৃত কল্যাণ উপেক্ষা করিয়া দুঃখ ও যন্ত্রণার পথে ছুটিতেছে। এখন ভাবিতে হইবে ভগবান কি করিতেছেন? তিনি কি কর্ম্মফলদাতারূপে যে যেমন কর্ম্ম করিতেছে কেবলমাত্র তদনুযায়ী ফল বিধান করিতেছেন? প্রথমটা অনেকের তাহাই মনে হয়। কিন্তু শ্রীভগবানের স্বরূপের অর্থাৎ তাঁহার আনন্দভাবের পরিচয় যিনি পাইয়াছেন, তিনি দেখিতেছেন যে, ভগবান ছুটিয়া ছুটিয়া আসিতেছেন, তিনি আপনার আনন্দে বিভোর ও আত্মহারা, পুনঃ পুনঃ ছুটিয়া আসিয়া মানবের হৃদয়-দুয়ারে আঘাত করিতেছেন। মানুষ অহঙ্কারের অর্গল দিয়া হৃদয় দুয়ার বন্ধ করিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া অবিদ্যার দুঃস্বপ্ন দর্শন করিতেছে। প্রেমময় হরি সাড়া না পাইয়া ফিরিয়া যাইতেছেন, কিন্তু তাঁহার অভিমান নাই, তাঁহার রোষ নাই, আবার তিনি আসিতেছেন। এইরূপ লীলা তিনি সর্ব্বদাই করিতেছেন।

এইবার বিষয়টি শাস্ত্রবাক্য ও তত্ত্বের মধ্য দিয়া আলোচনা করা যাউক। পৌরাণিক সাধনার প্রাণের কথা শ্রীভগবানের আবির্ভাব। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন তাঁহার অবতার অসংখ্য। একটা সাধারণ কথা, ভগবান কেন আসেন? ইহার সাধারণ উত্তর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে।

সে শ্লোককয়টি সকলেই জানেন। সেখানে বলা হইয়াছে যে, যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখনই তিনি আসেন ও দুষ্কৃতিকারীদিগকে বিনাশ করিয়া ধর্ম্মসংরক্ষণ করেন। যাঁহারা শ্রীভগবানের আনন্দভাব হৃদয়ে অনুভব করেন এই স্থানটি পড়িয়া তাঁহাদের মনে একটু সন্দেহের উদয় না হইয়াই পারে না। "আমি দুষ্কৃতিকারীদিগকে বিনাশ করিব" এই কথা শুনিয়া মানুষ বলিবে তাহা হইলে দুষ্কৃতিকারীদের আর উদ্ধার নাই। এ যে অনন্ত-নরক-বাদ প্রচার করা হইল। আচার্য্য শঙ্করের টীকায় এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই, কিন্তু পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী তাঁহার টীকায় এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে।
তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োঃ॥"

শিশুকে লালনে মায়ের তাড়না যেমন নির্দ্দয়তা নহে বিশ্বনিয়ন্তা মহেশ্বরেরও সেইরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানের আবির্ভাবের অন্যরূপ কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শ্রীরাসলীলার শেষাংশে বলা হইয়াছে—

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥"

অর্থাৎ শ্রীভগবান মানবদেহ আশ্রয় করিয়া এমন সব লীলা করেন যাহা শ্রবণ করিয়া মানুষ ভগবৎপরায়ণ হয়।

ভগবদাবির্ভাবের এই হেতুটীকেই সূত্ররূপে অনুসরণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত আনন্দলীলার ধারা, যাহা যুগ কল্প ও মন্বন্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে ও শ্রীনদীয়ায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।

এই লীলায় যাহা বিপরীত দিক, সেই দিকটা আশ্রয় করিয়া আমরা কথাটা পরিস্ফুট করিতেছি। হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, দন্তবক্র ও শিশুপাল, এই তিন দৈত্যযুগল পৃথিবীতে কত ভয়ঙ্কর অশান্তি উৎপাদন করিয়াছেন। ইহাদের অত্যাচারে পৃথিবী কাতরা হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়াছেন এবং ব্রহ্মার সাহায্যে ক্ষীরোদসাগরে যাইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়াছেন। ভগবান এই সমুদায় দৈত্যের অত্যাচার হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিবার জন্য, যথাক্রমে বরাহ ও নৃসিংহ, শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত

হইয়াছেন। ভগবানের এই আবির্ভাব ও দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধে তাঁহাকে যে দারুণ ক্লেশভোগ করিতে হয়, সেই সকল ক্লেশের কথা আলোচনা করিলে প্রথমে আমাদের মনে হয় যে,এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া ভগবান বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি যেন আর সৃষ্টি রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। দানবেরা যেন তাঁহার প্রায় সমকক্ষ। শ্রীরামচন্দ্রেরলীলা এবং শ্রীকৃষ্ণেরলীলা শ্রবণ করিলে স্বভাবতঃই মনে এই প্রকার চিন্তার উদ্ভব হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতকার শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে যে পুরাতন ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সনকাদি মুনিগণ বৈকুণ্ঠনাথকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন, জয় ও বিজয় নামক বৈকুণ্ঠের দুইজন দ্বারী তাঁহাদের ভিতরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করেন। সনকাদি মুনিগণ এজন্য জয় ও বিজয়কে অভিশাপ প্রদান করেন যে, তোরা অসুর হইয়া জন্মগ্রহণ কর। শেষে ভগবান্ আসিয়া সমুদয় ব্যাপারের মীমাংসা করিয়া দেন। এই জয় বিজয়ই অসুরযুগল হইয়া তিনবার বিশ্বলীলার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছিল।

ভগবানের পার্ষদ দুইজন ব্রহ্মশাপে আসুরী যোনিতে নিক্ষিপ্ত হইলে ভগবান্ তাহাদের সান্ত্বনা করিয়া বলিয়াছিলেন "তোমাদের ভয় নাই, ভালই হইবে; আমি ব্রহ্মশাপ নিবারণ করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে আমার ইচ্ছা নাই। এই যে অভিশাপ ইহা আমার অভিপ্রায় মতই হইয়াছে।" শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ের উনত্রিংশৎ শ্লোকের এইরূপ মর্ম্ম। এই শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন যে, প্রকৃত তত্ত্ব এই—

"যদ্যপি সনকাদীনাং ক্রোধো ন সম্ভবতি। ন চ ভগবৎপার্ষদয়োঃ তয়োঃ ব্রাহ্মণ-প্রাতিকূল্যং। ন চ ভগবতো স্বভক্তোপেক্ষা। ন চ বৈকুণ্ঠগতানাং পুনর্জন্ম। তথাপি ভগবতঃ সিসৃক্ষাদিবৎ কদাচিৎ যুযুৎসা সমজনি। তদাহেবা-মবয়লত্বৎ স্বপার্ষদানাঞ্চ তুল্যবলত্বেঽপি প্রতিপক্ষানুপপত্তেঃ। এতৌ এব ব্রাহ্মণনিবারণে প্রতিবর্ত্ত্য তেষু চ ক্রোধমুদ্দীপ্য তচ্ছাপব্যাজেন প্রতিপক্ষো বিষয়ে যুদ্ধকৌতুকং সম্পাদনীয়মিতি ভগবতৈব ব্যবসিতঃ অতঃ সর্ব্বং সংগচ্ছতে তদিদমুক্তং শাপো ময়ৈব নিয়মিত ইতি মাভৈষ্টম্ ॥"

যদিও সনকাদি ঋষিগণের ক্রোধ হওয়া সম্ভব নহে এবং শ্রীভগবানের পার্ষদ দুইজনের ব্রাহ্মণের প্রতি কোনরূপ শত্রুতা থাকা সম্ভব নহে, তাহার পর ভগবান আপনার ভক্তকে কখনও উপেক্ষা করেন না এবং যাহারা বৈকুণ্ঠে গিয়াছে তাহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না, তথাপি শ্রীভগবানের মনে যেমন সৃষ্টির ইচ্ছা

জাগ্রত হয়, সেইরূপ একদিন যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা জাগ্রত হইল। কিন্তু শ্রীভগবানের তুলনায় অন্য সকলেই অত্যন্ত অল্পবল, তাঁহার যাহারা পার্ষদ তাহারা অনেকটা সমবল। ভগবানের এই যুদ্ধ-ইচ্ছা সফল করিবার জন্য তাঁহার এই পার্ষদ দুইজনকে প্রতিপক্ষ করিলেন। ব্রাহ্মণদিগকে বৈকুণ্ঠপ্রবেশে বাধা দিবার প্রবৃত্তি পার্ষদদ্বয়ের মনে জাগাইয়া দিয়া এবং ব্রাহ্মণদিগের মনে ক্রোধের উদ্দীপন করাইয়া ব্রাহ্মণদিগের শাপ প্রদানের ছলে স্বকীয় পার্ষদদ্বয়কে প্রতিপক্ষ করিয়া যুদ্ধকৌতুক সম্পাদন করিতে হইবে এই প্রকারের ব্যবস্থা ভগবানই করিলেন। এই জন্যই ভগবান জয়বিজয়কে বলিলেন যে, এই শাপ আমার অভিপ্রায়েই হইয়াছে, তোমরা ভয় করিও না। জয়বিজয়ের এই উপাখ্যান প্রচারিত হওয়ার পর আমাদের সমুদয় ধারণা একেবারে বদলাইয়া গেল। পূর্ব্বে ভাবিতেছিলাম দৈত্যের উদ্ভবের দ্বারা পৃথিবীর ক্লেশ হইলে ভগবান সত্যই বিপন্ন হইয়া পড়েন—এবং সত্যই বুঝি তিনি দৈত্যগণকে বিনাশ করেন, এখন দেখা গেল দৈত্যেরাও তাঁহার আপনার লোক, যাত্রার দলের অধিকারী যেমন আপনার আশ্রিত ব্যক্তিকে আপনার শত্রু সাজাইয়া যুদ্ধের অভিনয় করিয়া স্বয়ং আনন্দের আস্বাদন করেন এবং অন্যান্য সকলেরও আনন্দ বিধান করেন—ভগবানও সেইরূপ আপনার লোককে দৈত্য সাজাইয়া বীররসের অভিনয় করেন। আনন্দই এ লীলার মূল। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই আনন্দলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

মহারাজ পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম ঘটনা, এই ঘটনাতেও অনেকগুলি অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হইয়াছে এবং ভগবানের এই আনন্দলীলার সাহায্য ব্যতীত অন্য প্রকারে ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায় না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার টীকায় এ কথা স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন। মহারাজা পরীক্ষিতের ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠ ও ভগবদ্ভক্ত সাধু ব্যক্তির সামান্য পিপাসায় একেবারে জ্ঞানশূন্য হওয়া অসম্ভব। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে সমাধিস্থ ব্রাহ্মণকে চিনিতে না পারাও অসম্ভব—সুতরাং এই প্রকারের ঘটনাগুলির সৃষ্টি করিয়া মহারাজ পরীক্ষিতের মনে বৈরাগ্য জাগাইয়া তাঁহাকে স্বধামে লইয়া যাওয়া এবং কলি সমুত্তীর্ণ হওয়ার অমোঘ উপায়স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র প্রচার করা এই লীলার উদ্দেশ্য। সুতরাং আনন্দময়ের আস্বাদনই শ্রীমদ্ভাগবতের যাবতীয় লীলার গূঢ় ও একমাত্র তাৎপর্য্য। আমাদিগকে এই আনন্দভাবের জাগরণে জাগ্রত হইতে হইবে—এই জাগ্রত অবস্থার নামই "প্রসন্নোজ্জ্বলচিত্ততা"

—এই অবস্থাতেই মানুষ রসিক ও ভাবুক হয়।—এই অবস্থার মধ্য দিয়া বিশ্বব্যাপারের আলোচনা করিলে শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যাইবে।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, শ্রীমদ্ভাগবতের এবং শ্রীকৃষ্ণলীলার গূঢ় মর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক সার্ব্বজনীনভাবে প্রচারিত হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার সাহায্যে আলোচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলারহস্য বুঝিতে পারিলে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারা যাইবে—ইহার কারণ এই যে, শ্রীকৃষ্ণলীলার মধ্যে সর্ব্বত্র অর্থাৎ সকলব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায় না—গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্যেরা বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অবতার নহেন—তিনি অবতারী। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের মত। অন্যান্য পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইলেও তাঁহার স্বরূপের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় নাই; এই জন্য কেহ কেহ বলেন কৃষ্ণনারায়ণ, কেহ বলেন তিনি বামন, আবার কেহ বলেন ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয় পুরুষ অবতার। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপায় প্রকৃত রহস্যের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই যে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচারিত হইয়াছে ইহার সমুদয়গুলিই সত্য—যিনি যতটুকু দেখিয়াছেন বা বুঝিয়াছেন তিনি ততটুকুই বলিয়াছেন। প্রকৃত কথা এই, শ্রীকৃষ্ণ অবতারী। তাঁহার দেহে সমুদয় অবতার বিদ্যমান সুতরাং শ্রীকৃষ্ণলীলার সমুদয় ঘটনা এক পর্য্যায়ভুক্ত নহে। গৌড়ীয় আচার্য্যগণ সমগ্র শ্রীকৃষ্ণলীলাকে মোটামুটী তিন ভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ, পুরদ্বয়ে অর্থাৎ মথুরা ও দ্বারকার পূর্ণতর, আর বৃন্দাবনে পূর্ণতম—এই গেল মোটামুটি বিভাগ। তাঁহার পর শ্রীবৃন্দাবনে যে লীলা হইল তাহার সমুদয় ঘটনাও একশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ পূতনা ও অন্যান্য অসুর বধ করিয়াছেন, একথা লীলাগ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বরূপে অসুর সংহার করেন নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের উক্তি অনুসারে "বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহার।" যিনি দৈত্য বিনাশ করিলেন তিনি বিষ্ণু।

এই রহস্য কি প্রকারে বুঝিতে হইবে, এইবার তাহাই বলিতেছি। বিষয়টি অনেকের কাছে খুব কঠিন বলিয়া মনে হয় কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ও লীলাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহারা উপদেশ পাইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ইহা অত্যন্ত সহজ। একটা ঘটনা ঘটিল। সকলের নিকট ঘটনাটি একরূপ নহে। যাঁহার শক্তি বা উপলব্ধি

যেরূপ তিনি এই ঘটনাটীকে সেইরূপ একটা নাম দিলেন। এই প্রকারের একটা ঘটনাকে একজন বলিলেন পূতনাবধ, আর একজন বলিলেন পূতনা-মোক্ষণ। যাঁহারা বিষ্ণুতত্ত্বে ভগবত্তা পর্য্যবসিত দেখেন, তাঁহারা বলিলেন পূতনা বিনষ্ট হইল, আর যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পরতত্ত্ব বলিয়া ধরিয়াছেন তাঁহারা দেখিলেন পূতনা মাতৃগতি লাভ করিল। ইংরাজীতে যাহাকে Standpoint বলে তাহারই প্রভেদনিবন্ধন এইরূপ ঘটিতেছে। যাঁহারা বাহিরকে একান্তভাবে বাহির বলিয়া ধারণা করেন অর্থাৎ যাহারা বহিঃপ্রাজ্ঞ তাহারা ইহা বুঝিবে না আবার যাহারা অন্তঃপ্রাজ্ঞ তাহারাও ইহা বুঝিবেনা, 'সৎ' ভাবে বা চিৎ ভাবে অর্থাৎ সত্তা বা চৈতন্যকে পরতত্ত্ব বলিয়া তাহারই সাহায্যে যাঁহারা যাবতীয় তত্ত্ব বা ঘটনা উপলব্ধি করেন তাঁহারা এই রহস্য বুঝিবেন না। যাঁহারা উভয়তঃপ্রাজ্ঞ অর্থাৎ সৎ ও চিৎ এই উভয়ভাবের আনন্দে সমন্বয় বা সার্থকতা উপলব্ধি করায় যাঁহাদের লীলাদৃষ্টি স্ফুরিত হইয়াছে তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারিবেন।

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ অনেক অসুর বিনাশ করিয়াছেন, ইহার সমস্তগুলি সম্বন্ধেই এই এক কথা।

তাহা হইলে এইটুকু পাওয়া গেল যে, বৃন্দাবনের শ্রীনন্দনন্দন যদিও পরম-তত্ত্ব, যদিও তিনি বৃন্দাবনে সর্ব্বদাই লীলা করিতেছেন তথাপি বৃন্দাবনে তাঁহাকে ধরা বড়ই কঠিন। ঘটনাগুলি বিমিশ্র, ইহাদের মধ্যে কোন্ কোন্‌টিতে স্বরূপের প্রকাশ আছে তাহা ধারণা করা বড়ই কঠিন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলায় এ প্রকারের দুরূহতা আদৌ নাই। এখানে বিমিশ্র ঘটনার সমাবেশের দ্বারা স্বরূপের উপলব্ধিতে আমাদের বিশেষ প্রতিবন্ধক নাই। অবশ্য শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনন্দনন্দনের স্বরূপ প্রকাশের আরও অন্যান্য প্রতিবন্ধক আছে সে সমুদয় আমরা পরে আলোচনা করিব। উপস্থিত আমরা দেখিতেছি যে, বৃন্দাবনে অবতারীর দেহে থাকিয়া অন্যান্য অবতারেরা নিজ নিজ কার্য্যসাধন করায় আমরা পরতত্ত্বের উদ্দেশ সকল সময়ে করিতে পারি না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় স্বরূপের পরিচয় সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল! এই স্পষ্টতা কি প্রকারে সাধিত হইয়াছে তাহার আলোচনা আমরা বিস্তৃতভাবে ক্রমশঃ করিব। উপ-স্থিত আচার্য্যগণের মতানুসারে এইটুকু বলিতে চাই যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় শ্রীকৃষ্ণের এই স্বরূপের পরিচয় স্পষ্টরূপে পাওয়া যায়। কবি প্রেমানন্দ দাস তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত পদটিতে এই কথাই বলিতেছেন।—

"এ মন গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর।
হেন অবতার, হবে কি হয়েছে,
হেন প্রেম পরচার।
দুরমতি অতি, পতিত পাষণ্ডী,
প্রাণে না মারিল কারে।
হরিনাম দিয়ে, হৃদয় শোধিল,
যাচি গিয়া দ্বারে দ্বারে॥
ভব বিরিঞ্চির, বাঞ্ছিত যে প্রেম,
জগতে ফেলিল ঢালি।
কাঙ্গালে পাইয়ে, খাইল নাচিয়ে,
বাজাইয়ে করতালি॥
হাসিয়ে কাঁদিয়ে, প্রেমে গড়াগড়ি,
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে, করে কোলাকুলি,
কবে বা ছিল এ রঙ্গ॥
ডাকিয়ে হাঁকিয়ে, খোল করতালে,
গাইয়ে ধাইয়ে ফিরে।
দেখিয়া শমন, তরাস পাইয়ে,
কপাট হানিল দ্বারে॥
এ তিন ভুবন, আনন্দে ভরিল,
উঠিল মঙ্গল রোল।
কহে প্রেমানন্দ, এমন গৌরাঙ্গে,
রতি না জন্মিল তোর॥"

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক বি-এ
(ভাগবতরত্ন)

মহাশ্মশান।

এই কি মহাশ্মশান? এই কি সেই বৈরাগ্যের আকর ভূমি, চিরশান্তিময়, পুণ্যময় স্থান? ভবযন্ত্রণা-পারাপারের তরণী, অভেদাত্মার মিলন ক্ষেত্র? এখানে কি বৈষম্যের লেশমাত্র নাই? এখানে আসিলে কি দীনদরিদ্রে রাজায় প্রজায়, মহত্তেক্ষুদ্রে, বিদ্বান ও মূর্খে, পুণ্য ও পাপীতে সংসারী ও সন্ন্যাসীতে, উচ্চনীচে, সুন্দর কদাকারে কোন প্রভেদ নাই? সকলেরই কি এইখানে শেষ অবসান? এখানে কি সংসারের জ্বালা, রিপুর তাড়না, অর্থের ভাবনা, বিরহব্যাথা ভোগ করিতে হয় না? এখানে কি স্ত্রী-পুত্র কলত্রের মঙ্গলামঙ্গল ভাবিতে হয় না, আশানিরাশার ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিতে হয় না, উত্তমর্ণের ভয়ে জড় সড় হইতে হয় না?

এই কি মহাশ্মশান! এই কি সে মহত্বের আধার; সাম্য সংস্থাপক শ্রীক্ষেত্র, ইহ পরকালের সম্মিলন স্থান। এই কি মহানিদ্রার অনন্তশয্যা, মহাপ্রস্থানের প্রশস্ত পথ! এই পথদিয়া কি সকলকেই একদিন না একদিন যাইতে হইবে? তুমি আমি, পশু পক্ষী, কীটপতঙ্গ লতাপাতা কি কেহই পরিত্রাণ পাইবে না? এখানে কি ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার, পাণ্ডিত্যের অভিমান, ত্যাগের মহিমা, দানধ্যান মায়ামমতা, সুখদুঃখ, হিংসাদ্বেষ, আশা আকাঙ্ক্ষা আনন্দবিষাদ, প্রেম অনুরাগ সবই চলিয়া যায়? সবই কি চিতাবহ্নিধূমে মিশিয়া যায়, শ্মশান মৃত্তিকায় পরিণত হয়?

এই কি সেই মহাশ্মশান। এই কি সেই শ্যামামায়ের লীলাস্থান, শব সাধনার পীঠস্থান, দিগম্বরের সমাধি মন্দির। এই কি সেই নিত্যানন্দময় চিরামৃত নিলয়। এই খানেই কি বিরাট ত্যাগের জলন্তচিতা সজ্জিত! এইখানে কি হিন্দুর অগ্নি সংস্কার হয়। ওই যে সর্ব্বগ্রাসী সর্ব্বসংহারক চিতানল ধূ ধূ করে জলছে; উহা যে কত নগর নগরী, বিটবী অটবী, নদী সরোবর, গিরি কন্দর বিজয় বৈজয়ন্তী রত্ন অলঙ্কার গ্রাস করিয়াছে। কত জনক জননীর আশা ভরসা, নয়নের মনি; কত সতী অসতী, কত ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক উহার করাল কবলে পতিত হইয়াছে। কত প্রেমিক প্রেমিকার মধু আলাপন, যুবক যুবতীর প্রেম সম্ভাষণ কত দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শায়িত নরনারী কত দেববালার দিব্যরূপ-

লাবণ্য পরিশোভিত মোহন মূর্ত্তি, কত অলিত পলিত গলিত নখদন্ত কেশযুক্ত কুৎসিত কদাকার মূর্ত্তি উহার করাল কোলে আশ্রয় লাভ করিয়াছে, কত গায়ক গায়িকার সঙ্গীতের সুধাধারা, কত স্বভাব কবির কল্পনা ঝঙ্কার, কত শিশুর হাসিরাশি চিরদিনের জন্য নীরব হইয়াছে ; কে তাহার সংবাদ রাখে।

হে মহাশ্মশান ! তোমাকে স্তবস্তুতি, অনুনয় বিনয় করা বৃথা, তুমি যে মূক, বধির, চক্ষুহীন, নির্ম্মম নিষ্ঠুর। কারো কথা, কাতরোক্তি তোমার কর্ণকুহরে পশে না ; কারো নয়নের জলে তোমার মনে দয়ার উদ্রেক হয় না। তোমার সময় নাই অসময় নাই কেবল সকলের জীবন লইতেই ব্যস্ত ; তুমি সব গ্রাস করিবার জন্য লক্ লক্ লেহিহান জিহ্বা বাহির করিয়া দাঁড়াইয়া আছ। তোমার ওই সর্ব্বগ্রাসী বিকট মূর্ত্তি দেখে আমার ভয় করে। ওই বুঝি "মরণ-রে তুহু মম শ্যাম সমান" ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমার জীবন প্রদীপ চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর রায় চৌধুরী।

পারেরকাণ্ডারী।

মনে হয় বহুদিন যাবৎ এই সংসারে আসিয়াছি, চিরদিন এইভাবে থাকিতে পারিব না ইহাও বিশেষ প্রকার ভাবনার বিষয়। কোন প্রকার বন্ধন নাই তবু যেন এক পা এদিক ওদিক হইবার উপায় নাই বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহকাল পরকাল যখন যে কালেরই ভাবনা হৃদয়ে আইসে, তখন সম্মুখে আর কিছুই দেখি না। যেন স্থল কূল বিহীন অপার সমুদ্র। তাহাতে যে উত্তাল তরঙ্গ এবং হাঙ্গর কুম্ভীর বর্ত্তমান ইহা মনে করিলেও ভীষণ আতঙ্ক উপস্থিত হয়। এই উপস্থিত আতঙ্ক নিবারণের জন্য অন্য কোনই উপায়ন্তর না দেখিয়া প্রাচীন ঋষিমহাজনগণের শ্রীচরণাশ্রয় গ্রহণ করি। তাই পরার্থ পরায়ণ ঋষিমহাজনগণ শ্রীভগবানের অভিন্নবপু শ্রীগ্রন্থাদি দান করেন। তাহাতে দেখি আমরা সাধারণ জীব ; এই জ্বালাময় মায়িক জড় জগতই আমাদের বিধি নির্দ্দিষ্ট ক্রীড়াস্থল। সম্মুখে মায়া বিষয় বাসনা ইত্যাদি পূর্ণ কর্ম্মময় ভূমি ও অপার সমুদ্র। ইহার অপর পারে বিশিষ্ট জীব অর্থাৎ শ্রীভগবানের নিত্য দাস, নিত্য সেবারত প্রকৃত মানুষ। যদিও তথায় যাইতে আমার মত দুর্ব্বলের শক্তি

সামর্থ নাই তথাপি সেই রাজ্যের মহাত্মাগণ এত কৃপালু যে, সময় সময় হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যান।

এইখানে অনন্ত জীবনাবধি মুক্ত কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবার একটী মহাসুযোগ ঃ—আমাদের ব্যবহারিক জগতের পারের নাবিকগণ বিনা মাশুলে কাহাকেও ছাড়ে না। বিশেষ পরিচিত হইলে ২।১ দিনের জন্ত বন্দোবস্ত হয় বটে। কিন্তু অন্ত যাহারা ওপার হইতে এই পারে আসে তাহারা মাশুল না দিলে নৌকায় এক পাও দিতে পারে না। তবে এই পার হইতে যাহারা যায় তাহাদের নিকট মাশুলের অভাব থাকিলে ছার ঠেকার মত কাহারও উপর অনুগ্রহ বর্ষণ হইয়া থাকে। ইহাইত সাধারণ নদী পারের ব্যবস্থা। আর এই দুস্তর ভবনদী পারের ব্যবস্থা উল্লিখিত ব্যবস্থা অপেক্ষা অনন্ত কোটী গুণে উত্তম। কারণ যিনি এই ভবসমুদ্র পারের কাণ্ডারী, তাঁহার করুণার কথা চতুর্ম্মুখ, পঞ্চমুখও বলিয়া শেষ করিতে পারেন না। আমি ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র কীট তুল্য মনুষ্যাধম কি বলিব! তবে না বলিলে প্রাণে সুখ পাওয়া যায় না। সুখ পাওয়ার যোগ্য তেমন কথাও আর জগতে সৃষ্টি হয় নাই। তাই পাগলের মত আবল তাবল বলিতে ইচ্ছা হইতেছে।

যিনি ভবপারের কাণ্ডারী তিনি মাশুলের কোনই খোঁজ করেন না। কেবল দেখিতেছেন প্রতিবারেই নৌকা বোঝাই হইয়া আসিতেছে কি না! তাঁহার (ভবপারের কাণ্ডারীর) ঐকান্তিকভৃত্য মাল্লাগণের উপর শুধু এই আদেশ "কোন বিচার করিওনা যারে পাও তারে আন।" তাঁহারাও দয়ার সাক্ষাৎ মূর্ত্তি। যেমন দয়াল কাণ্ডারী, তেমন কৃপালুমাল্লা। কেবল যে ঘাটের পারে যাইবে তাহারাই পার হইবে, মাল্লাগণের মনে তাহা ভাল বোধ না হওয়ায়, তাঁহারা আমাদের এই পারে আসিয়া বহুপ্রকার কষ্টে এমন কি অসহনীয় লাঞ্ছিত হইয়াও, এই সাধারণ জীবগণকে কত অনুনয় বিনয় করিয়া ভবপারের ঘাটে লইয়া যাইতেছেন। এই যে শুধু ২।১ বার তাহা নয়, বহুবার, গণিয়া শেষ করা অসম্ভব। ওহো! আমাদের কি ভাগ্য! আমরা কলির জীব, সুতরাং কলিকালের (বর্ত্তমান কালের) কথাই চাক্ষুষ প্রমাণ দ্বারা ব্যক্ত করা উচিত।

বর্ত্তমান যুগে (ধন্ত কলিযুগে) আমরা একজন পরম কারুণিক পারের কাণ্ডারী পাইয়াছি। তাঁহার দয়ার সীমা নাই। আমরা ধন, বিদ্যা, জাতি, রূপ, গুণ, যৌবন, ইত্যাদিতে অভিমানী হইয়া তাঁহাকে মনে করিতেও কুণ্ঠাবোধ

করিতে পারি; কিন্তু তিনি সর্ব্বাবস্থায় সকলকেই নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া নিতে ব্যস্ত। শুধু ব্যস্ত নন; পাপী, তাপী, নিন্দুক নাস্তিক, পাষণ্ডী গণকে পার করিতেই হইবে, ইহাই তাঁহার দৃঢ় পণ। আমার মস্তিষ্কের দোষে স্বীকার করিতে না পারি; কিন্তু বহুবার তিনি আমাদিগকে তাঁহার সান্নিধ্যে নিয়া-যাইতেছেন। তবে সেখানে আমাদের ভাল লাগে না বলিয়া চিরঅভ্যাসের বাসস্থানে পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছি।

এখন কি বলিতে হইবে যে, দয়াল কাণ্ডারী হইয়াও আমরা কাণ্ডজ্ঞান হীন বলিয়া বর্জ্জন করিলেন? কখনই নয়, তিনি বর্জ্জন করিতেই পারেন না। তিনি বর্জ্জন করিলে আমাদের অবস্থা কি হইবে তাহা চিন্তা করিবার অবসর আছে কি? তিনি পতিত পাবন, কাঙ্গালের ধন, দয়াময় করুণাসিন্ধু, সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্ব শক্তিমান। ইহার কোনটীতেই তিনি অপূর্ণ নন। সুতরাং পূর্ণতম ইহা স্বীকার্য্য। পৃথক কোন প্রমান সাপেক্ষ নয়।

এতক্ষণ যাঁহার কথা বলা হইতেছে, সকলেই তাঁহার নাম গুণ লীলা শুনিয়াছেন। ইনিই সেই শ্রীশচী-জগন্নাথের দুলালিয়া ন'দের চাঁদ নিমাই, ভক্তের প্রাণ গৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু।

আমি দুস্তর ভবসমুদ্রের অতল তলে পতিত। অতএব সমদুঃখী বন্ধুগণ! আসুন, প্রাণ ভরিয়া ভব ভয়হারী কৃপাময় শ্রীশ্রীগৌর হরির শ্রীচরণ যুগলে আশ্রয় নিয়া সকলে এক সুরে, এক তানে, এক প্রাণে, বলিতে থাকি—"প্রভো! আমরা বিষম ভবার্ণবে পতিত হইয়া কখন ডুবি কখন ভাসি হা হুতাশে প্রাণ যায় যায় অবস্থা। এ অবস্থা বোধ হয় নরক যন্ত্রণা অপেক্ষাও বিভীষিকা ময়। আমাদিগকে উদ্ধার কর।"

বেশী দিনের কথা নয় ৪৩৮ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এই অবস্থা দেখিয়া তুমিই কাঁদিয়াছিলে, এবং আমাদের জন্যই সমস্ত ভোগৈশ্বর্য্য, বৃদ্ধা জননী শ্রীশচী মাতা, লক্ষ্মী স্বরূপিণী নিরুপম রূপ সম্পন্না চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া যুবতী গৃহিনী, বড় সাধের নদীয়া ও সুরধুনী এবং প্রাণের ভক্তবৃন্দ পরিত্যাগ করিয়া চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়সেই কঠোর সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলে। আমরা কেমন করিয়া ভবসিন্ধুর কূল পাইব, তাই ভাবিয়া কলিযুগধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্ম সার শ্রীশ্রীনাম সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিয়াছ। বিশেষতঃ আমাদের দশা অতীব শোচনীয় দেখিয়াই অভিন্ন কলেবর প্রাণের স্বরূপ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর হাত ধরিয়া যাহা বলিয়া গিয়াছে আজ কবির ভাষায় তাহা বলি:—

"বিরলে নিতাই পাঞা, নিজ কাছে বসাইয়া,
মধু ভাষে কহে ধীরে ধীরে।
জীবেরে সদয় হঞা হরি নাম লওয়াও গিয়া,
যাও নিতাই সুরধুনী তীরে॥
প্রভু কহে নিত্যানন্দ, জীব সব হৈল অন্ধ,
কেহ ত না পাইল হরিনাম।
এক নিবেদন তোরে নয়নে দেখিবে যারে,
কৃপা করি লওয়াইবে নাম॥
কত পাপী দুরাচার নিন্দুক পাষণ্ডী আর,
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।
শমন বলিয়া ভয় জীবে যেন নাহি রয়,
সুখে যেন হরি নাম লয়॥
কুমতি তার্কিক জন পড়ুয়া অধমগণ,
জন্মে জন্মে ভকতি বিমুখ।
কৃষ্ণ প্রেম দান করি বালক পুরুষ নারী,
খণ্ডাইও সবাকার দুঃখ॥
জীবে দয়া প্রকাশিয়া সংসার ধর্ম্ম আচরিয়া,
পূর্ণ কর সকলের আশ।
চৈতন্যের আদেশ পাঞা, চলে নিতাই বিদায় হঞা,
সঙ্গে চলু গদাধর দাস॥"

প্রাণের ভাই নিতাই আমার কলি জীব বড় দুঃখী। তাহাদের ঘরে ঘরে গিয়া অযাচিত ভাবে নাম বিলাও। পাষণ্ডী নিন্দুক দুরাচার পাপী কেহই যেন বঞ্চিত হয় না। নাম দেওয়ার কোন প্রকার বিধি ব্যবস্থা দিও না। নাম নিতে নিতে চিত্ত শুদ্ধ হইলে আপনা হইতে সকল বিধি নিয়ম পালন করিবে। দেখিও আমার কলির জীব যেন একজনও বাকী থাকে না, ভক্তি বিমুখ কুমতি তার্কিক পড়ুয়াগণও এই যুগে নাম প্রেম হইতে বঞ্চিত হইবে না। আমি এই সকল জীবের জন্য বড় ব্যস্ত। তুমিই একমাত্র পতিত কলিজীবপাবনের উপায়। তুমি বিনে এই গুরুকার্য্য আর কাহাকেও সম্ভবে না। অতএব সুরধুনী তীরে (বঙ্গদেশে) যাও অযাচিত ভাবে নাম বিলাও। (অর্থাৎ এই আদেশ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনীলাচল ধামে থাকিতে দিয়াছিলেন) প্রভো! সাধে কি

তোমার অন্তর্দ্ধানের পর অনুরক্ত ভক্তবৃন্দ "কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া। পতিত দেখিয়া কেবা উঠিবে কাঁদিয়া॥" বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন!

প্রভো! যদিও প্রপঞ্চ জগতের জড়ীয় চক্ষুদ্বারা তোমার সেই নিত্যলীলার চিন্ময় বপু দেখিতে অক্ষম, জড়ীয় কর্ণে তোমার শ্রীমুখ নিঃসৃত অতুলনীয় অমৃতস্রাবী শ্রীশ্রীনাম কীর্ত্তন ধ্বনি প্রবেশ করে না; তবু এখনও প্রাণে প্রবল আশা শ্রীশ্রীনাম রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছ, তুমিই শ্রীনামের প্রকট মূর্ত্তি। কোন কোন মহাভাগ্যবানের দৃষ্টি গোচর হও। তাই একমাত্র তোমার শ্রীশ্রীচরণ যুগল ভরসা করিয়াই রহিলাম। তোমার শ্রীত্যর্থে কোন প্রকার ভজন সাধন করিতে পারিব বলিয়া আশা একেবারেই নাই। কারণ দেহ ও মন কোনটীই ভজন যোগ্য নয়। উচ্ছিষ্ট ফল শ্রীভোগে লাগে না। এই শরীরটী কু-অভ্যাসের দাস। মনটী কুচিন্তার আকর। সুতরাং উভয়েই নরকের উপকরণ মাত্র।

প্রভো! এতদিন অন্যের সুরে, অন্যের তালে, অন্যের শিখান কথায় পাখীর বুলির মতন অনেক বলিতে শিখিয়াছি। কিন্তু প্রাণের বস্তু তুমি কোথায়, আর আমি কোথায়? এখন প্রাণের কথায় যাহা বলি তুমি আপনার জ্ঞানে তাহা গ্রহণ করিও। আমার ভজন, সাধন, ব্রত, পূজা, সবই তোমার শ্রীশ্রীযুগল চরণে প্রাণের বার্ত্তা বিজ্ঞাপন। যদিও সর্ব্বান্তর্যামী রূপে তুমি আমার সকলই জান, তথাপি বলিয়া সুখ পাই তাই বলি। আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস তুমি জানিতেছ, নতুবা সুখ পাইতাম না। যেহেতু দুঃখ লাঘব জন্য এই জগতে অনেকের কাছে প্রাণের কথা বলিতে চাহিয়া দুঃখ দ্বিগুনতর জাগিয়া উঠে। কারণ অনুভবের অভাবহেতু মন দিয়া শোনে না, শুনিলেও বুঝে না।

প্রভো! স্বকর্ম্ম ভোগের নিমিত্ত ভবসিন্ধুর অতল তলে পড়িয়া থাকি, তবু দুঃখ নাই যেহেতু তুমি পারের কাণ্ডারী। কিন্তু যে কয়দিন হয় দীন হীন বালকের প্রাণের কথা কয়টী শুনিও ইহাই জন্মে জন্মে একমাত্র প্রার্থনা।

শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী (ভক্তিরত্ন)।

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রসঙ্গ (১০)

তারপরে দাদাকে পাওয়া রূপ আনন্দ একা ভোগ করে যেন তৃপ্ত হচ্ছিলাম না, তাই যারা যারা প্রাণের বন্ধু ছিল, তাদের সব বাড়ীতে গিয়ে দাদার আগমন সংবাদ দিয়ে এলুম। আমার মুখে অনেকে দাদার নাম শুনে ছিলো কিন্তু দেখে নাই ; আজ তাদের সকলকেই জানিয়ে দিয়ে এলুম। এর ভিতরে লুকানো দুষ্টামী ভাবও বেশ ছিলো—অর্থাৎ যে সব শিক্ষিত বন্ধুদের সঙ্গে তর্কে পারতুম না—হেরে যেতুম, আজ তাদেরই বেশি করে আসতে বল্লুম, ভাবটা—"এসো, এসে দেখ, কি রত্ন! তারপরে কত তর্ক করতে পারো তা দেখাযাবে।" আমার মনের ভাব তখন এইরূপ।

দাদা অনেকক্ষণ বৃক্ষতলে বসে থেকে শেষে রাজা রামচাঁদের ঘাটে স্নান করে আমাদের বাড়ীতে এলেন। আমি তাঁকেউপরের ঘরে নিয়ে গেলুম। পায়ে খানিকটা কাদা ছিল—ধুইয়ে দিতে গেলাম। দাদা পা সরিয়ে নিয়ে বল্লে —"নারে ধুয়ে কাজ নেই আহা মৃত্তিকা খানিকক্ষণ শরীরের সঙ্গে থাক সব পবিত্র হবে।" কাজেই কাদা পা সমেত দাদা বসলেন। সন্ধ্যা আহ্নিক বা তপ জপ কিছুই করলেন না, কেবল সমাগত যুবকগণের সঙ্গে নানাবিধ কথা ও আলাপ পরিচয় করতে লাগলেন। কিন্তু দাদার এমনই স্বভাব যার সঙ্গে ২।৪টী কথা হয়, সে-ই একেবারে মোহিত হয়ে যায়। কালাপাহাড়ের মত যে সব লোক তাদেরও দাদা দু' এক কথায় এমন করলেন যে, দেখে আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠলুম। উপরের বারান্দায় বিস্তর লোক সমাগম হলো। আজ যেন আমার গৃহে আনন্দের ছড়াছড়ি।

খানিক বাদে মাতাঠাকুরাণী উপরেতে আসন পেতে গঙ্গাজল ছড়িয়ে দাদার জন্য নানাবিধ ব্যঞ্জন সাজিয়ে অন্ন এনে বল্লেন—"খাও বাবা।"

দাদা মাকে দণ্ডবৎ করে আসনখানি সরিয়ে দিয়ে ভূমিতে বসলেন এবং অন্নকে দণ্ডবৎ করে সেবা করতে লাগলেন, আমরা চারিদিকে বসে কথা কইতে লাগলুম। দাদা প্রত্যেক ব্যঞ্জন মুখে দেন আর বলেন"আহা কি সুন্দর খেতেরে! বা বেশ রান্না হয়েছে।" শেষে বল্লেন ;—"এমন সব তরকারি ছেড়ে মাছ খেতে ইচ্ছে হয়েছিলো, ছিঃ ছিঃ না আর মাছ খাবো না।" আমরা হাসতে লাগলুম। দাদা তরকারী গুলি বেশ করে আস্বাদ করতে লাগলেন, তার পরে ভোজনান্তে

খানিকক্ষণ বিশ্রাম কল্লেন। পরে আমাদের বাড়ী হতে সামান্য দূরে ভুপেন (১) নামক আমাদের এক বন্ধুর নির্জ্জন বৈঠকখানা ঘরে দাদাকে নিয়ে গেলাম। এই স্থানেই আমরা সেই সময়ে সকল বন্ধু মিলিত হতাম ও সাহিত্য চর্চ্চা হতো। দাদাকে পেয়ে ভুপেন আদি সকল বন্ধুরা বড়ই খুসি হলো। কাজ কর্ম্ম ফেলে রেখে সকলে এসে দাদার সঙ্গে আলাপ করতে লাগলো। দাদা যে একজন বৈরাগী সাধু তা আমরা ভুলে গেছি। দাদা আমাদের এখন ঠিক যেন প্রাণের বন্ধু। কথাবার্ত্তাতে কিছুমাত্র ভয় বা সঙ্কোচ নেই। আনন্দে সকলেরই আত্মহারা হয়েছে।

তারপরে পরামর্শ হলো রাত্রেতে আজ এইখানে চড়ুইভাতি করা হবে। দাদার কি মত জিজ্ঞাসা করা হলো দাদাও ঠিক আমাদের মত হয়ে বল্লেন—"বেশ বেশ চড়ুই ভাতি ভাল ভাল।" তখন সকলে মিলে পরামর্শ হলো খিচুড়ি, আলুর দম চাটনি প্রভৃতি তৈয়ার করা হোক। আমরা সবই যুবকের দল; ধরতে বল্লে বেধে আনি। তাই অল্পক্ষণের মধ্যেই বাজার হাট প্রভৃতি সবই হয়ে গেলো। নিজেরাই কোমর বেধে রান্না চাপিয়ে দিলাম। বৈষ্ণব সেবা করাতে হলে কত শুদ্ধাচারে সব করতে হয় এখন সে সব দেখে শুনে কিছু কিছু জানলেও তখন কিছুই জানতাম না, আর দাদাকে ত আমাদের বৈষ্ণব বা সাধু বলে মনে হচ্ছিলো না, মনে হচ্ছিলো যেন আমাদের পরমাত্মীয় যেন প্রকৃতই আমাদের জ্যেষ্ঠ সহোদর। দাদা কখন বৈঠকখানাতে আবার কখন উঠানে উনুনের কাছে এসে রান্না দেখেন আর গল্প করেন। আমাদের ধর্ম্মকথা বা উপদেশাদি কিছুমাত্র শুনতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কেবল দাদার সঙ্গ পেলেই বা দাদাকে দেখলেই যেন আমাদের অন্তরাত্মার তৃপ্তি হবে মনে হচ্ছিলো।

সামান্য রাত্রে সবই তৈয়ার হয়ে গেলো। পাতাতে দ্রব্যাদি দেওয়া হলো, দাদা ও আমরা আট দশ জন বন্ধু মিলে কত হাস্য পরিহাস এবং কে কত খেতে পারে ইত্যাদিতে ভোজন চলতে লাগলো।

ভোগ দেওয়া কি তুলসী দেওয়া এসব কিছুই হলো না। আর এসব না করলে যে বৈষ্ণবেরা খান না তাও তখন জানতুম না। ভোজনের পরে কেউ আর সে রাত্রে দাদাকে ছেড়ে বাড়ী যেতে পারলেনা। সেই খানেতেই শয়নের

---

(১) পুরানাম ভুপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বর্ত্তমানে ২৪ পরগণা নারাণপুর গ্রামে থাকেন। বড়ই পবিত্র এবং চরিত্রবান যুবক আমাদের সতীর্থ।

ব্যবস্থা হলো, তখন দাদাকে ভাল করে কাছে নিয়ে গল্প হতে লাগলো। বেশী রাত্রি হচ্ছে দেখে দাদা বল্লে—"এইবার সব ঘুমো। আর এক কাজ কর মনে মনে ভাব, শ্রীরাম পণ্ডিতের বাড়ী মহাপ্রভু এখন ভোজন করে শুয়েছেন, ভক্তেরা তাঁর পদসেবা করচেন, তোরা যেন সেই দৃশ্য দেখছিস, এই ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়।" দাদার কথামত আমরা ঐ বিষয় ভাবতে লাগলুম কখন চিত্রটির চিন্তা যেন ঠিক হতে লাগলো, কখন আবার গোলমাল হয়ে গেলো। এইরূপে দাদার সঙ্গে মহানন্দে সে রাত্র কেটে গেল।

পরদিন প্রাতে পুলিনদাদা এসে হাজির। নবদ্বীপদাদাকে ছেড়ে দিয়া পুলিনদাদা স্থির থাকতে পারেন নি। আমাদেরতো মণিকাঞ্চন যোগ হলো,—বন্ধু'দর আমোদের পরিসীমা নেই। সেদিনও চড়ুইভাতি করে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হলো। গ্রামের চরিত্রহীন ২।১টী ছেলে দাদার আকর্ষণে এমন মোহিত হয়েছে যে, সঙ্গ ছাড়চে না। খারাপ ছেলেদের প্রতি দাদার যেন বেশী টান। তাদের সঙ্গে কত কথাই কন।

বাজারের নিকট মিত্রদের বাড়ীর একটা বয়াটে ছেলে নেসা করবার জন্যে একজনের বাড়ী থেকে কি চুরি করেছে, আমাদের রামবাবুর ভ্রাতা শিবু তাকে ধরে এনে রাস্তাতে মারচে আর পুলিসে দেবে বলে টানাটানি করচে। নবদ্বীপ দাদা গঙ্গার ধার দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে যাচ্ছিলেন, শিবু, দাদাকে দেখেই বল্লে—"দাদা তুমি এর বিচার কর, এ চুরি করেছে আজ একে পুলিসে দেবই।" দাদা সেই ছেলেটীর গায়ে হাত দিয়ে আদর করে বল্লেন—"দেখ্ এমন কাজ আর কখন করিস নি।" শিবুকে বল্লে "আজ ওকে ছেড়ে দে, ও এমন কাজ আর কখনই করবে না।" শিবু তাকে ছেড়ে দিয়ে বল্লে—"যা তোর বরাত ভাল নবদ্বীপ দাদা এসে পড়েছিলো নতুবা আজ তোকে পুলিসে দিতুমই।"

দু' একটী দুষ্ট ছেলে পরে আক্ষেপ করে বলতো ;—আজ যদি নবদ্বীপ দাদা থাকতেন তবে আমাদের ভাল করতে পারতেন।

যে সব ছেলে সাধু সন্ন্যাসী কি বাবাজীর উপর হাড়ে চটা, তারা বলতো "হ্যাঁ একজন সাধু দেখেছিনু বটে, সে তোমাদের নবদ্বীপ দাদা ; আর কাকেও ভাল লাগে না।"

বিকালে—দাদা, আশুকে (২) সঙ্গে করে বেড়াতে গেলেন। বেড়াতে বেড়াতে

(২) পুরা নাম আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাণিহাটী নিবাসী রায় সাহেব সর্বচাঁদ

দাদা পানিহাটীর উত্তরাংশে মুখোয্যে পাড়াতে এসে যদু গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের (৪) বাড়ীর বাহিরে দাঁড়িয়ে যদু বাবুর সঙ্গে কথা কইলেন ও তাঁর স্ত্রীকে দেখেই বল্লেন—"মা! বড় ক্ষিদে পেয়েছে কিছু খেতে দিতে পারবি?" এই বলে, ঠিক বালক যেমন মার কাছে আবদার, করে তেমনি ভাবে দাদা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেলেন। যদু বাবুর স্ত্রী, দাদার কথায় বাৎসল্য রসে আপ্লুত হয়ে তাড়াতাড়ি গৃহান্তর হইতে কতক গুলি লুচি সন্দেস প্রভৃতি (যা ছেলেরা নেমন্তন্ন বাড়ী হতে এনেছিলো) এনে দাদাকে খেতে দিলেন। যদু বাবু কাছে বসে কথাবার্ত্তা কইতে লাগলেন ও পরে একটী হরিতকি দিয়ে দাদাকে দণ্ডবৎ করলেন। যদু বাবু পরে আমাদের বলেছিলেন "হ্যাঁ ইনি একজন সাধু বটেন।"

ঐ স্থানে অনেকক্ষণ থেকে ও নানা কথাবার্ত্তা কয়ে দাদা শ্রীবাধব ভবনে গেলেন ও দর্শনাদি করে পুনরায় ভুপেনদের বাড়ীতে এসে বসলেন। শেষে পুলীন দাদাকে বল্লেন ;—"আজই নবদ্বীপ ধামে যাবো, তুই যাবি?"

পুলীন দা ;—হাঁ যাবো।

দাদা ;—তবে চ—এখুনিই চ।

বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় ভ্রাতা। বর্ত্তমানে ইনি সিমলা পাহাড়ে মিলিটারী ফাইনান্সে উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী। বড়ই ধীর এবং পবিত্র স্বভাব। আমাদের সতীর্থ।

(৪) যদু বাবু বড়ই নির্ব্বিবাদী ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি ধর্ম্ম কর্ম্ম কি করতেন তার আমরা খবর রাখতুম না কিন্তু তাঁর সদানন্দ ভাব ও সরল ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট হতো। এঁর সম্বন্ধে একটী মজার কথা ছিল—

পূর্ব্বে ইনি এলাহাবাদে থাকতেন ও অবধৌতিক চিকিৎসা করতেন। এলাহাবাদে সকলেই একে ধার্ম্মিক বলে সম্মান করতেন। একদিন এলাহাবাদ ষ্টেশনে স্বর্গগত জষ্টিস সারদাচরণ মিত্র মহাশয় গাড়ির অপেক্ষায় বসে আছেন এমন সময়ে যদুগোপাল বাবু আসছে একজন এঁর পরিচয় করে দিলেন, এজন্য মিত্র মহাশয় একে কাছে বসিয়ে বল্লেন—"আপনারা যোগ টোগ করেন, আমাকে কিছু আশ্চর্য্য দেখাতে পারেন?"

যদু বাবু ;—"খুব পারি, এবং এই মুহূর্ত্তেই পারি।"

মিত্র বাবু ; "তবে দেখান"

যদু বাবু : দেখুন তবে : যে জষ্টিস মিত্র, মানুষকে ফাঁসি দিতে পারে এবং রদ করতে পারে, এত বড় যার ক্ষমতা সেই মিত্র আজ একজন অতীব নগণ্য লোককে কাছে বসিয়ে তাকে ভাই বলে সম্মান করচে। দেখুন এর চেয়ে আর কি আশ্চর্য্য দেখতে চান। যদু বাবুর এই কথাতে তখন ষ্টেশন শুদ্ধ লোক আনন্দ ভরে হাস্ত করেছিলেন। অনেক দিন হলো ইনি দেহ রক্ষা করেছেন।

পুলীনদা—"তা বেশ।" এই বলেই পুলীনদাদা জামা জুতো সব খুলে ফেলে দিয়ে দাদার কাছে দাঁড়ালো দাদা করতাল বাজিয়ে গান ধরলে,

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥"

গাইতে গাইতে ভুপেনদের বাড়ী হ'তে বেড়িয়ে একেবারে রাস্তা ও পরে সোজা চলতে আরম্ভ করলেন, আর কোন কথাবার্ত্তা নেই।

আমরা তো অবাক। আমাদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়লো। কোথায় দাদাকে নিয়ে আমরা এমনি ভাবে থাকবো, তাই কাজ কর্ম্ম বাড়ির আত্মীয় স্বজনের বকুনি সব তুচ্ছ করে এসেছি, আর দাদা এত ভালবাসা দেখিয়ে এক মুহূর্ত্তে এমন নির্ম্মম হয়ে গেলেন আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন। হায় এত শীঘ্র আমাদের সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে, এইরূপ ভাবতে ভাবতে আমরাও সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলুম। দাদা উচ্চৈঃস্বরে নাম করচেন পুলীন দাদাও যোগ দিয়েছেন আমরা নীরবে নীরবে পিছু পিছু চলেছি। রাস্তার ধারের বাড়ী হতে সভ্য বাবুরা এই কাণ্ড জানালা দিয়ে দেখচেন এবং হাসচেন। এই ভাবে দাদা বড় রাস্তার নিকটে জমিদার মোহিতলাল চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীর কাছে এসে দাঁড়ালেন, এই বাড়ীর সম্মুখে একটী বৃহৎ তুলসী বেদী দেখে সেইখানে গিয়ে বসলেন। আমরাও ক্ষুণ্নমনে চারিধারে বসলুম। দাদাকে ছেড়ে দিতে আমাদের যে বড়ই কষ্ট হচ্চে অথচ বলতে পারচি না, দাদা আমাদের চোক মুখ দেখে যেন তা বুঝতে পারলেন তাই হেসে বল্লেন ;—"না পুলে, আজ আর যাবো না। চ এদের সঙ্গে ফিরে যাই।" এই বলে পুনরায় আমাদের নিয়ে ভুপেনদের বাড়ীতে এলেন। আমরা তখন হাঁপ ছেড়ে বাচলুম। আবার সকলে মিলে আনন্দ করতে লাগলুম।—কিন্তু থেকে থেকে মনে হতে লাগলো, সাধুর চরিত্র ফুলের মত নরম, এবং বজ্রের মত কঠিন। ২।১ দিন পরে দাদা কলিকাতায় চলে গেলেন।

অটল দাস বাবাজীর পানিহাটীতে আগমন।

(ঠিক মনে হচ্চে না—বোধ হয় নবদ্বীপ দাদাই অটল দাদাকে পানিহাটীতে রাঘব ভবনের সেবাদি যাতে ভাল ভাবে হয় তাহারই বন্দবস্ত করতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন)

অটলদাদা শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণ দাস দেবের বিশেষ অনুগত। এঁর জীবনীর অনেক কথা "চরিত সুধাতে" মুদ্রিত হয়েছে।

এর জীবনে একটী কার্য্য এমন অদ্ভুত যা কেউ কোথায় করেছে বলে শুনা যায় না। শুনেছিনু এই ভক্তবর যখন শ্রীবৃন্দাবনে দেহ রাখেন, তখন মৃত্যু যে কি রকম অবস্থা তা লোককে জানাবার জন্যে কাগজ পেনসিল নিয়ে লিখতে থাকেন। কি ব্যাপার! মৃত্যু শয্যায় শায়িত হয়ে মৃত্যুর বিষয় লিখচেন! কতক অক্ষরে লেখা, কতক চিত্র, এবং কতক রেখা ইত্যাদি লিখতে লিখতে মহা-প্রয়াণ ক'রেছিলেন। শুনেচি সে লেখাগুলি শ্রীবৃন্দাবনে একত্র আছে। তবে বোঝবার উপায় নেই।

অটল দাদার পানিহাটীতে আগমনের সন তারিখগুলি মনে হচ্ছে না। দণ্ড মহোৎসবের পরে ও রথ যাত্রার ২।১ দিন পূর্ব্বে তিনি এসেছিলেন। অটলদাদা ও পানিহাটীর অনেকগুলি বন্ধু মিলে মাহেসের রথযাত্রা দেখতে গিয়েছিনু ও তথায় সকলের একখানি গ্রুফ ফটো তুলিয়েছিনু।

বোধহয় নবদ্বীপ দাদার মুখেই রাঘব পণ্ডিতের শ্রীবিগ্রহের ও দণ্ড মহোৎসব ক্ষেত্রের বড়ই দুর্দ্দশা শুনে—যদি তার কিছু প্রতিকার কর্ত্তে পারেন, এই জন্যই অটলদাদা আসেন।

সেনেদের মহাপ্রভুর বাড়ীতে বসে "অমৃতবাজার পত্রিকায়" এবং বাংলা কাগজে এই স্থানের বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন। (ঐ লেখার খসড়াগুলি এখনও আমার কাছে আছে।) ইনি শিক্ষিত ছিলেন এজন্য লেখবার ক্ষমতা বেশ ছিলো।—"প্রেম-সহচর" নামে একখানি ধর্ম্মমূলক উপন্যাস লিখেছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের "দেবকীনন্দন প্রেস" হতে তা ছাপা হয়। উক্ত গ্রন্থে শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণ দাস দেবের কাহিনীই প্রকারান্তরে বর্ণিত আছে। পানি-হাটীরও কথা আছে। একদিন রাঘব ভবনে অটল দাদার নৃত্য দেখেছিনু—সে এমন ললিতকলা যে, ভাল ভাল বাইজীতেও তেমন পারে না। একদিন অটলদাদার সঙ্গে আমাদের এক বন্ধু ননী গোপালের (১) খুবই তর্ক হলো। ননী গোপাল কুট প্রশ্নে বা বাক্যের দ্বারা অটল দাদাকে নিরস্ত করলেও আমরা দেখলুম অটল দাদার অটল বিশ্বাসেরই জয় হলো। অটলদাদার সঙ্গে কয়দিন

(১) পুরানাম ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়, বি, এ, ইনি প্রথমে হাজারীবাগ ও পরে "বঙ্গবাসী" কলেজের প্রফেসার হন। এই মহাপ্রাণ যুবকের আগ্রহে, পানিহাটীর বর্ত্তমান যা কিছু উন্নতি সাধিত হয়েছে। এমন উচ্চ প্রাণ সচরাচর দেখা যায় না। অকালে ইহার দেহ ত্যাগ হওয়াতে গ্রামের যে কি ক্ষতি হয়েছে তা বলবার নয়। ইনিও আমাদের সতীর্থ ছিলেন।

আমাদের বেশ আনন্দেই কাটলো। এইরূপ নবদ্বীপ দাদার কৃপায় আমরা অনেক মহামহা সাধুকে দর্শন কর্ত্তে পেতাম। পুলীনদাদাও অনেককে সঙ্গে করে পানিহাটীতে আনতেন। সে সব কাহিনী পরে ব'লবো।

(পুলিন দাদার গৃহে রামদাস পণ্ডিত বাবাজীর
শ্রীচরিতামৃত পাঠ)

পানিহাটী হ'তে নবদ্বীপ দাদা পুলীনদাদাদের বাড়ীতে যাওয়ার পরে তথায় একদিন শ্রীচরিতামৃত পাঠের বিবরণ ষষ্ঠিবাবুর মুখে শুনেছিনু। (১) ষষ্ঠি বাবু বল্লেন—

শ্রীযুক্ত রামদাস পণ্ডিত বাবাজী মহাশয় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের একজন অসাধারণ ব্যখ্যাতা। এর অদ্ভুত ব্যাখ্যা শ্রবণ করে সকলেই মোহিত হ'তেন। বিশেষ নবদ্বীপ দাদাকে শ্রবণ করাবার জন্যই পুলীন বাবুর দাদা কুঞ্জ বাবু তাঁহার গৃহে এই পাঠের আয়োজন করেন। পণ্ডিত বাবাজী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থকে ঠিক বিগ্রহের ন্যায় পূজা ও ভোগরাগাদি দিতেন। রাধারমণ চরণ দাস দেব ইহার ব্যাখ্যাতে মোহিত হ'য়ে ইহাকে "রায় রামানন্দ" আখ্যা দিয়াছিলেন। আমাদের শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী দাদা মহাশয়ের সহিত ইহার "মিতা" পাতান হ'য়েছিল। যেদিন পাঠ হয় সেদিনের শ্রোতা ছিলেন ভক্তিতত্ত্বের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ, যথা ;—প্রভুপাদ শ্যামলাল গোস্বামী, প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, রোহিণীনন্দন বাবাজী, রায় শ্রীযুক্ত রসময় মিত্র বাহাদুর শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী প্রভৃতি, আর ছিলেন আমাদের প্রেমময় দাদা নবদ্বীপ চন্দ্র দাস।—

সেদিন পাঠের বিষয় ছিল—রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাধ্য সাধন তত্ত্ব নির্ণয়ের শেষ গীত—

"পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।"

---

(১) ১১।৩ হলধর ব্যানার্জ্জীর লেনে শ্রীযুক্ত ষষ্ঠিচরণ মল্লিক মহাশয় উক্ত সংবাদগুলি দিয়াছেন।

এই পদ। এই একটী মাত্র গীতের ব্যাখ্যা এক রবিবারে হয় নাই। ২।৩ দিন লাগিয়াছিল। ব্যাখ্যা শুনে পণ্ডিত মণ্ডলী ধন্য ধন্য করেছিলেন। রোহিনী নন্দন বাবাজী মহাশয়, যিনি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ব্যাখ্যা করে বৃদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বল্লেন—বাবা। তোমার কাছে আমার শেখবার এখনও ঢের আছে।" নবদ্বীপ দাদা আনন্দে নৃত্য করেছিলেন।

রামদাস পণ্ডিত বাবাজী মহাশয়ের বয়ক্রম খুবই কম ছিল। বেশ সুন্দর চেহারা। ইনি অনেক দিন হলো দেহরক্ষা করেচেন। এর পুত্র নবদ্বীপে থাকেন এবং পিতৃধনের কিঞ্চিৎ অধিকারীও হয়েছেন।

ষষ্ঠিদাদা বল্লেন;—নবদ্বীপ দাদা আমাদের নিয়ে (পুলীনদাদার বাড়ীতে) নিত্য সন্ধ্যা হতে রাত্র ১২ টা ১টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করতেন। আবার প্রভাতেও কীর্ত্তন হতো। আমাদের যে তিনি কি উপকার করে গেছেন তা বল্‌বার নয়।

একদিন কলুটোলা "শীল ফ্রী কলেজের" মোড়ে আমি ও নবদ্বীপ দাদা বেড়াচ্ছি এমন সময় একজন তপ্ত কাঞ্চনের মত লাবণ্য যুক্ত সন্ন্যাসী (তাঁর এক কর্ণে কুণ্ডল ছিলো) রাস্তাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, দাদা তাঁকে দেখেই আনন্দাবেগে কাঁপতে লাগলেন এবং তাঁকে প্রদক্ষিণ করলেন। সন্ন্যাসী আনমনে চলে গেলেন। পরে আমি দাদাকে জিজ্ঞাসা করলুম--"দাদা ইনি কে?

দাদা। "চিন্‌তে পারলি না, ইনি যে নিতানন্দ শক্তি।" এইরূপ কত ঘটনা দাদার কাছে থাকলেই দেখতে পেতুম। এখন সব মনেও নেই।

ক্রমশঃ

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট

শ্রীমদ্ভাগবত-তত্ত্ব দর্পণঃ।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার গুপ্ত কবিভূষণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত শ্রীমদ্ভাগবত-তত্ত্ব দর্পণ নামক গ্রন্থখানি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই উদ্ভট মতবাদের যুগে এইরূপ নিরপেক্ষ শাস্ত্র-ধর্ম্ম জ্ঞাপক চুম্বক গ্রন্থের বহুল প্রচার একান্ত প্রয়োজন, কারণ এই অন্ন-চিন্তা চমৎকার কালে বিরাট শাস্ত্র-বারিধি আলোড়ন করিয়া রত্ন অন্বেষণ করা অসম্ভব। ত্রিকালদর্শী মহাত্মাগণের তত্ত্ব-দর্শন রত্ন-রাজি চুম্বকে যদি নয়ন সমক্ষে প্রদর্শন করা যায় তাহা

হইলে ভগবৎ-তত্ত্ব-নির্ণয় অনেকটা সুগম হয়। তাহা না হইলে পরের মুখে ঝাল খাইয়া অর্থাৎ সরল প্রাণে গরল খাইয়া 'ইতোনষ্ট, ততোভ্রষ্ট' হওয়া বিচিত্র নহে। বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট শ্রীল গোস্বামীপাদগণের ভক্তি সিদ্ধান্ত লোপ করিবার জন্য কতকগুলি কলির অনুচর সাধু ভক্তের বেশ ধারণ করিয়া ধর্ম্মোপদেষ্টা রূপে আবির্ভূত হইয়া তাহারাই একমাত্র অভ্রান্ত বলিয়া প্রচার করিয়া যথার্থ সদাচার-নিষ্ঠ ভক্তি-সাধক লোকহিতৈষী মহাত্মাগণকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া স্বীয় কপোল-কল্পিত উদ্ভট মত প্রকাশ করিতেছে। এসব দৈত্যের দলন প্রভু স্বয়ং করিবেন। তবে প্রকট রূপে যাহা নিজ হস্তে করেন অপ্রকটে তাহা শাস্ত্ররূপে করিয়া থাকেন। তাঁহার নিজ-জনগণ সেই সকল ভগবৎ শাস্ত্র প্রকাশ করতঃ দৈত্য-দলনের সহায় হন। যাঁহারা সৎগুরু কৃপায় যুগ-ধর্ম্ম আশ্রয় করতঃ একনিষ্ঠ সাধনে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহাদের অবশ্য উক্ত দৈত্যগণ হইতে কোনও ভয় নাই কিন্তু যাঁহারা দুর্ভাগ্য বশতঃ সৎ-গুরু আশ্রয় প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদিগেরই কাঁচা মস্তিষ্ক এই সকল দৈত্যের ভক্ষ, সেইজন্য আমরা সেই সমস্ত সরল মতি ব্যক্তিগণকে এবম্প্রকার গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি। আলোচ্য সংগ্রহ গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে কবিভূষণ মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়াছেন আমাদের বোধ হয় ইহা আরও বিশদ করা প্রয়োজন। তাহা না হইলে সাধারণ পাঠকগণ ইহার মর্ম্ম সহজে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে কবিভূষণ মহাশয় এ বিষয়ে একটু অবহিত হইবেন। আর একটি কথা কবিভূষণ মহাশয়কে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। সেটি অতিস্তুতি, গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণে যাঁহার নিকট পার্থিব সাহায্য প্রাপ্তি হইয়াছেন তাঁহার অত স্তুতি শোভা পায় না। কবির লড়ায়ে বলে না "কবি গাইবি পয়সা নিবি খোসামুদি কি কারণ" কবিভূষণ মহাশয় নিজগুণে অবশ্য আমাদের এ ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। অশেষ শিল্প-নৈপুণ্য প্রভাবে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত রূপী মহারত্নাকরে ডুব দিয়া নানা তত্ত্বরূপী রত্নরাজী সংগ্রহ করিয়া যে মালা গ্রন্থন করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই ভক্তজন সুখাবহ হইয়াছে কিন্তু ইহার সুমেরু কোথায়? কবিভূষণ মহাশয় কলিযুগাবতার লক্ষণরূপ সুমেরু সংযোগ করিয়া মালাটী সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন করুন ও গৌর-ভক্তবৃন্দের অশেষ আশীর্ব্বাদ ভাজন হউন ইহাই সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিতেছি।

ভক্তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

(২১শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩০ সাল)

প্রার্থনা

"তোমারি লীলা তোমারি খেলা দেখিবারে প্রেম-নয়ন চাই।
(আমায়) দাও সে নয়ন হে দীনশরণ দরশন যেন সদাই পাই॥"

দয়াময়! আজ আর প্রার্থনা করিব না। একুশ বৎসর ধরিয়া কেবলই এটা দাও ওটা দাও বলিয়া চাহিয়া চাহিয়া তোমাকে ব্যস্ত করিয়াছি, আজ আর কিছু চাহিব না, কেবল জিজ্ঞাসা করিব যে, এই যে ভিক্ষা করিয়া পাঁচ ফুলে মালা গাঁথিয়া মাসে মাসে তোমার উদ্দেশে দিয়া আসিতেছি এটি তোমার সেবার উপযুক্ত কি না? জানি তুমি কিছুর প্রত্যাশী নও, কেউ কিছু দিউক বা না দিউক তাতেও তোমার কিছু আসে যায় না। কিন্তু আমাদের তো একটা কর্ত্তব্য আছে। তারপর আমি কাঙ্গাল আর আমার দিবারও অন্য কিছু নাই; কেবল প্রাণের আবেগে যখন যা মনে আসে যথাযথ গাঁথিতে না পারিলেও যেমন তেমন করিয়া গাঁথিয়া তোমার পদপ্রান্তে দিয়া খালাস হই। তুমি নিজমুখে বলিয়াছ "পত্র, পুষ্প, ফল, জল, যাহা কিছু "ভক্তি" করিয়া আমাকে দিলেই আমি তাহা গ্রহণ করি" প্রথমে কথাটা শুনিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইয়াছিল, কেমনা কাঙ্গালের আর কিছু না থাকিলেও পত্র, পুষ্প, ফল, জল, এর একটা কিছু সংগ্রহ করিতে কষ্ট হইবে না, কিন্তু শেষ কথাটা ঐ "ভক্তি"র নাম শুনিয়াই আমি চারিদিক অন্ধকার

দেখিতেছি। আমি যে ভক্তিহীন, ভক্তিধনে একেবারেই কাঙ্গাল; ভক্তিধনে যে ধনী হব সে আশাও তো নাই, সর্ব্বদাই বাহিরের হৈ-চৈ লইয়া ব্যস্ত। তবে কি কাঙ্গালের এ উপহার তোমার নিকট অগ্রাহ্য হইবে? কবি বড় গলায় বলিয়া গিয়াছেন—

"আমি নাই বা হে ভালবাসিতে জানিনু
তুমিত জান হে ভালবাসা।
আমি নাই বা জানিনু সাধনা কেমন
তুমি ত জান হে সেধে আসা॥"

আমার বেলাই কি এ কল্পনা সঙ্কুচিত হইবে? যাক্ আর তোমাকে ব্যস্ত করিব না, তুমি কাঙ্গালের গতি, কাঙ্গালই তোমার একমাত্র দয়ার পাত্র। আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়া যাই, তারপর তোমার যাতে ভাল হয় তাই তুমি করিও। বৎসরের শেষে এই কথা কয়টী বলিয়াই তোমার নিকট এ বৎসরের মত বিদায় লইলাম।

শেষে একটা নিবেদন—যেমন ভাবে প্রাণে প্রাণে শক্তি দিয়া এতদিন "ভক্তি"কে তোমার কথা বলিবার অধিকারী করিয়া রাখিয়াছ, আগামী বৎসরের জন্যও তেমনি শক্তি প্রেরণ করিয়া তোমার লীলা, তোমার মহিমা প্রভৃতি বর্ণনের এবং বহনের শক্তি দাও, আমি একপাশে বসিয়া তোমার লীলা খেলা দেখি আর প্রাণ ভরিয়া বলি "জয় অনন্ত-লীলা-বিলাসী শ্রীগৌর-গোবিন্দ সুন্দরের জয়।"

সম্পাদক

বিশ্বরূপের সঙ্গীত (১০)

১৭।—বল হরি হরি — হরি পরিহরি
ক'দিনের তরে এসেছ এই ভবে।
(দিনে) দিনে দিন গত — (ক্রমে) শমন আগত
না জানি কখন কি হয় কবে॥

ভেবে দেখ মন এই তো সংসার
তুমি যাহা ধন কত কি তোমার
ভাই বন্ধু পুত্র কন্যা পরিবার
(এদের) তুমিই অধীশ্বর এবে ;—
আজিকার তুমি রাজা মহাবল
যা'কিছু করিছ সম্ভব সকল
সে দিনের কিছু আছে কি সম্বল
যে দিন এ দেহ বিকল হবে ॥
মরুভূমি মাঝে মরীচিকা যথা
(জীবের) তৃষ্ণা নিবারণে অক্ষম সর্ব্বথা
ভ্রান্ত পথিকের নাহি বুঝে ব্যাথা
বৃথা দুঃখ দেয় জীবে ;—
তেমনি এ ভবে মায়ার ছলনা
আগে ভোগ পরে ত্রিতাপ যাতনা
(হরে) কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল যাবে দুর্ব্বাসনা
নহে বিড়ম্বনা সারমাত্র হবে ॥
নাশিতে দুষ্কৃতি স্থাপিতে স্বধর্ম্ম
যুগে যুগে হরি হন অবতীর্ণ
শুক্ল রক্ত কৃষ্ণ পরে পীতবর্ণ
চারি যুগে চারি ভাবে ;—
ধন্য কলি যুগ সর্ব্ব যুগ সার
নিতাই গৌরাঙ্গ যে যুগে অবতার
ভণে বিশ্বরূপ কি ভাবনা আর
অনায়াসে পার হব ভবার্ণবে ॥

——:০:——

১৮।—হরিনাম সম্বল তরিতে কেবল
অকূল এ ভব জলধি জলে।
লও হরি নাম মুখে অবিরাম
অন্তে নিত্যধাম লভিবি হেলে ॥

কলিযুগে করি হরি নাম সঙ্কীর্ত্তন
কৃষ্ণ আরাধিবে সুমেধা সুজন
হরিনাম যজ্ঞ সার করি বিজ্ঞাপন
নাম রসে মত্ত হবে কুতূহলে ॥
সৎ চিৎ আনন্দ নামের স্বরূপ
নাম নামী হৈতে নহে ভিন্নরূপ
যেই নাম সেই কৃষ্ণ রসভূপ
দুই তত্ত্ব একমূলে ,—
প্রকট লীলায় কৃষ্ণ করেন বিহার
অপ্রকটে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার
(নামে) হরে পাপ তাপ তমো অন্ধকার
হেলায় কি শ্রদ্ধায় নাম উচ্চারিলে ॥
নাম কল্পতরু শুধু নামাভাসে
মুক্তি লভ্য হয় বিনা সাধন ক্লেশে
নামে অষ্টসিদ্ধি আদি নবনিধি
অসাধনে তারা মিলে ;—
কিন্তু যার হয় নামে সুদৃঢ় বিশ্বাস
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা তার সব হয় নাশ
দূরে যায় তার অন্য অভিলাষ
(সে) কাম্য কর্ম্মকাণ্ড সব যায় ভুলে ॥
নাম ধর্ম্ম ভাই অতি চমৎকার
নাম নিলে হয় প্রেমের সঞ্চার
অশ্রু কম্প আদি পুলক হুঙ্কার
সাত্ত্বিক ভাব সব উথলে ;—
লজ্জা ধৈর্য্য লোক বাহ্য নাহি রয়
হাস্য নৃত্য করে পাগলেরি প্রায়
দাস বিশ্বরূপে কয় হেন যার হয়
ধন্য সেইজন এ মহীমণ্ডলে ॥

সম্পাদক

হিন্দু-বিধবা

কে মা তুমি? শুভ্রবরণা যূথিকার ন্যায় পবিত্র হিন্দুর ঘর আলো করিয়া রহিয়াছ? নিরলঙ্কারা হইয়াও সৌন্দর্য্যের প্রতিমাস্বরূপে বিরাজ করিতেছ? কে মা তুমি? কবরী বিহীনা জটাধারিণী, সীমন্তের সিন্দুর শূন্যা? মাগো তোমায় ত চিনিতে পারিতেছি না—তুমি কে?

কে মা তুমি? সুখ-সাধ-বঞ্চিতা, ভোগবাসনা বিরহিতা, ধ্যানরতা যোগিনী? কে মা তুমি? সুখ দুঃখের অতীতা, আনন্দময়ী, প্রেমময়ী, অমৃতময়ী পুণ্যচ্ছবি? মাগো। তোমায় ত চিনিতে পারিতেছি না—তুমি কে?

কে মা তুমি? স্বতঃতৃপ্ত বাসনা লইয়া, জগৎ সংসার ভুলিয়া মানবের কল্যাণ হেতু কঠোর তপশ্চর্য্যায় নিরতা মনশ্চক্ষুর সম্মুখে অমরত্বের আভা দেদীপ্যমান করিতে, ত্যাগের আসনে আরূঢ়া, সংসার শক্তিকে বিকসিত করিবার জন্য ব্রহ্মচারিণী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা। মাগো! তোমায় ত চিনিতে পারিতেছি না—তুমি কে?

কে মা তুমি? পরকে আপনার করিতে, পরের ছেলে মেয়েকে মানুষ করিতে, পতিতকে ভগবদ্ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিতে, কামনা শূন্য হৃদয়ে পরের সেবায়, পরের কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিতে শিক্ষা দিতেছ? মাগো তোমাকে ত চিনিতে পারিতেছি না—তুমি কে?

কে মা তুমি? তাম্বুলরাগ অরঞ্জিতা, হবিষ্যান্নভোজী, শত গ্রন্থিযুক্ত ছিন্ন বসন পরিধানা, কে মা তুমি? বৈশাখে জলকুম্ভ, জলসত্র, দেবতার উপর জলধারা, পাদুকা, ব্যজন, ছত্র, চন্দন দায়িনী; কার্ত্তিকে দেবমন্দিরে ঘৃতদীপদাত্রী: মৌন ব্রতাবলম্বিনী হইয়া নানা দানধ্যানে নিরতা। কে মা তুমি? মাঘে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী দীন দরিদ্র, অতিথি অভ্যাগতকে অন্নদান, শীতনিবারণ কল্পে ধুনী, মঞ্জিষ্ঠারাগ রঞ্জিত বসন, নির্ব্বাত নিলয় ও দেবালয়ে কৃষ্ণাগুরুদানে ভগবানের প্রীত্যর্থে পূজা করিতেছ? মাগো! তোমায় ত চিনিতে পারিতেছি না—তুমি কে?

কে মা তুমি? একাহারিণী, ভুমিশয্যাশায়িনী, অভ্যঞ্জন পরিত্যক্তা, প্রাণ কণ্ঠগত হইলেও বৃষে আরোহণ করিতেছ না? কে মা তুমি? কুশতিলোদক

দ্বারা তর্পণ করিতেছ, বিষ্ণুকে নিরত ধ্যান করিতেছ, অনন্তপ্রেম মহামন্ত্রের উপাসনা করিতেছ ? মাগো ! তোমায় ত চিনিতে পারিতেছি না—তুমি কে ?

কে মা তুমি ! পরের জন্ত দিবানিশি অশ্রুধারা ফেলিতেছ, সংসারের শত তাড়না, লাঞ্ছনা সহিয়াও সহাস্ত-বদনে পরকে বুক দিয়া ভালবাসিতেছ ? যে কার্য্য অপরের অসাধ্য তাহা তুমি স্বতঃপ্রভাবে নিষ্পন্ন করিতেছ, অফলাকাঙ্ক্ষিনী রূপে নিরন্তর খাটিতেছ ? তুমি কে ? তোমাকে ত চিনিতে পারিতেছি না ।

কে মা তুমি ? সমাজ শিক্ষয়িত্রী জননীরূপে, সংসারোজ্জলা কমলারূপে, জ্ঞানময়ী সারদারূপে, অন্নদায়িনী অন্নপূর্ণারূপে, সন্তান-পালিনী জগদ্ধাত্রীরূপে জীবের অনন্ত দুঃখ দূর করিতেছ । মাগো ! তুমি কি সেই হিন্দুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী, নিষ্কাম পথানুসারিণী সাক্ষাৎ সতী-মূর্ত্তি ? তুমিই কি সেই কঠোর ব্রত-চারিণী হিন্দু বিধবা ? তুমিই কি সেই বৈধব্য উপাসনার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ শান্তিরূপ সিদ্ধিময়ী অনন্ত দেবত্বের—একমাত্র নিত্যসত্যের অধিকারিণী হিন্দু বিধবা ?

তাই বুঝি মঙ্গলময়ী, তোমার প্রাণে স্ফূর্ত্তি নাই, শরীরে বল নাই, রিপুর তাড়না নাই, ভোগবিলাসের বাসনা নাই, হিংসার প্রবৃত্তি নাই, চাতুরীর ফাঁদ নাই, ক্রোধের লেশ নাই । তুমি সর্ব্বস্ব ত্যাজিয়াও সর্ব্বময়ীকেন্দ্রীরূপে বিরাজ করিতেছ । মাগো ! তুমি স্বামীর সহিত বিচ্ছিন্না হইয়াও সংযুক্তা, সাক্ষাৎলাভে বঞ্চিতা হইয়াও তদ্‌গতচিত্তা ; তুমি সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাসিনী । তোমার ত্যাগের মহিমায়, প্রেমের গরিমায় জগৎ স্তম্ভিত । তুমি মহাশক্তির অংশ হইতে উদ্ভূত, আব্রহ্মতৃণস্তম্ভ পর্য্যন্ত তোমার বিকাশ, বিশ্বব্যাপিয়া তোমার মূর্ত্তি । তোমাতে বাল্যের বিনোদ, কৈশোরের শিক্ষাদীক্ষা, যৌবনের কর্ম্মক্ষেত্র বার্দ্ধক্যের বারাণসী । তুমি সেই সদানন্দময়ীর স্নিগ্ধছবি, স্নেহমমতা, প্রীতি ভক্তির অভিব্যক্তি, তুমি সেই তেজোময়ী সাবিত্রীর প্রীতি প্রতিমা, সাক্ষাৎ সতীমূর্ত্তি ।

মাগো ! তোমার আসন যে অতি উচ্চে, মহাপুণ্য পবিত্রময় স্থানে, আধ্যাত্মিক জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি ; আর সেই আসন, সেই অধ্যাত্মময় জগৎ সাধনার পাঠ তোমার গৃহাশ্রমে, আর সেই গৃহাশ্রমের তুমিই একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবী । তোমাকে আমরা ভক্তিভরে প্রণাম করি ।

শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর রায় চৌধুরী ।

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাসপ্রসঙ্গ (১১)

(নবদ্বীপ দাদার শ্রীবৃন্দাবন গমন।)

নবদ্বীপ দাদার সঙ্গে বাবাজী মহাশয়ের যে সব অন্তরঙ্গ ব্যাপার হ'তো পূর্ব্বেই ব'লেছি আমরা আদার ব্যাপারী হ'য়ে সে জাহাজের খবরের কোনই ধার ধারতুম না।—তাই কি জানি কেন দু'জনে কি কথাবার্ত্তার পরে নবদ্বীপ দাদা শ্রীবৃন্দাবনে চলে গেলেন। কিন্তু দাদা শ্রীবৃন্দাবনে গেলেও বাবাজী মহাশয়ের যে কত নিকটে থাকতেন তার একটী বিবরণ বলছি। একদিন শ্রীবৃন্দাবনে নবদ্বীপ দাদাকে একজন জিজ্ঞাসা করেন—"বাবাজী মহাশয় এখন কি করছেন বলতে পারেন?" নবদ্বীপ দাদা উত্তরে বল্লেন;—"বাবাজী মহাশয় এখন কাঁটাল খাচ্ছেন।" পরে সময় ও তারিখযুক্ত পত্রের দ্বারা বৃন্দাবনের সেই লোক জেনে ছিলেন যে, সত্যসত্যই সেই দিন ও সেই সময়ে বাবাজী মহাশয় কাঁটাল প্রসাদ ভক্ষণ করছিলেন। দাদা কলিকাতা হ'তে হুগলী বাবুগঞ্জে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দে মহাশয়ের গৃহে গমন ক'রে তথা হ'তে বৃন্দাবনে যান। গোপাল বাবুর বাড়ীতে দাদার স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ এক জোড়া করতাল, ও ক্যাম্বিসের জুতা এবং একখানি উত্তরীয় এখনও আছে। গোপালবাবুর ভক্তিমতী ভ্রাতৃবধূ কৃপা করিয়া এ অধমকে দাদার পাদুকা প্রদান ক'রে কৃতার্থ করেছেন।—গোপাল বাবুর এই ভ্রাতৃবধুর ভক্তির কথা অন্য স্থানে ব'লবো। নবদ্বীপ দাদা এঁকে "মা" বলে ডাকতেন। বৃন্দাবন হ'তে এঁর সঙ্গে কথা কইতেন। সে সব নিগূঢ় কাহিনী পরে লিখবার ইচ্ছে রইলো।

দাদার শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান কাহিনী এখনও সংগ্রহ করতে পারিনি। যষ্টিবাবু ব'লেছিলেন—দাদা বৃন্দাবনে গিয়ে—এমন সব গোপন লীলাস্থলীতে ভ্রমন করতেন যা কেউ জানে না। আর সেই সব স্থান হতে 'রজ' এনে এনে একটী ভাঁড়ে সঞ্চিত করতেন। সঙ্গীদের বলতেন—'দেখ! আমার দেহরক্ষার পরে যারা আমার নাম ক'রে এখানে আসবে, তাদের এই রজ দিবি; এসব রজ বড়ই দুর্লভ। শ্রীবৃন্দাবনের ভ্রমর ঘাটের মঠ বাড়ীতে এখনও সেই ভাঁড় ও রজ আছে ব'লে শোনা যায়।

শ্রীবৃন্দাবন গমনের ২।৩ মাস পরেই দাদা নিত্য-লীলায় প্রবেশ করেন।—

ঐ সময়ে পূর্ব্বোক্ত নবগোপাল দে (দাদা ইহাঁকে কাকা বলতেন।) মহাশয়ের সহিত দাদার বহু পত্র ব্যবহার হইত, তাঁহার পুরাতন ফাইল হইতে কয়েকখানি পত্র বাহির করিয়াছি। একখানি দাদার স্বহস্তের লেখা পত্রও আছে ;—

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দো জয়তি—

কাকা!

আপনার পত্র পাইয়াছি। কণির যথা ইচ্ছা মন্ত্র লইতে পারে। আমি শয্যাগত। ইতি

বৈষ্ণব দাসানুদাস—

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস।

২য় পত্র।

(এই পত্র অপরের হাতের লেখা)

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

দেবকীনন্দন প্রেস

শ্রীবৃন্দাবন ২১।৪।০২

নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

শ্রীচরণ কমলেষু!

আমার জ্বর ক্রমাগত চলিতেছে। উঠিবার বসিবার শক্তি নাই। কি হইবে রাধারাণী জানেন। এখন আপনারা বৃথা চিন্তা ত্যাগ করিয়া নিতাই গৌরাঙ্গকে চিন্তা করুন, যাহাতে ইহকালের ও পরকালের মঙ্গল হইবে। দেহ ধারণ করিলেই পতন আছে তাহার জন্য চিন্তার দরকার কি? মরিতে হইবে, এই কথা স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা ভগবানকে ডাকিতে থাকুন শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—

সেবক—

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস।

ইহার পরে শ্রীবৃন্দাবন হইতে ১৯০২ সালের ৭ জুলাই লিখিত যে পত্র আসে তাহাতে সেই নিদারুণ কথা আছে—"২১ আষাঢ় শনিবার অপরাহ্ন ৪॥০ সময় শ্রীশ্রীনবদ্বীপ দাদার তিরোভাব হইয়াছে।"

গোপাল বাবুর প্রদত্ত বিবরণ। (১)

আমি আমার (সেই সময়ের) ২নং কলেজ ষ্ট্রীট দোকানে বসে আছি, এমন সময়ে একজন মলিন বেশধারী বৈরাগীর মত লোক এসে আমার শ্রীগুরুদেবের নাম ক'রে (প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল গোস্বামী শ্রীঅদ্বৈত পরিবার) জিজ্ঞাসা করলেন, "তিনি এখন কোথায়?" ইতিপূর্ব্বে আমার শ্রীগুরুদেব আমাকে বলেছিলেন,—"একজন ভক্ত এসে আমাকে খুঁজলে তুমি আমার কাছে তাঁকে নিয়ে যাবে।" আমি গুরুদেবের বর্ণিত এই লোকই মনে ক'রে তাঁকে আমাদের বাসা বাড়ী ৮।১ সেণ্ট জেমস্ লেনে নিয়ে গেলাম। গুরুদেব ঐ খানেই ছিলেন, উক্ত লোককে দেখ্বা মাত্র তিনি তাড়াতাড়ি দণ্ডবৎ করলেন। লোকটী আমার বিছনাতেই শুয়ে পড়লেন। তখন দেখি আমার শ্রীগুরুদেব উঁহার পদ সেবা করতে লাগলেন। আমি তো ভারি আশ্চর্য্য হলাম। এই সামান্য লোকটী এমন কি যাতে শ্রীঅদ্বৈত পরিবারভুক্ত আমার শ্রীগুরুদেব উঁহাকে এত সম্মান করচেন। তারপরে লোকটীর ধার্ম্মিকের কোনই চিহ্ন নাই, বেশ অতীব সাধারণ, গলাতে মালা কি তিলক কি শিখা কি সূত্র কিছুই নাই। (পায়েতে সেই সময় একটী ভেলভেটের জুতা দেখেছিনু।) এইরূপ ভাবচি অথচ শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে যে দু'একটী কথা হচ্ছে তা শুনে মন বেশ প্রফুল্লিত হচ্ছে। আমার ঘরে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সংকীর্ত্তনের একখানি চিত্র ছিল, হটাৎ সেইখানির দিকে দৃষ্টি করে লোকটী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন—"হায় হায় এমন দয়ার ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দকেও কেউ ভজে না।" তারপরে বিছনা হ'তে উঠে আমাদের প্রত্যেককে আলিঙ্গন করতে লাগলেন, সে আলিঙ্গন এমনিই যে আমাদের প্রাণ জুড়িয়ে যেতে লাগলো।

আমার শ্রীগুরুদেব ওঁকে দাদা বলে ডাকাতে আমি ওঁকে কাকা বলে সম্বন্ধ করলাম। সেই থেকে তিনি কাকা হলেন, আমাকেও আবার তিনি অন্য সম্বন্ধে কাকা বলে ডাকতেন। একটু পরে বল্লেন;—"দেখ কাকা! তোমাদের বাড়ীতে আমার একজন আত্মীয় বা আপন জন আছে তুমি সব লোককে একবার ডাক দিকি।"

(১) পুরা নাম, নবগোপাল দে হুগলী বাবুগঞ্জে নিবাস। বর্ত্তমানে কারবার স্থান ১৮১ বহুবাজার ষ্ট্রীট। ইহাঁরা চিরদিনই দেবদ্বিজ পরায়ন ধার্ম্মিক পরিবার।

তখন নবদ্বীপ কাকার কথা শুনে আমি আমার বাড়ীর ছেলে মেয়ে প্রভৃতি যত ছিল, সকলকে একে একে ডাকতে লাগলুম, কিন্তু যাকে দেখেন, তাকেই বলেন "না এত নয়।" শেষে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-বধূ (শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল দের সহধর্ম্মিনী শ্রীমতী কমলমণি দাসী) নিকটে আসতেই কাকা চম্‌কে উঠে বল্লেন—"এই যে তুই এসেছিস।" তারপরে আমার গুরুদেবকে বল্লেন ;—"পূর্ব্ব জন্মে ইনিই আমার গর্ভধারিনী ছিলেন। সেই থেকে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-বধূ নবদ্বীপ কাকার মা হলেন। এই সূত্র হ'তে আমাদের সঙ্গে তাঁর খুবই ঘনিষ্টতা হলো ; তখন ক্রমে ক্রমে সেই মলিন বেশধারী লোকটী যে কত মহৎ কত উচ্চ অঙ্গের ভক্ত, তা বুঝতে লাগলুম।

অনেক দিনের কথা, সব মনে নাই, ওঁর সম্বন্ধে যা দুএকটী কথা মনে আছে তাই বল্‌চি ;—

(১) একদিন নবদ্বীপ কাকা দোকানে এসে বল্লেন ;—"একটা মণি-অর্ডারের ফরম দিতে পারিস, শ্রীবৃন্দাবনে টাকা পাঠাবো।" এই সময়ে একজন জ্যোতিষি রাস্তা দিয়ে "ভাগ্য গণনা করতে পারি", ব'লে হাঁক্‌তে হাঁক্‌তে যাচ্ছিলো, কাকা তাকে ডাক্‌তে বলাতে আমি ডাকলুম এবং কাকার হাত দেখবার জন্যে তার সঙ্গে চারি আনাতে চুক্তি হলো। কাকা বল্লে "আমি ওর ভাষা বুঝি না, ও যা বলবে তুমি আমাকে বুঝিয়ে দিও।" কাকার হাতখানি নিয়ে জ্যোতিষি অন্ততঃ ১৫ মিনিট চুপ করে দেখে দেখে শেষে আমার দিকে চেয়ে বল্লে—"এরকম হাত আমি কখন দেখিনি, সমুদায় মহাপুরুষের চিহ্ন। কাকা বল্লে—"জ্যোতিষি কি বলচে ?" আমি বল্লুম—"জ্যোতিষি বলচে তুমি একজন ভয়ানক বদমাস্ চোর।" তার পরে কাকা জ্যোতিষিকে প্রশ্ন করতে লাগলেন জ্যোতিষিও উত্তর দিতে লাগলেন। (জ্যোতিষির সেই উত্তরগুলি পরে বর্ণে বর্ণে মিলেছিলো।) অর্থাৎ জ্যোতিষি বলেছিলো ৬মাস পরে কোন মহাতীর্থে আপনার দেহ রক্ষা হবে। ঠিক ৬মাস পরে শ্রীবৃন্দাবনেতে কাকা দেহ রক্ষা করেছিলেন।

(২) আর একদিন কালী রজক বলে একটী লোক, (আমাদের কাপড় কাচ্‌তো,) সে দোকানে কাপড় নিতে এসেচে, এমন সময়ে, কাকা উঠ্‌লেন ও রজককে দণ্ডবৎ করলেন। আমি বল্লুম "কাকা ! কর কি, ও যে ধোবা ওকে তুমি দণ্ডবৎ করচো।" কাকা বল্লেন "ধোবা বলেই তো দণ্ডবৎ

করছি, উনি যে আমার গুরু।" এই বলে রজককে বল্লেন ;—"বাবা জগতের ময়লা সাফ করে দাও, আমার মনের ময়লাটা সাফ করে দিতে পার ?" কালী জাতিতে রজক হলেও সে ভক্তিমান,—কাকার ঐ কথা শুনে বল্লে —"কেন পারবো না বাবা ?—তুমি যদি আমাকে "ভক্তি সাবান" দিতে পার তবে খুবই পরিষ্কার করে দিতে পারি।"

রজকের উক্তি শুনে কাকা তাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন। দোকানের সুমুখে বিস্তর লোক জড় হ'য়ে গেলো।

(৩) আমার ভাইঝী গঙ্গাবালা দাসী ছেলে মানুষ, সে একদিন বিলিতি কুল খাচ্চিলো, কাকা এসেই তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে খেতে লাগলো। আমরা তো হাঁ হাঁ করে উঠলুম। আমার ভ্রাতৃ-বধু এসে কাকাকে বকতে লাগলেন। তখন কাকা বল্লেন- "ও! তোরা আমাকে এখনও পর ভাবিস। আচ্ছা ও যখন তোর মেয়ে, আর আমি তোর ছেলে, তখন ছোট বোনের এটো খেতে দোষটা কি ?" কাকা চালকড়াই ভাজা খেতে বড়ই ভাল বাসতেন, এজন্য মেয়েদের কাছ হতে প্রায়ই চেয়ে খেতেন।

(৪) নবদ্বীপ কাকা শ্রীবৃন্দাবনে চলে যাবেন শুনে আমরা বিশেষতঃ আমার ঐ ভ্রাতৃ বধু অস্থির হয়ে কাঁদতে থাকেন। তখন কাকা ওঁকে অনেক করে বুঝিয়ে তবে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। যাবার সময়ে ওঁকে বলে যান,—"মা! তুই নিত্য আমাকে দেখতে পাবি ; আর নিত্য আমাকে কিছু কিছু খেতে দিস।" ভ্রাতৃ বধুও তাঁর কথামত নবদ্বীপ কাকার উদ্দেশ্যে রোজ ভোগ দিতেন। এমনি আশ্চর্য্য ব্যাপার একদিন চিনি ভোগ দিতে ভুলে গিছলেন, কিন্তু তার পরেই শ্রীবৃন্দাবন হতে কাকা পত্র দিয়ে জানিয়ে ছিলেন—"মা আমাকে অমুক দিন কেন খেতে দেয় নাই !!"

(৫) কাকা আমাদের বল্লেন—"তোদের সাঁপ দিচ্চি তোর বাড়ী 'মঠ-বাড়ী' হবে, আর বৈষ্ণব সেবা করে অতৃপ্তি হবি।" (এর মানে তোর বাড়ীতে খুব সাধু সমাগম হবে আর বৈষ্ণব সেবা যতই করবি, ততই করতে ইচ্ছে হবে, আশা কিছুতেই পূরণ হবে না।)

(৬) ফণি বলে একটী বালক আমাদের দোকানে কাজ করতো, সে আমাকে "বাবা" এবং আমার স্ত্রীকে "মা" বলে ডাকতো। ফণি আমাদের বড়ই অনুগত ছিলো ; এজন্য নিজেদের ছেলের অপেক্ষাও তাকে আমরা সকলে ভালবাসতাম।

একদিন নবদ্বীপ কাকা দোকানে এসে বল্লেন ;—"তোদের বাড়ীতে যাব সঙ্গে একজন লোক দে।" আমি বল্লুম—"তুমিতো বাড়ী চেনো, তবে আবার লোক কেন ?"

কাকা ফণির দিকে চেয়ে বল্লে "ঐ ছোকরাকে আমার সঙ্গে দে।"

আমি বল্লুম—"তোমার সঙ্গ তো ভাল নয় ; দেখো এ ছোক্‌রাকে যেন কিছু করে দিও না।"

কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার, তারপর হ'তেই দেখি, ফণির খুবই পরিবর্ত্তন হতে লাগলো, কাকা যেন তাকে কি করে দিল। সে দেখি লুকিয়ে লুকিয়ে জপ করে হাসে কাঁদে, "প্রেম-ভক্তি-চন্দ্রিকা" পাঠ করে। আর তার আমাদের উপর বা দোকানের কাজ-কর্ম্মে মন নেই, সে যেন কেমনধারা হয়ে যেতে লাগলো। এই রকম ভাব দেখে আমি বল্লুম—"নিজেরা বৈরাগী হয়েচো, আবার এ ছেলেটারও মাথা খাচ্চো ;—অমন কাজ করো না। ওকে দলে পুরলে আমার সংসার চল্‌বে না।"

কাকা বল্লে—"দেখ ও যে বৈরাগী হবার জন্মেই জন্মেছে তুই কি ওকে ধ'রে রাখতে পারবি। আমি ওকে সঙ্গি করবোই।" আমি বল্লাম,—"হাঁ, আচ্ছা দেখি তোমার জোর বেশি কি আমার জোর বেশি।"

ফণি আমাদের বাড়ীতে নিত্য প্রসাদ পেয়ে আসবার সময় আমার ঐ ভ্রাতৃ বধূকে বলতো—"এখন তবে আসি মা।" তিনিও বলতেন ;—হাঁ এস বাবা।" এই রূপই নিত্য হতো, এক দিন তিনি ভুলক্রমে "এস বাবা" না বলে "যাও বাবা" বলেচেন,—সেই দিন হতে ফণিকে আর দেখতে পেলাম না। চারি ধারে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম। ২৪ দিন পরে অটলদাস বাবাজী এসে বল্লে—"আমি তাকে পুরীর টিকেট কিনে গাড়িতে চাপিয়ে দিয়ে এসেচি। নবদ্বীপ দাদার আজ্ঞায় সে পুরীতে বাবাজী মহাশয়ের চরণ আশ্রয় করতে গিয়েচে। তাকে আর খুঁজবেন না, এতক্ষণে সে হয়তো বাবাজী মহাশয়ের কাছে বসে আছে।" কথাটা শুনে আমার হর্ষ্য-বিষাদ দুই-ই হলো।

ঐ ফণিই পরে নবদ্বীপ দাদার কৃপায় বাবাজী মহাশয়ের বিশেষ কৃপাপাত্র হয়। ফণি চির-কুমার, এখন সে ভেক নিয়ে নবদ্বীপে "শ্রীশ্রীরাধা-রমণ বাগে" আছে।

কাকার সম্বন্ধে আর ও কতকগুলি সামান্য সামান্য কথা মনে আছে।

(১) কাকা "ভজহুঁরে মন নন্দ-নন্দন অভয় চরণার বিন্দরে ॥" এই গানটী শুনতে বড়ই ভালবাস্‌তেন। পুনঃপুনঃ গাইলেও তাঁর শুনে আশ মিট্‌তো না।

(২) পুলীন বাবু বা কুঞ্জ মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতে কাকা শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ হরিসভা স্থাপন করেন। বুধবার ও শনিবারে খুবই জনতা এবং কীর্ত্তন হতো।

(৩) আমাকে, মেঘনাথ দাসকে, ফণিকে এবং গোবর্দ্ধন দাসকে আজ্ঞা করেছিলেন—

"নিতাই পদ কমল,　　　কোটি চন্দ্র সুশীতল
যে ছায়ায় জগত জুড়ায় ॥"

"এই গানটী তোরা নিত্য গান করবি। আর নিজেরা যে কোন পাপ করবি তা নিজেদের ভেতর বলবি।"

(৪) বড় বাবাজী মহাশয়ের অসুখ হতে, আমাদের বল্লেন—তোরা অষ্ট প্রহর নাম কর তা হলেই তিনি সুস্থ হবেন।

(৫) গোপালদাস কুণ্ডু বলে একজন বেশ কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। দুলাল বসুদের বাড়ীতে একদিন কীর্ত্তন হচ্ছিলো।—অভিসারের পরে শ্রীমতীকে ফিরিয়ে এনে বেণী বন্ধন গীত অর্থাৎ রসভঙ্গ যেই করেছে, কাকা অমনি তাড়াতাড়ি কীর্ত্তনীয়াকে এক চড় মেরে উঠে গেলেন। সেই দিন থেকে আর তার কীর্ত্তন শুনতেন না।

(৬) আমাদের আলিঙ্গন করে বল্‌তেন;—"নিতাই আমার কোটি কোটি জন্মার্জিত পাপ ধ্বংশ করে দিতে পারে, তোরা আর কি পাপ করতে পারিস।"

(৭) একদিন কাকা বল্লেন;—"আমি নিতাই দাস।" নিত্যস্বরূপ দাদা কাছে ছিলেন তিনি বল্লেন—দাদা! "নিতাই দাসানুদাস" বল না কেন?

কাকা ভাবে গরগর হয়ে বল্লেন—"না আমি নিতাই দাস।"

(৮) কাকা প্রায়ই বলতেন;—তোরা কি চাস্‌, যা চাইবি তাই পূরণ হবে।"

(৯) কাকাকে সন্ধ্যা-আহ্নিক এসব কিছু করতে দেখতুম না। একাদশী প্রভৃতি কিছুই করতেন না। একাদশী দিনে অন্ন প্রসাদ খেতেও দেখিচি।

(১০) একদিন জোড়াসাঁকোর ধার দিয়ে দুজনে যাচ্চি, রাস্তাতে বেশ্যারা

সাজ-গোজ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে কাকা কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলেন ;—"আহা দেখ্! দেখ্! গোষ্ঠ হ'তে শ্রীকৃষ্ণ আসবে বলে শ্রীমতীরা সব সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখ।

কটকে একস্থানে বাঈনাচ দেখে "রাসহচ্ছে" বলে ভাবে বিভোর হয়ে ছিলেন।

(১১) প্রায়ই আমাকে বলতেন ;—"গোপাল কাকা! কবে মহাসংকীর্ত্তনে নাচবো?"

(১২) আবার বলতেন—"দেখ! আমি কি গরিবের ছেলে?—না, আমি বড় লোকের ছেলে, তোরা যা চাইবি তাই পাবি।"

(১৩) শ্রীবৃন্দাবনে যাবার আগে বলতেন ;—শ্রীমতীর আদেশ হয়েছে আমি বৃন্দাবনে যাবো। আমরা বলতুম তোমাকে যেতে দিব না।

(১৪) শ্রীবৃন্দাবনে দেবালয় বা কোন শ্রীবিগ্রহ দেখতেন না। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, আমি এই খানেই বসে বসে সব দেখ্তে পাচ্চি।

(১৫) শ্রীবৃন্দাবনে ভ্রমর ঘাটে দেহ-রক্ষা করেন। সেই সময়ে শ্রীধাম নবদ্বীপের রাধা দাসী মা কাছে ছিলেন।

(১৬) কাকার জীবনীর অনেক অংশ জানেন,—

(ক) নবদ্বীপ ধামের রাধা দাসী মা।

(খ) সাতগেছের নারায়নী মা (প্রভুপাদ কুঞ্জ গোস্বামীর মাতা)।

(গ) হুগলী বাবুগঞ্জের কমলমণী দাসী (গোপালবাবুর ভ্রাতৃ-বধূ)।

(ঘ) নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী (নাইনিতাল)।

(ঙ) কটকের শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ বসু এম্, এ, ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট, এবং জান্তেন স্বধামগত পুলীনবিহারী মল্লিক বা সাধু নিত্যানন্দ দাস।

(এই গোপালবাবুর বাড়ী হতে আমি পূর্ব্বের লিখিত পত্রগুলি পেয়েছিনু)।

ক্রমশঃ

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট।

অতৃপ্ত—সংসার

[যশোহর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমস্থ বেদ বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভারতী সাংখ্যতীর্থ মহাশয় হিন্দু-পত্রিকায় বহুদিন পূর্ব্বে "অতৃপ্ত সংসার" নামক এই প্রবন্ধটী প্রকাশ করিয়াছিলেন, পাঠ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি। আজ ভক্তির পাঠকগণকে উহা উপহার দিবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া হিন্দু পত্রিকা হইতে উহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। (ভক্তি সম্পাদক)]

অনন্ত কাল ধরিয়া অনন্তে ছুটিতেছি, কখনও শান্তির কমনীয় কান্তি দেখিয়া নয়নযুগলের পিপাসা শান্তি করিতে পারিলাম না ত! বিশাল সমুদ্র-বক্ষে বিষম ঝঞ্ঝাবাত তাড়িত বিপদ সঙ্কুলতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া কতকালই চলিতেছি; বারিরাশির গভীর গর্জ্জনে শ্রবণ বিবর ব্যথিত, পেশী সকল নিষ্পেষিত। লহরীমালার সাক্রোশ পদাঘাতে বুক ভাঙ্গিয়া গেল, মর্ম্মগ্রন্থি শিথিল হইল, হৃৎপিণ্ডস্থ ধমনীগণ অমনি প্রতিশোধ-কলুষিত প্রাণে রক্তিমাকার ধারণ করিয়া কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়ভাবে কংকাল নিস্পন্দ রহিল, আবার ধৈর্য্য ধরিয়া সব সহিল, পরে কর্ত্তার কাছে সংবাদ দিতে চলিল। জ্ঞাতার লোচনে জল গলিল, এত বিড়ম্বনা, এত যাতনা, এত বেদনা, এত তাড়না, এত ক্লেশ, শেষে আবার যা তাই; কিছুই যেন মনে নাই। এই যে বিপুল ঝটিকায় শ্বাসমাত্রশেষ হইতে বসিয়াছে, এই যে অনাশ্বাস আসিয়া বিশ্বাস পাত্র হইতে চাহিয়াছে, কত মোহন তানে ভুলাইতে চেষ্টা পাইয়াছে, কিছুই ত কার্য্যকর হইল না! কোনও আশার ত সুসার বাড়িল না! যন্ত্রণায় অধীর হইলে কৃপাভিক্ষার প্রার্থনা হৃদয়ে উদয় হইয়াছিল, মসীময় সান্ধ্য আকাশে চপলাবালার বিমল হাঁসিটুকুর মত উহা আবার কোনও অদৃশ্য স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিল, কোনও শিক্ষা ত দিয়া গেল না! অধীরতার আবির্ভাবে হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন ভিন্ন বিশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, নীরবতার নিবিড় রবে তাহার ক্ষীণ স্বর কর্ণপথে উঠিত না; যেন ঢাকিয়া গিয়াছিল! কিন্তু কই পলক না পড়িতে সবই যে নড়চড় হইয়া গেল! অধীরতার পরাভব, অভাবের বৈভব, সহসাই বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন! আবার শ্রবণরঞ্জক উত্তমব্যঞ্জক

ললিতের কোমল আলাপ! এ নির্লজ্জ উদ্যম এতক্ষণ কোথায় ছিল? নিশার শেষে উষার মত অকস্মাৎ কোন দেশ হইতে আসিল? বলিয়াই বা কে দিল? কেন যাই? কিসের আশায় থামিয়াও যাই? তাড়িত লাঞ্ছিত দণ্ডিত ঘৃণিত হইয়াও যাই? যাহা নাই অথচ চাই, যদি তাহাই পাই জীবনের যত জ্বালা সবই জুড়াই, তবে কি কষ্টের মুষ্টাঘাত সহ্য করিতে প্রাণের পোঁড়ায় তাঝার ভাঁজা ভাঁজা হইতে আবার যাই?

মোহকুহেলিকার প্রসার কমিল, সংসার বিকারের প্রবল পিপাসা অনেক পরিমাণে মিটিল, অন্ধকারের গর্ভে অপ্রকাশিত কত মণির খনি ফুটিল, নিবৃত্তি-সুবাস ছুটিল, প্রবৃত্তির অমর গুমর আজ টুটিল বুঝা গেল কেন যাই? পথ পাই বলিয়াই যাই। অকুল সাগরে আকুল হইয়া আবার কাহার বলে কোন ছলে চলি? দিঙ্‌নির্ণয়ে গোলযোগ ঘটিল কি না জানি না, কিন্তু চলিতে ত বাধা নাই! সম্ভবতঃ লক্ষভ্রষ্ট হই নাই। "জীবনের ধ্রুবতারা" ঐ না! অপার বারিধিতে উহাইত এ পর্য্যন্ত আমার দিগ্‌দর্শনের অভাব পূরণ করিতে ছিল। তবে ত আমি লক্ষ দুঃখেও লক্ষ্য ভুলি নাই, তাই আবার নবোদ্যমে প্রমত্ত! যদি ধ্রুব আমার লোচন পথে এতক্ষণও নিজের আলোর জলজল্ করিয়া জ্বলিতেছিল, তবে আমার এ বিপত্তি কেন? এত কষ্টের পিষ্টপেষণে আমি ক্লান্ত কেন? দুর্দ্দৈবমেঘে সময় সময় আমার চখে আবরণ দেয়, অমনি আমি কেমন কি হইয়া যাই, অবকাশে শত্রুগণের আক্রমণ! সে তীব্রবেগ অতিক্রম করিতে অক্ষম হইয়া শূন্যমনে গগন পানে চাহিয়া দেখি ধ্রুব আমার মেঘের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিয়া দেখিতেছে, তখন দ্বিগুণ বলে সকল ভুলিয়া সেই দিকে অগ্রসর হই! শতবার সহস্রবার নির্লজ্জ বলিলেও উদ্যমের অঙ্গে আঘাত লাগে না। ধ্রুব যে হৃদয়মন্দিরের ইষ্টদেবতা! দেখিতে দেখিতে কোথায় পালায়, পাই না বলিয়া আশা ত আমায় বিদায় দেয় না! কাজেই অপূর্ণ আশার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাগলের মত ছুটিতেছি। শুধু কি আমি? এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু। যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করি দেখিতে পাই প্রত্যেক বস্তুই অভাবনীয় অভাবার্ণবে নিমগ্ন। যেন কি আঁধারের আলোক, পিপাসার পানীয়, বেদনার ঔষধ, কি সঞ্চিত ধন হারাইয়াছে। কিছুতেই তৃপ্তি নাই। যেন প্রাণের উপর বিষাদের আগুন দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে, আত্মহারা দগ্ধপ্রাণ অনবরত ছোটাছুটি করিতেছে; এদিক্ ওদিক্ করিয়াই কালযাপন করিতেছে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত সাজেই সাজিতেছে, কিন্তু

কালের শাসন কি কঠোর, অমনিই বিষণ্ণ বদনে খুলিয়া ফেলিতেছে। বাল্যাবস্থায় অপরিতৃপ্ত বকুলতরু শাখা পত্রাদির বহুলতায়ও তাই। তখন মুকুলোদ্গমের আশা। কই? মুকুলেও ত আকুলতা কমিল না। আবার প্রসূন প্রকাশের জন্য আয়াস, তাতে ও ত আশার পর্য্যবসান হইল না। বুঝাগেল—এ বাসনা আরও অনেকদিন অসম্পূর্ণই থাকিবে, অগত্যা কুসুমে ইষ্টসিদ্ধি নাই বলিয়া অযত্ন আনিল। অনাদরে ম্লান মুখ-কুসুম অভিমানে ভূতলে লুটাইয়া পড়িল। তরুর অভাব যেমন তেমনি রহিল। কাজেই পুনর্ব্বার শত শত বিঘ্ন বিনাশ পূর্ব্বক ইষ্ট সাধনের জন্য উচ্চ,জ্ঞগ গমন। সরোবরের অমলকমলাকীর্ণ বিমলজলে চক্ষুঃ স্থাপন করিলে দেখা গেল সৌরসন্তাপে অনবরত বাষ্পাকার ধারণ পূর্ব্বক সলিল রাশি অনন্তের অনন্ত প্রাণে মিশিতেছে, আবার পরিণতিবশে মেঘাকার গ্রহণ; বর্ষণোন্মুখ জলধরে সহসা স্নিগ্ধ বায়ুস্পর্শ। হায়! সে সকল স্নেহ কোথায়? এ যে কাঠিন্যের কারাগার, নাম মাত্রেই চিত্তচমৎকার! সহসা শিলাকার! জীবন এ জীবন নাশক মূর্ত্তিগ্রহণেও তৃপ্ত হইতে পারিল না। কাজেই "ফিরে রাধাকমলিনী।" এই নানা চক্রে পরিভ্রমণ করিয়াও শান্তি নাই। সুনীল গগনে চাহিলাম, সম্মুখে শশী, কোথায়! যেন কালের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। একতিলও বিরাম নাই সুতরাং আরাম নাই। যেন কোন হারানিধি খুঁজিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। গতি মন্দ বই তীব্র নয়। বোধ হয় সে নিধি দেখা যায়, তবে ধরা দেয় না। সুতরাং অবিশ্রাম অনুগমন হইতেছে। চাঁদের পরে নজর দিয়া মনে করিতে ছিলাম, নক্ষত্র বুঝি তৃপ্ত। আঃ কপাল! সেটাও যে কথার কথা যেটা দশহাত তফাতে ছিল, এখন দেখি মাথার পরে। আর বুঝিতে বাকি নাই সকলেই অভাবসাগরে ভাসিল।

দুই হাতে এতকাল অকূল জল রাশি অতিক্রম করিয়া, আঘাতের পর আঘাত সহিয়া, এতই চলিতেছি, এবার কারণ জানা গেল। এই জন্যই আমি আজীবন তৃপ্তিবিহীন। বাল্যকালের ধুলাখেলায় মনের আশা জুড়াইল না। কিশোর সময়ের অননুভূত আনন্দের আশায় প্রাণ পর্য্যাকুল হইল, কিন্তু পাইয়াও পরিতৃপ্তি নাই। যৌবনের তরল প্রবাহ আবার নয়ন পথের পথিক হইল, কত বিলাস, কত লালসা, কত সাহস, ক্ষণেক সরস, ক্ষণে নীরস, কত ভাবই আবির্ভাব প্রাপ্ত হইল। কিছুতেই অভাব পুরিল না। সুরূপ কুসুমে নয়ন ভৃঙ্গ লাগিয়া রহিল, বোধ হয় যেন আর ছাড়িবে না, সংসার

একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছে। কিন্তু কি ভাবিয়া আবার পরিত্যাগ করিল। রসনার উপর রসগোল্লার রস প্রবাহ বহান হইল; কত সাদর গ্রহণ! অভ্যর্থনায় বোধ হইল, আর ছাড়িতে পারিবেনা, স্বভাবের ব্যবহার কি নীরস, একেবারেই উদরসাৎ! যদি বুঝিলশান্তি নাই, আবার দিলে কেন অগ্রসর হইয়া গ্রহণ করে? আশার মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ, তাই বুঝি ভাবে "এবার পাইব।" শ্রবণ শ্রীরাগে যেরূপ অনুরাগ প্রকাশ করিল, অনুমান হয় সেই রসেই মজিয়াছে, কাজে কিন্তু কিছুই নয়, শান্তির সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তৃষ্ণার অসাধারণ চতুরতাই একমাত্র নিদান। যে পোষকে শান্তি নাই, তাহাকে কেন সুখসাধক বলিয়া বুঝা হয়। তৃষ্ণাদেবীর মুগ্ধীয়ানাইত কারণ। নীরস মরুভূমির মধ্যে সুশীতল জলের অন্বেষণ করিতে যে শিক্ষা গুরুর নিকট শিখিয়াছি, শুষ্ক কুঞ্জকাননে যাহার উপদেশমতে ফুল ফলের লোভে সলিলসিঞ্চন করিতে করিতে স্বেদ জলে কপোল তল স্নান করাইতে অভ্যাস করিয়াছি, যাহার আদেশে অনিশ্চিত শস্যের জন্য কতবার কঠোর ভূমিতল কর্ষণ করিয়াছি, সেই তৃষ্ণা, সেই সংসার কুসুমের গ্রন্থি স্বরূপ তৃষ্ণা, সেই পক্ষে কুহুম জ্ঞানের উপদেষ্টি তৃষ্ণা আমাকে যা তাই দেখাইয়া ভুলাইতেছে। প্রমত্ত আমি অমনি ছুটিয়া গিয়া তাহাই বুকে রাখি, যখন অনল দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠে, পাগল হইয়া দূরে ফেলিয়া দেই। গভীর নিশার নিদ্রার নির্মল কোলে শয়ন করিয়া অনেকাংশে নিরুপদ্রব হইতে পারিয়াছিলাম, এই সুখ সুষুপ্তি বুঝি চিরস্থায়ী। সংসার কাননে দাবাগ্নি বুঝি আর আমায় আক্রমণ করিতে পারিবেনা। এই শান্তিনীরে নিমজ্জনেই বুঝি সকল অশান্তির অবসান হইবে। কিন্তু মনের কথা মনেই রহিল, গাছের প্রসূন ডালেই শুকাইল, কাণে কাণে কে আসিয়া কি কহিল, চমকিয়া জাগিলাম যাহা দেখিলাম সে দৃশ্য বর্ণনাতীত। কবির ভাণ্ডারে তত কল্পনা নাই যে বর্ণে সে মূর্ত্তি শোভিত। কত কি মধুরতাময় জিনিস দেখিয়াছি, ইহার কাছে সকলই অধম! এ যে সুষমার নিভৃত বাসস্থান। কলকণ্ঠের কোমল আলাপ প্রাণ ভুলাইল, উপদেশে অমনোযোগ করে কার সাধ্য? বাধ্য হইয়া যা বলে তাই করি! বল প্রকাশের আবশ্যক নাই. স্বেচ্ছায়ই সব করি। অনুবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিলে কৃতার্থ হই, অনুগ্রহই চাই আগ্রহ আর লাগেনা যেন সঞ্চিত সমস্ত জিনিষই মহাজোয়ারে ধুইয়া গিয়াছে। কাজেই সবল পুষ্ট ভাবে যা দেখায় তাই লই, যাকরে তাই সই। পিশাচীর পৈশাচ প্রবৃত্তি আমাকে ক্রীড়া পুত্তলিতে পরিণত করিয়াছে রাক্ষসী হৃদয়ে সকল রক্ত শুষিয়া খাইল,

শ্মশানে চামুণ্ডা সাজিয়া বসিল, তবু সাধ পুরেনা। আমাকে বানর নাচাইয়া খল্ খল্ করিয়া হাসিতেছে। আমোদে যেন গলিয়া যাইতেছে, উৎসবের উৎস যেন খুলিয়া গিয়াছে, স্বেচ্ছাচারের ভরপুর তুফান বহিয়া যাইতেছে, আর আমি ক্রন্দনের রোলে আকাশ কাঁপাইতেছি, শান্তি পিপাসায় অনবরত ধাবিত হইতেছি। কিন্তু ঐ তৃষ্ণার কুটিল কটাক্ষেও সুধাচালে কাজেই যা দেখায়, তাহাকেই শান্তিপ্রদ বলিয়া মনে করি।

জ্বালা সহিতে সহিতে' দুঃখভার বহিতে বহিতে, প্রাণের কথা কহিতে কহিতে, কুহকীনীর কাছে রহিতে রহিতে, কি যেন এক অভূতপূর্ব্ব ভাবে উপনীত হইয়াছি। তমাল ডালে কোকিলের কলকাকলীও কাণে লাগেনা, বরং প্রাণে যেন বিরক্তিবাণ বিদ্ধ করিয়া দেয়। মধুকরের মধুমাসের মধুর ঝঙ্কার মন মজাইতে পারেনা, আমার কর্ত্তব্য আমি তাতে ভুলিনা। পুত্রশোকাতুরা রমণীর আর্ত্তস্বরেও হৃদয় গলেনা, বালকের নধর অধরে মধুর হাসিতেও আপন হারা হইনা, আমার কাজে আমি অবিরত যাই, কাহারও দিকে চাইনা, কেবল তৃষ্ণা যাহা দেখায়, তাহার দিকেই বিনা ওজরে নজর করি। একের অভাবেই সকল শূন্য। আজ বুঝিলাম শান্তির অভাবেই এসংসার এত আকুল। চারিদিকে অভাবের বিভীষণ মূর্ত্তি আমায় গ্রাস করিতে বদন ব্যাদান করিয়া অগ্রসর হইতেছে, তাই এ চিরন্তর পলায়ন। অভাব! তোমার এই অসাধারণ প্রভাব দর্শন করিয়া কি বেদান্তবিৎ তোমাকে অস্তুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন? বোধ হয় এদারুণ দৃশ্য লোকলোচনে সহিবেনা বলিয়াই তোমার এ সংহারকমূর্ত্তির কথা লুকাইয়া তোমাকে ভাবরূপে বলা হইয়াছে। অনন্ত কাল আমি শান্তির জন্ত লালায়িত, তুমি অনুসরণ করিতেছ, কিন্তু তাই বলিয়া আসল ভুলিব? কখনই নয়। যেমন যাইতেছি, তেমনিই যাইব। আমায় পাওয়া চাই, তাই লইয়া কথা।

আর তোমার শঙ্কায় শঙ্কিত নাই। ঐ তৃষ্ণাপিশাচীর প্রলোভন কুয়াসায় নয়ন আর অন্ধ নয়! মোহনিদ্রা যেন অপসৃত হইতে চলিয়াছে, ঘুমের ঘোর আছে, কিন্তু তাহাতে বিভোর নহি ভোর সম্মুখে আসিয়াছে। তরুণ অরুণের মৃদু কিরণে দশ দিক্ প্রকাশিত, আলোক পাইয়া জীবজগৎ পুলকিত, তৃষ্ণার অত্যাচারে সংসার পরিভ্রমণে কত যে কদর্থনা ভোগ করিয়াছে, তাহা একেবারেই বিস্মৃত, পুরাতন অবস্থা—যাহা দুরদৃষ্টের দুরন্ত তাড়নে অদৃশ্য হইয়াছিল, সেই সনাতন ভাব আবার আসিয়াছে দেখিয়' চমকিত, অন্তরে শান্তপুরের যাত্রী দর্শনে, গন্তব্যস্থানের নিকটে পৌঁছা বুঝিতে পারিয়া আনন্দিত, তৃষ্ণার সরসবদনে বিষাদ কালিমা দর্শনে চিন্তিত, কিন্তু এখনও উৎকণ্ঠার অনিবৃত্তিতে অপরিতৃপ্ত! তৃষ্ণাপাশছিন্ন করিতে না পারিলে যে সে অবিনাশি তৃপ্তিলাভের উপায় নাই! পিশাচীর সহবাসে যে কলুষিত হইতে হইয়াছে, তাহার সেই কলঙ্কপঙ্ক মার্জ্জনে উঠাইয়া দিলাম বটে কিন্তু কারণ যে পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। নেশা ছুটিয়াছে বটে, মাদক ত সঙ্গেই আছে, আবার আমায় কখন কি সর্ব্বনাশ ঘটে, কেমন করিয়া বলিব! যাক দূরে ফেলিয়া চলিয়া যাক! আঃ বিপদ এ যে

আমার পশ্চাৎ অনুসরণ করে। বুঝিয়াছি পৈশাচ প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি হয় নাই। চাই না বলিলেও যায় না, তিরস্কারেও পুরস্কার বলিয়া মনে করে, পদাঘাতও "প্রেম সম্বোধন" ভাবে, বিরক্তিজ্ঞাপক নয়ননিক্ষেপ ও সপ্রেমকটাক্ষ বলিয়া আনন্দিত হয় সম্মোহনের শেষ উপকরণও এই। হৃদয় সহিষ্ণু হইয়াছে, এখন এ অন্তরে নিজের "কদর বাড়িল" ভাবেনা। মনে করে—এউৎপাত অতিক্রম করিতেই আমার চিরশান্তি সকল অসুখের অবসান। এতদিন যে প্রসূনকে সুরভি বলিয়া ভাবিতাম, যে গন্ধে অন্ধ হইয়া কাচকাঞ্চনের বিনিময়ও সহিতাম, যেরূপের ফাঁদে পড়িয়া উন্মুক্ত নরকের দ্বারকেও নন্দন কাননের চারু-তোরণ মনে করিতাম, এখন দেখি তাহা পূতিগন্ধময়, সে গন্ধ ঘৃণিত, সেরূপ কুরুচির কদর্য্য আলয়। যে বাহুবিক্ষেপকে মৃণালবল্লী সঞ্চালন জ্ঞান করিতাম, এক্ষণে দেখিতে পাই তাহাকে বিষলতার আন্দোলন বলাই যুক্তি যুক্ত। এতকাল ভূজঙ্গিনীর বিষাক্তদংশনে মর্ম্ম স্থল জরজর হইয়াছে, আর অপেক্ষা করিবনা উপেক্ষাও অনুচিত। সত্বরে চতুরতার দুষ্কর পরিণাম ভোগ করিয়া পাপীয়সীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছিল, এই অমূল্য ধন থাকিতেও দীন দরিদ্র ছিলেম! ওঃ! আমি কি মূঢ়! গূঢ়তত্ত্ব জানিয়াও ভুলিয়াছিলাম! ঘুমের আবেশ আর নয়নে নাই। মন বলীয়ান, প্রাণ পরিতৃপ্ত পায়, নিরাশায় আমোদ বড়ই ভাল লাগিয়াছে!

অকস্মাৎ বহ্নির উজ্জ্বলশিখা নয়ন পথ অলঙ্কৃত করিল কেন? পাপিনি! এই কি তোমার মনোহর মূর্ত্তির পরিণাম? প্রলয়! কিসের প্রলয়? আমার যাহা আছে, তাহা যে অক্ষয় ভাণ্ডারের অবিকৃত ধন, তাহার বিনাশ যে হাসির সমাচার। আগুণ যাহা পোড়াইতে পারে, তাহার আর গুণ কি? বজ্রাঘাতে যাহার উন্নত চূড়া শত খণ্ডে বিভক্ত হয়, তাহার আবার কাঠিন্য কি? যাহা সলিল সংযোগে আর্দ্র হয়, তাহাকে শুষ্ক বলায় লাভ কি? এ জিনিষ পোড়ে না নড়ে না গলে না চলে না, যেমন তেমনি। তবে আমার ভয় কি? কুহকিনি! এই সে ভয়ানক মূর্ত্তি, এই ত তোমার শেষ। যে রাঙ্গাচখে জগৎ কাঁপিয়াছে তাহার ত চরম ভাব এই? তৃষ্ণা! এই ত শেষ আকার। তৃণ রাশি দগ্ধ করিয়া আপনা আপনি নিবিয়া যাও। আমি শান্তি জলে অনন্ত মর্ম্মস্থল ধৌত করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইব। ডাইন্ তাড়ান "রক্ষাকবচ" যাহা কণ্ঠহার করিয়া রাখিয়াও ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তাহা পাইয়াছি। এখন তোমার চরম বিদায়। ঐ দেখ অদূরে শান্তি সরোবর। অম্লান কমলকুল। অমর মরালদল কূজন ছলে অবোধ সত্য গাথা গাহিতেছে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম এই পাইলেই তৃপ্তি মিলিল। জগৎ! ঐ শুন নির্দ্দোষ আকাশবাণী। রসো বৈ স রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।"

শ্রীকেদারনাথ ভারতী সাংখ্যতীর্থ

২১ শ বর্ষ সমাপ্ত

চরিত-সুধা

শ্রীমৎ রাধারমণচরণদাস বাবাজী মহাশয়ের জীবন-চরিত।

শ্রীধাম নবদ্বীপ, "শ্রীরাধারমণবাগ" হইতে

শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আদর্শ সিদ্ধ মহাত্মাদিগের চরিত্রানুশীলন ধর্ম্ম-প্রাণ ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। ইহাতে উপাসনাতত্ত্ব অতিসরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। কিরূপে ভক্তজীবন গঠিত হয় বা ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া যায়, চরিত সুধায় তাহাই বিশেষভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। মূল্য— ১ম খণ্ড ১।০; ২য় খণ্ড ১৷০; ৩য় খণ্ড ১।০; ৪র্থ খণ্ড ১।০; ৫ম খণ্ড ১।০; পাঁচ খণ্ড একত্রে ৬।০; ৬ষ্ঠ খণ্ডে সম্পূর্ণ (যন্ত্রস্থ) ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীবিহারীদাস বাবাজী, "শ্রীরাধারমণবাগ" পোষ্ট নবদ্বীপ, নদীয়া।

শ্রীবলাইচাঁদ আঢ্য, সৌখীন ভাণ্ডার, ৪২।১ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড কলিকাতা

ভিঃ পিতে লইতে হইলে নবদ্বীপের ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

ভক্তিতে বিজ্ঞাপন দিবার সাধারণ হার

ভক্তির কভারের ২য় ৩য় পৃষ্ঠা প্রতিবারে	৩৲
" " ৪র্থ পৃষ্ঠা	৪৲
কভার ব্যতীত বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠা	২৲
অর্দ্ধপৃষ্ঠা	১৲
সিকি পৃষ্ঠা	৸০

বিশেষ বিবরণ নিম্নঠিকানায় অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।

ঠিকানা— ম্যানেজার, "ভক্তি"

ঘোড়হাট "ভক্তি-নিকেতন"

পোঃ আন্দুল-মৌড়ী, জেলা হাওড়া

নূতন উপন্যাস! ফুরাইয়া আসিল !!

"ভারতবর্ষ" সম্পাদক প্রবীণ ঔপন্যাসিক

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর প্রণীত

সোণার বালা

সম্পূর্ণ নূতন উপন্যাস

পুস্তকের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন ভাল কালীতে ঝকঝকে ছাপা,

সুদৃশ্য বাঁধাই, উপহারের শ্রেষ্ঠ পুস্তক

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার "মানসী প্রেস" ১৪এ রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা

ভক্তির-নিয়মাবলী

১। 'ভক্তি' ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা। প্রতি বাংলা মাসের প্রথমে যথা নিয়মে প্রকাশ হয়। ১৩২৯ সালের ভাদ্র মাস হইতে ভক্তির ২১শ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে, ১৩৩০ সালের শ্রাবণ মাসে বর্ষ শেষ হইবে। বৎসরের যে কোন সময়ই গ্রাহক হউন না কেন, প্রথম হইতেই পত্রিকা পাইবেন।

২। ভক্তির বার্ষিক মূল্য অগ্রিম ডাকমাশুলসহ সর্ব্বত্র ১॥০ দেড় টাকা, প্রতি খণ্ড ৵০ তিন আনা। ভিঃ পিতে ১।৵০ এক টাকা এগার আনা মাত্র। ২১শ বর্ষের গ্রাহকগণ ১৪শ, ১৫শ, ১৬শ, ১৭শ, ১৮শ, ১৯শ ও ২০শ বর্ষের পত্রিকা প্রতি বর্ষ ডাকমাশুলসহ ১৵০ এক টাকা তিন আনায় পাইবেন।

৩। ভক্তিতে রাজনৈতিক কোন প্রবন্ধ প্রকাশ হয় না। ভক্তির উপযোগী ধর্ম্ম-ভাবমূলক প্রবন্ধ সম্পাদক ও পরিদর্শক পণ্ডিতমণ্ডলীর আদেশানুসারে (প্রয়োজন হইলে পরিবর্ত্তিত হইয়া) প্রকাশ হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কেহ অনুরোধ করিবেন না। ক্রমশঃ প্রকাশোপযোগী প্রবন্ধের সমগ্র পাণ্ডুলিপি হস্তগত হইলে তবে প্রকাশ আরম্ভ হয়।

৪। প্রবন্ধ ফেরৎ দিবার নিয়ম নাই, প্রবন্ধ লেখকগণ নকল রাখিয়া দিবেন।

৫। কোনও বিষয়ের উত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাইকার্ড বা টিকিট পাঠাইতে হয়। পুরাতন গ্রাহকগণের প্রত্যেক পত্রেই গ্রাহক নম্বর থাকা প্রয়োজন। নম্বরবিহীন পত্রে কোনও কার্য্য হয় না। নূতন গ্রাহক "নূতন" এই কথাটী লিখিবেন এবং আপনাপন ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

৭। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ যথাসময়ে আমাদিগকে না জানাইলে পত্রিকা না পাইবার জন্য আমরা দায়ী নহে। কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে তাহার পর মাস পাওয়া মাত্র জানাইলে বিনামূল্যে দেওয়া হয়, নতুবা পৃথক মূল্য (প্রতি খণ্ড ৵০ তিন আনা) দিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

৮। চিঠিপত্র, টাকাকড়ি, প্রবন্ধ এবং বিনিময় ও সমালোচনার্থ পুস্তক, পত্রিকাদি সমস্তই নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হ'

ঠিকানা—

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন

ষোড়হাট "ভক্তি-নিকেতন"

পোঃ—আন্দুল-মৌড়ী, হাওড়া।

কলিকাতা ৩৩এ মদনমিত্র বস্তুর লেন "মানসী প্রেস" হইতে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।